শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আল্লারাখা আর ওস্তাদ আলী আকবর খান

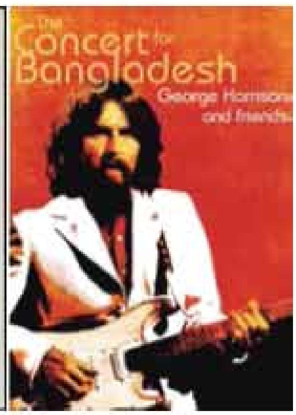

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং ত্রাণ সাহায্যার্থে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট, রবিবার অপরাহ্নে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই মূলত বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সংকটের বার্তা পৌঁছে যায়।
- আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ কনসার্টের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ব্রিটিশ সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জোয়ান বায়েজ, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাডফিঙ্গার এবং রিঙ্গো স্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য। রবিশঙ্কর ও বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁদের সাথে তবলায় ছিলেন ওস্তাদ আল্লা রাখা খান।
- এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই কোটি মার্কিন ডলার যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

Shrimp Culture & Breeding-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক
মো: মঞ্জুর কাদির
প্রকল্প পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা

সম্পাদক
মো: আবুল হাশেম
সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু (তাত্ত্বিক)	পৃষ্ঠা
প্রথম	**গলদা চিংড়ির জীববিদ্যা**	**১–১৮**
	গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস	১
	গলদা চিংড়ি শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য	১
	গলদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন	৩
	চিংড়ির উপাঙ্গাসমূহ	৫
	জীবনচক্র	১৩
দ্বিতীয়	**গলদা চিংড়ি চাষ**	**১৯–৩৭**
	গলদা চিংড়ি চাষের পটভূমি	১৯
	গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা	২০
	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা	২১
	চিংড়ি চাষে গুরুত্ব	২২
	গলদা চিংড়ি ও ছটকা চিংড়ির দৈহিক বৈশিষ্ট্য	২২
	গলদা চিংড়ি চাষের প্রকারভেদ	২৩
	গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি	২৪
তৃতীয়	**বাগদা চিংড়ির খামারের স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশল**	**৩৮–৪৫**
	স্থান নির্বাচন	৩৮
	স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৩৮
	খামার নির্মাণ কৌশল	৪১
চতুর্থ	**বাগদা খামার প্রস্তুতকরণ**	**৪৬–৬৫**
	পাড় মেরামত	৪৭
	স্লুইস গেইট মেরামত	৪৭
	আগাছা দমন	৪৭
	রাক্ষুসে মাছ এবং অবাঞ্ছিত মাছ ও প্রাণীর ক্ষতিকর দিকসমূহ	৫৩
	জৈব পেস্টিসাইড	৫৫
	চুন প্রয়োগ	৫৮
	পানি সংগ্রহ	৬৫
পঞ্চম	**পুকুরের গলদা চিংড়ি পোনা মজুদ**	**৬৬–৬৭**
	সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায়	৬৬
	পোনার উৎস সগ্রহ পদ্ধতি	৬৬
	গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন	৬৭
	পোনা মজুদের হার	৬৯
	আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা পোনা পরিবহন	৭২
	পোনা মজুদ পদ্ধতি	৭৫
ষষ্ঠ	**পকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা**	**৭৮–৯০**
	পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ	৭৮
	পানি ব্যবস্থাপনা	৭৮
	খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৮৪
	খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	৮৫
	অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	৮৬
	চাষকালীন উদ্ভূত সমস্যা ও তার প্রতিকার	৮৬
সপ্তম	**গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	**৯১–১০২**
	চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভাস	৯১
অষ্টম	**সমন্বিত চিংড়ি চাষ**	**১০৩–১২৮**
	কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ	১০৩
	মিশ্র চাষ পুকুরের বৈশিষ্ট্য	১০৩
	গলদা চিংড়ি-কার্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	১০৬
	মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা	১০৭
	মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা	১১৫
	মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	১১৫
	ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি	১২১
	বিষয়বস্তু (ব্যবহারিক)	
	অনুশীলন ১ থেকে ১৭	১২৯-১৫৩

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু (তাত্ত্বিক)	পৃষ্ঠা
প্রথম	**বাগদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ**	**১৫৪–১৬১**
	আহরণ পদ্ধতি	১৫৬
	গলদা চিংড়ির গ্রেডিং	১৫৮
	আহরণোত্তর পরিচর্যা	১৫৯
দ্বিতীয়	**গলদা চিংড়ি সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ**	**১৬২–২০৩**
	নিম্নতাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ	১৬৬
	শীতলীকরণ	১৬৭
	শুটকিকরণ	১৭৪
	নিরুদিকরণ	১৭৬
	প্যাকেটজাতকরণ ও কৌটাজাতকরণ	১৭৯
	গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা ভালো চাষ অনুশীলনের এর গুরুত্ব	১৯১
	মাছ/চিংড়ি উৎপাদনে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন	১৯৫
তৃতীয়	**ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা**	**২০৪–২১১**
	পুকুর প্রস্তুতি	২০৫
	চুন প্রয়োগ	২০৬
	পরিণত চিংড়ি মজুদকরণ	২০৯
	খাদ্য প্রয়োগ	২১০
	স্বাস্থ্য পরীক্ষা	২১০
	ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ	২১০
চতুর্থ	**গলদা চিংড়ির প্রজনন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা**	**২১২–২৫৪**
	চিংড়ি হ্যাচারির প্রকারভেদ	২১৩
	গলদা চিংড়ি হ্যাচারির স্থান নির্বাচন	২১৪
	গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো নির্মান	২১৬
পঞ্চম	**গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা**	**২৫৫–২৬৩**
	নার্সারি পুকুরের প্রয়োজনীয়তা	২০৬
	গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	২৫৫
ষষ্ঠ	**গলদা চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা**	**২৬৪–২৭৫**
সপ্তম	**চিংড়ি চাষের প্রকল্প প্রণয়ন**	**২৭৬–২৮৬**
	চিংড়ি প্রকল্প প্রণয়নের কৌশল	২৭৬
	চিংড়ি চাষের ব্যয়ের খাত নির্ধারণ	২৭৭
	চিংড়ি প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিবরণী	২৭৮
	চিংড়ি হ্যাচারির ব্যয়ের-আয়ের খাত নির্ধারণ	২৮৫
	বিষয়বস্তু (ব্যবহারিক)	
	অনুশীলনী ১ থেকে – ১৮	২৮৭–৩০৩

প্রথম অধ্যায়
গলদা চিংড়ির জীববিদ্যা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এদেশে প্রায় ২৭ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি এবং ৩৬ প্রজাতির লোনা পানির চিংড়ি পাওয়া যায়। মিঠা পানির বিভিন্ন চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিঠা পানির এই চিংড়ি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ জলাশয় যেমন- পুকুর, ডোবা, দীঘি, খাল-বিল, ধানক্ষেত ও নদীতে বাস করে। গলদা চিংড়ি ডিম ছাড়ার সময় মোহনায় চলে আসে এবং সেখানেই কিশোর চিংড়িতে পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ কিশোর চিংড়ি উজান বেয়ে মিঠা পানির দিকে অগ্রসর হয় এবং মিঠা পানিতেই এরা পরিপক্বতা লাভ করে। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে থাকে। চিংড়ি চাষ প্রযুক্তিনির্ভর বিধায় চিংড়ির জীববিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গলদা চিংড়ি চাষ করতে হলে এর অঙ্গসংস্থান, প্রকৃতি বা আচার আচরণ, পরিবেশ ও পরিবেশীয় উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

গলদা চিংড়ি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীষ্মমন্ডল ও ক্রান্তীয়মন্ডলের কাছাকাছি বেশি পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত দেশের নদী, হ্রদ, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে।

গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতে গলদা চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ—

Phylum	:	Arthropoda (joint legged animal)
Class	:	Crustacea (segmented/shelled crustaceans)
Sub-class	:	Malacostraca (soft shell crustaceans)
Order	:	Decapoda (ten-footed crustaceans)
Sub-order	:	Natantia (swimming crustaceans)
Infra Order	:	Caridea
Super Family	:	Palaemonoidea
Family	:	Palaemonidae
Sub Family	:	Palaemoninae
Genus	:	Macrobrachium (Bate, 1868)
Species	:	M. rosenbergii (De man, 1879)

গলদা চিংড়ি শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য

- চলনপদের কারপাস মেরাসের চেয়ে যথেষ্ট লম্বা।
- পুরুষ গলদা চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া চলনপদ অন্য প্রজাতির চিংড়ির চেয়ে মোটা।
- চঞ্চু সংকেত = ১১১৪/৮-১০।
- টেলসনের শেষ প্রান্ত ইউরোপাডে পর্যন্ত বিস্তৃত।
- রোস্ট্রাম ইংরেজি "ঝ" অক্ষরের ন্যায় বাঁকানো, সরু, ঋজু এবং অগ্রভাগ উপরদিকে সামান্য বাঁকানো।

- উদরাঞ্চলে তীর্যক নীলাভ বর্ণের ডোরা বা দাগ দেখা যায়।

- জুভেনাইল পর্যায়ে ক্যারাপেসের উপরে কালচে নীলাভ বর্ণের লম্বালম্বি ডোরা বা দাগ দেখা যায়।

গলদা চিংড়ির আবাসস্থল: গলদা চিংড়ি সাধারণত স্বাদুপানির পুকুর, নদী, হ্রদ, ডোবা, নালা, খাল, বিল ও হাওরে এবং নদী মোহনায় পাওয়া যায়। বেশির ভাগ প্রজাতিই সমুদ্রের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত আধা লবণাক্ত পানিতে তাদের প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করে। চাঁদপুরের ডাকাতিয়া ও মেঘনায় জুন থেকে আগস্ট মাসে কিশোর গলদা (চিংড়ির গড় আকৃতি ৪০ মিমি) এবং অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বেশ বড় আকারের চিংড়ি (৮০-৩৩০মি.মি.) জাল বা কাঠার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ধরা হয়। নোয়াখালীর ডাকাতিয়া ও মেঘনায়, ময়মনসিংহের পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে, বাগেরহাটের পশুর, ভৈরব ও মধুমতি (?) ধরতানা, দাউদকান্দির গোমতি, কাঠালিয়া ও মেঘনায় বড় আকৃতির গলদা (১০৫-৩৩০ মি মি) প্রচুর পরিমাণে ধরা হয়। ফেনীর মুহুরী ও ফেনী নদীতে, চট্টগ্রামের হালদা ও কর্ণফুলীতে, খুলনার সুন্দরবন মোহনায়, নরসিংদী ও ভৈরব বাজারের মেঘনায় এবং বরিশালের কীর্তনখোলায় গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। নদীর মোহনা হতে গলদা চিংড়ি ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উজানে হ্রদ, নদী, সেচখাল এমনকি ধানক্ষেতেও গমনাগমন করে।

খাদ্যাভ্যাস: গলদা চিংড়ি পানির তলদেশে বিচরণ করে এবং সেখানকার জীবিত ও মৃত বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু ভক্ষণ করে। এ কারণে খাদ্য স্বভাবে এরা সর্বভুক। প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় এমন ছোট ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী, কুঁচো চিংড়ি, ছোট শামুক, পোকা-মাকড় ও লার্ভা, কৃমি, শেওলা, উদ্ভিদের টুকরা এদের প্রিয় খাদ্য। এরা খাদ্য সংগ্রহ করে বড় পায়ের চিমটার সাহায্যে এবং খাদ্যের উপস্থিতি অনুভব করে এন্টেনার সাহায্যে। পানিতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব থাকলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খোলস বদলের সময় স্বজাতিভোজিতা বেশি দেখা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা কুঁড়া, ভুষি, দানাদার শস্য, খৈল, ফলের টুকরা, মাছের গুঁড়া, গবাদি পশুর রক্ত, শামুক-ঝিনুকের মাংস ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে চিংড়ি নানাবিধ জলজ প্রাণী যেমন কাঁকড়ার বাচ্চা, চিংড়ির পোনা, ঝিনুক ও শামুকের বাচ্চা; শেওলা ও জলজ উদ্ভিদ খেয়ে থাকে।

প্রজনন ক্ষেত্র: নদী অথবা মোহনার অপেক্ষাকৃত কম লোনা পানিতে স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ির মিলন, ডিম নিষিক্তকরণ এবং ডিমের প্রাথমিক বৃদ্ধি ঘটে। নদীর মোহনাঞ্চলের যেখানে পানির লবণাক্ততা ৫-২০ পিপিটি এবং তাপমাত্রা ২৯-৩৩° সেন্টিগ্রেড সে সব এলাকায় গলদা চিংড়ির পরিপক্ক নিষিক্ত ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির তিনটি সম্ভাব্য প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হলো: (ক) মেঘনা নদীর ঈষৎ লবণাক্ততা সমৃদ্ধ অঞ্চল, (খ) সুন্দরবন মোহনার বলেশ্বর নদী এবং (গ) কর্ণফুলী নদীর মোহনা।

প্রজনন সময়কাল: গলদা চিংড়ি প্রায় সারা বছর প্রজননে সক্ষম। তবে মার্চ থেকে জুলাই মাসই এদের প্রধান প্রজননকাল। মে-জুন মাসে উপকূলীয় নদীগুলোতে গলদা চিংড়ির পোনা বেশি পাওয়া যায়।

প্রজনন পরিপক্কতা: গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাসের মধ্যেই প্রজননে সক্ষম হয়। তবে অনুকূল পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর এদের প্রজনন পরিপক্কতা নির্ভর করে। উপযুক্ত পরিবেশে গলদা চিংড়ি বছরে ৩-৪ বার প্রজনন করতে পারে।

চিত্র: ডিমের প্রথম পর্যায় হলুদ রং ও ছাড়ার আগের ধূসর রং

মিলন ও ডিম পাড়া: গলদা চিংড়ি ৫-৬ মাসের মধ্যেই পরিপক্ব হয়। অনুকূল পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর পরিপক্কতা নির্ভরশীল। স্ত্রী চিংড়ির জননতনত্র ক্যারাপেসের তলায় থাকে ও ডিম পাড়ার ২-৩ দিন আগে দেখতে কমলা রঙের মতো হয়। চিংড়ি নিশাচর প্রাণী। অধিকাংশ মূল কর্মকা- রাতে ঘটে, যেমন -খাদ্য গ্রহণ, খোলস পাল্টানো, সঙ্গম ও ডিম পাড়া। একটি পুরুষ চিংড়ি ৩-৪ টি স্ত্রী চিংড়ির সাথে সঙ্গমে সক্ষম। লার্ভার জন্যে আধা-লবণাক্ত পানি প্রয়োজন। তাই প্রজননকালে এরা উপকূলে চলে আসে। মিঠা পানিতে প্রজনন এবং ডিম ফুটালেও লার্ভা ৪-৫ দিনের বেশি বাঁচে না। মিলনের আগে পরিপক্ক স্ত্রী খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়তে সময় লাগে প্রায় ১০-১৫ মিনিট। নতুন খোলস শক্ত হতে সময় লাগে প্রায় ৬ ঘণ্টা। স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গম করে খোলস ছাড়ার ৩-৬ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ নরম খোলস বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে শক্ত খোলস বিশিষ্ট পুরুষের মিলন ঘটে থাকে। মিলন হয় বুকে বুকে। মিলনকালে পুরুষ চিংড়ি তার সাদা আঠালো শুক্রাধারটি (পঞ্চম ভ্রমণপদের মাঝে) স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় ভ্রমণপদের গোড়ায় জননছিদ্রের কাছে আটকিয়ে দেয়। এ কাজটি শেষ হতে সময় লাগে ১৫-২০ মিনিট। মিলনের ১০-১২ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী চিংড়ি ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো বের হওয়ার পথে শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত ডিমগুলো পেটের তলায় সন্তরণ পদের মধ্যে অবস্থান নেয় এবং এক প্রকার আঠালো রসের সাথে আটকে থাকে। এ অবস্থায় এরা সন্তরণ পা নেড়ে ডিমে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ডিমগুলো এখানে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ৫০-১০০ গ্রাম ওজনের একটি প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়ি ৫০,০০০-১,০০,০০০ ডিম পাড়তে পারে। তবে পরিপক্বতার প্রাথমিক স্তরে এ সংখ্যা ৫,০০০-২০,০০০টি।

গলদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

গলদা চিংড়ি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহ শক্ত কাইটিনের আবরণে ঢাকা, যাকে বহিঃকঙ্কাল বলে। গলদা চিংড়ির দেহ মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ শিরোবক্ষ (Cephalothorax) শির বা মাথা এবং বক্ষাঞ্চল বা Thorax এর সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয় অংশ উদরাঞ্চল বা Abdomen। শিরোবক্ষ অঞ্চলটি একটি শক্ত আবরণ বা ক্যারাপেস দ্বারা ঢাকা থাকে।

গলদা চিংড়ির দেহে মোট ১৯টি খন্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি অংশ মস্তক অঞ্চলে, ৮টি বক্ষাঞ্চলে ও ৬টি উদরাঞ্চলে অবস্থিত। ভ্রূণ অবস্থায় এর দেহে ২০টি খন্ড থাকে। এর মধ্যে ১ম খন্ডটি পরবর্তীতে দুদিকে চক্ষুবৃন্ত গঠন করে বিধায় ভূণ-পরবর্তী অবস্থায় ১৯টি খন্ড দৃশ্যমান থাকে। গলদা চিংড়ির মাথা ও বুককে এক সঙ্গে শিরোবক্ষ বা সেফালোথোরাক্স বলা হয়। শিরোবক্ষের পশ্চাতে উদর অবস্থিত। উদর ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে টেলসন বা লেজে শেষ হয়েছে। টেলসনের উভয় পার্শ্বে পুচ্ছ পাখনা বা ইউরোপড (Uropod) অবস্থিত। চিংড়ির বহিরাবরণ কাইটিন নামক খোলস দিয়ে আবৃত যা ক্যালসিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত। এই খোলসগুলো চিংড়ির দেহের প্রতি অংশকে ঢেকে রাখে এবং একটি খোলস অপর খোলসের সঙ্গে একটি সন্ধিল পর্দা (Arthrodial membrane) দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। ফলে খোলসগুলো সহজেই প্রয়োজনে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে। চিংড়ির খোলসের অনেকগুলো স্তর আছে। একবারে উপরের স্তরটি শক্ত ও কোষবিহীন। শক্ত স্তরের নিচে একপ্রস্থ কোষ অবস্থিত। কোষের স্তরে রসগ্রন্থি বিদ্যমান। স্ক্লেরাইট (Sclerite) দ্বারা চিংড়ির প্রতিটি দেহখন্ড আবৃত থাকে। উদরে প্রধানত দু'টি স্ক্লেরাইট অবস্থিত; পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছোট অংশকে প্লিউরন (Pleuron) বলা হয়।

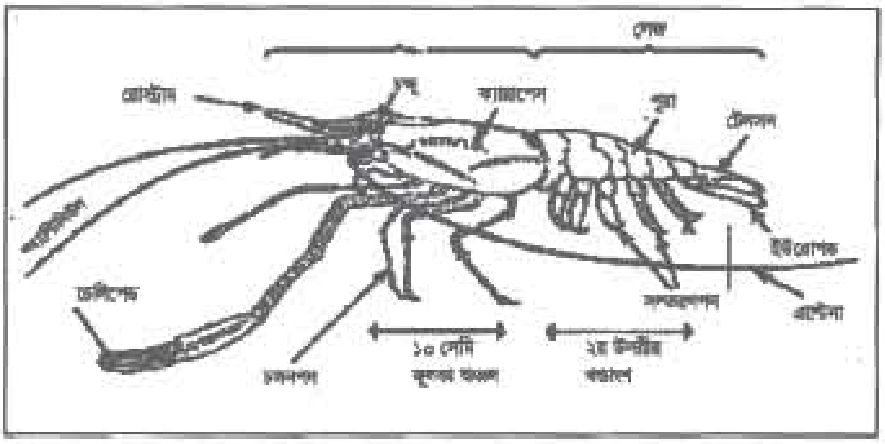

চিত্র: গলদা চিংড়ির বাহ্যিক গঠন

চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্ঠদেশাবরণ (Dorsal shield) বা শিরোবর্ম দ্বারা ঢাকা থাকে যা ক্যারাপেস (Carapace) নামে পরিচিত। পৃষ্ঠদেশের আবরণ উভয় পার্শ্ব হতে নিচের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে ফুলকার উভয় দিকে একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণকে ব্রাঙ্কিওস্টেগাইট (Branchiostegite) বলা হয়। এই আবরণ চিংড়ির শ্বাসযন্ত্র বা ফুলকাকে রক্ষা করে। পৃষ্ঠদেশের আবরণ হতে মধ্যরেখা বরাবর একটি অংশ সামনের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে দুই পার্শ্ব চাপা ও ঊর্ধ্বমুখী শক্ত করাতের মতো সম্প্রসারিত যা রোস্ট্রাম (Rostrum) নামে পরিচিত। এই রোস্ট্রাম ক্যারাপেসের সম্মুখভাগে অবস্থিত।

চিত্র: চিংড়ির রোস্ট্রাম

রোস্ট্রামের উপরের ও নিচের কিনারায় খাজ কাটা থাকে। চিংড়ি এই রোস্ট্রামের সাহায্যে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। রোস্ট্রামের গোড়ার উভয় পার্শ্বে ছোট দুটি কণ্টক থাকে। সামনের কণ্টকটিকে শুঙ্গ কণ্টক (Antennal spine) ও পিছনের কণ্টকটিকে যকৃৎ কণ্টক (Hepatic spine) বলা হয়। রোস্ট্রামের গোড়ার উভয় পার্শ্বে একটি করে সবৃন্তক পুঞ্জাক্ষি (Stalked compoind eye) অবস্থিত। বৃন্তের সাহায্যে চিংড়ি পুঞ্জাক্ষিকে চারদিকে ঘুরাতে সক্ষম হয়। শিরোবক্ষের অঙ্কীয়দেশের অগ্রভাগে ছোট মুখ অবস্থিত। মুখের সামনের উপরের অংশকে লেব্রাম (Labrum) বা ঊর্ধ্বোষ্ঠ ও নিচের অংশকে লেবিয়াম (Labium) বা নিম্নোষ্ঠ বলে। চিংড়ির লেজের অঙ্কীয়দেশে পায়ু অবস্থিত। চিংড়ির উদরের পঞ্চম উপাঙ্গের গোড়ার কেন্দ্রের দিকে পুরুষ চিংড়ির জনন রন্ধ্র এবং তৃতীয় উপাঙ্গের ঠিক একই স্থানে স্ত্রী চিংড়ির জনন রন্ধ্র উন্মুক্ত হয়।

চিংড়ির উপাঙ্গসমূহ

চিংড়ির দেহে সর্বমোট ১৯ জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ জোড়া উপাঙ্গ শিরোবক্ষ অংশে এবং ৬ জোড়া উদর অংশে অবস্থিত। তবে একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় পাঁচ জোড়া শিরোদেশে (Cephalic), আট জোড়া বক্ষদেশে (Thoracic) এবং ছয় জোড়া উপাঙ্গ উদর অঞ্চলে অবস্থিত। উপাঙ্গগুলো সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে; যথা—

১. ইউনিরেমাস (Uniramous)

২. বাইরেমাস (Biramous) ও

৩. মাল্টিরেমাস বা ফলিওরেমাস (Folioramous)

তবে গলদা চিংড়ির প্রথম উপাঙ্গ ছাড়া অন্য সবগুলো দ্বিবাহু বিশিষ্ট। মূল অংশটি দেহের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে যা প্রটোপোডাইট নামে পরিচিত। প্রটোপোডাইট (Protopodite) দুটি পডোমেরিস দ্বারা যুক্ত থাকে। নিচেরটিকে কক্সোপোডাইট এবং উপরের টিকে বেসোপোডাইট বলে। প্রটোপোডাইট দুটি শাখায় বিভক্ত; ভিতরের শাখাটিকে এন্ডোপোডাইট এবং বাইরের শাখাটিকে এক্সোপোডাইট বলে। চিংড়ির উপাঙ্গসমূহ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- স্টেনোপোডিয়াম (Stenopodium) বা সরু পা এবং ফাইলোপোডিয়াম (Phylopodium) বা চ্যাপ্টা আকৃতির পা।

চিত্র: চিংড়ির উপাঙ্গসমূহ

চিংড়ির শিরোপাঙ্গ

১. শুঙ্গাণু (Antennule)

২. শুঙ্গ (Antenna)

৩. ম্যান্ডিবুল (Mandible)

৪. ম্যাক্সিলুলা (Maxilula) ও

৫. ম্যাক্সিলা (Maxila)

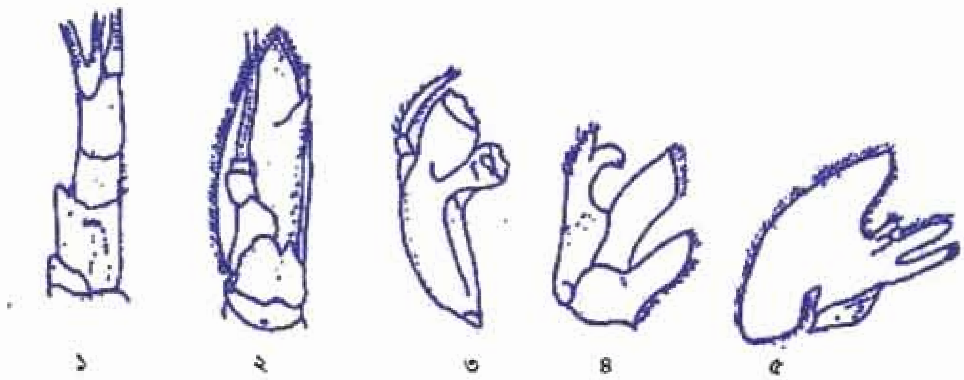

১ ২ ৩ ৪ ৫

চিত্র: চিংড়ির শিরোপাঙ্গ

১. শুঙ্গাণু (Antennule): দেহের প্রথম জোড়া উপাঙ্গকে শুঙ্গাণু বলে। শুঙ্গাণু প্রটোপোডাইট দ্বারা গঠিত এবং এটা সাধারণত প্রি-কক্সা, কক্সা ও বেসিস নামক তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রি-কক্সা অংশটি বড় এবং এই অংশে চিংড়ির ভারসাম্য রক্ষার অঙ্গ স্ট্যাটোসিস্ট অবস্থিত।

২. শুঙ্গ (Antenna): শুঙ্গাণুর ঠিক নিচে এবং পিছনস্থল থেকে শুঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে। শুঙ্গ চিংড়ির দ্বিতীয় জোড়া শিরোপাঙ্গ। শুঙ্গ কক্সা ও বেসিস নামক দুটি অংশে বিভক্ত। এই উপাঙ্গের এপোডাইট বড় এবং এন্ডোপোডাইট লম্বা। এন্ডোপোডাইটে অবস্থিত স্কোয়ামা (Squama) সাঁতার কাটার সময় চিংড়ির দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে থাকে।

৩. ম্যান্ডিবুল (Mandible): ম্যান্ডিবুল বা চোয়াল মুখের দুই পার্শ্বে অবস্থিত একজোড়া শক্ত উপাঙ্গ। ম্যান্ডিবুলের কক্সা অংশে চামচ আকৃতির এপাফাইসিস এবং মূল অংশে মোলার প্রসেস (Molar process) ও ইনসিজর প্রসেস (Incisor process) অবস্থিত। মোলার প্রসেসে ৫-৬ টি ডেন্টাল প্লেইট এবং ইনসিজর প্রসেসে ৩টি দাঁত থাকে। ম্যান্ডিবুলের সাহায্যে চিংড়ি খাদ্যবস্তু গ্রহণ ও পেষণ করে থাকে।

৪. ম্যাক্সিলুলা (Maxilula): চিংড়ির উপাঙ্গগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট উপাঙ্গটির নাম ম্যাক্সিলুলা। এই উপাঙ্গটি লেবিয়ামের পিছনে অবস্থিত এবং পাতলা আঁইশের ন্যায় তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। এর কিনারা ছোট ছোট সিটা দ্বারা আবৃত থাকে। ম্যাক্সিলুলার এন্ডোপোডাইট বাকানো এবং অগ্রভাগ দুভাগে বিভক্ত। কিন্তু এর কোনো এক্সোপোডাইট নেই। এই উপাঙ্গ খাদ্যবস্তু টুকরো টুকরো করে মুখের ভেতরে প্রবেশ করাতে সহায়তা করে থাকে।

৫. ম্যাক্সিলা (Maxila): এই উপাঙ্গ জোড়া পাতলা আঁইশের মত এবং ম্যাক্সিলুলার পিছনে অবস্থিত। এই উপাঙ্গের কক্সা বেশ বড় এবং বেসিস দুভাগে বিভক্ত হয়ে নেথোবেসে পরিণত হয়। ম্যাক্সিলা খাদ্য গ্রহণ ও শ্বসন কাজে সাহায্য করে থাকে।

চিংড়ির বক্ষ উপাঙ্গসমূহ (Thoracic Appendages)

চিংড়ির বক্ষদেশে মোট আট জোড়া উপাঙ্গ অবস্থিত। এর মধ্যে প্রথম তিন জোড়া উপাঙ্গকে ম্যাক্সিলিপেড (Maxilliped) এবং পরবর্তী পাঁচ জোড়াকে চলনপদ (Walking.legs) বলে।

১. প্রথম ম্যাক্সিলিপেডঃ এই উপাঙ্গগুলো সর্বাপেক্ষা ছোট। প্রথম ম্যাক্সিলিপেড পাতলা এবং ফাইলোপডিয়াম ধরনের। প্রথম ম্যাক্সিলিপেড খাদ্য ধরতে এবং শ্বসনকার্যে ব্যবহৃত হয়।

২. দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেডঃ দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেডের কক্সা ছোট এবং বাইরের দিকে এপিপডাইট ও ফুলকা অবস্থিত। এক্সোপডাইট লম্বা এবং সরু। দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড স্পর্শ ইন্দ্রিয়, খাদ্য ধারণ ও শ্বসনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেডঃ এই উপাঙ্গটি আকারে বেশ বড় এবং দেখতে অনেকটা চলন উপাঙ্গের মত। তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড চিংড়ির স্পর্শ ইন্দ্রিয়, খাদ্য ধরা এবং শ্বসন কাজে ব্যবহৃত হয়।

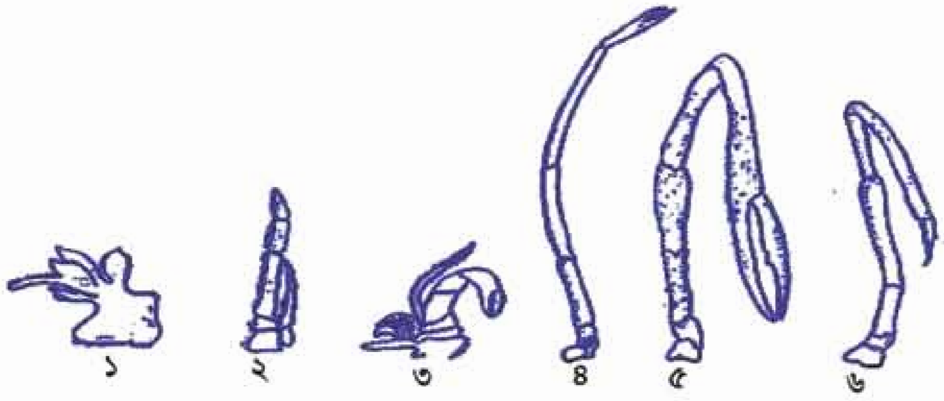

চিত্রঃ চিংড়ির বক্ষ উপাঙ্গসমূহ

চলনপদ (Walking legs): চিংড়ির দেহে পাঁচ জোড়া চলনপদ আছে। চলন পদের কোনোটি চিমটাযুক্ত এবং কোনটি চিমটাবিহীন। চিংড়ির চতুর্থ চলনপদকে আদর্শ চলনপদ বলা হয়। সন্ধিযুক্ত প্রপোডাইট এবং পাঁচটি সন্ধিযুক্ত এন্ডোপোডাইট নিয়ে চলনপদ গঠিত। চিংড়ির চলনপদে এক্সোপোডাইট ও এপিপডাইট থাকে না। প্রথম ও দ্বিতীয় চলন পদ চিমটাযুক্ত। এই উপাঙ্গের প্রোপডাস লম্বা হয়ে ডেকটাইলাসের শেষ প্রান্তে চিমটার আকার ধারণ করে। এই চিমটার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ নখযুক্ত। গলদা চিংড়ি ১ম ও ২য় পদের চিমটার সাহায্যে খাদ্য ধরা, আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক কাজ করে থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চলনপদ সাধারণ ধরনের এবং চিমটাবিহীন হয়ে থাকে। স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় চলন উপাঙ্গের গোড়ায় কক্সা নামক অংশে স্ত্রী জনন ছিদ্র এবং পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম চলন উপাঙ্গের কক্সায় গোড়ায় পুংজনন ছিদ্র অবস্থিত। একই বয়সের পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় চলনপদ স্ত্রী চিংড়ির তুলনায় বেশি উজ্জ্বল, আকারে বড় এবং চিমটা অংশে বেশি কাঁটা দেখা যায়।

উদর উপাঙ্গ (Abdominal appendages): শিরোবক্ষের পরের দেহ অংশকে উদর বলা হয়। উদরের শেষ ভাগ ক্রমশ সরু হয়ে শেষ হয়। চিংড়ির উদরে মোট ছয় জোড়া উপাঙ্গ আছে। উদরের সব কয়টি উপাঙ্গই সাঁতার কাটার কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে সন্তরণপদ (Swimmerets) বলা হয়। এরা প্লিওপড (Pleopods) নামেও পরিচিত।

২০২২

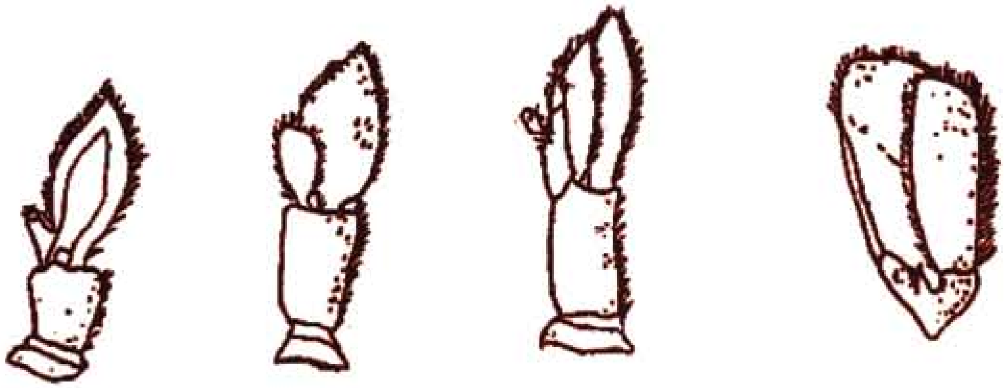

চিত্রঃ চিংড়ির উদর উপাঙ্গসমূহ

তৃতীয় উদর উপাঙ্গ চিংড়ির আদর্শ সন্তরণ উপাঙ্গ হিসেবে পরিচিত। প্রজনন মৌসুমে স্ত্রী গলদা চিংড়ি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তরণপদের সাহায্যে ডিম বহন করে থাকে। ষষ্ঠ উদর উপাঙ্গটি টেলসনের পাশে অবস্থিত। এই উপাঙ্গের কন্ত্রা ও বেসিস একত্রিত হয়ে ত্রিকোণাকৃতির খন্ডের সৃষ্টি করে। এই উপাঙ্গকে ইউরোপড বা পুচ্ছ পাখনা বলে। পুচ্ছ পাখনা সাঁতার কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পাখনার সাহায্যে চিংড়ি প্রয়োজনে পিছনের দিকে দ্রুত চলে যেতে পারে।

চিংড়ির বিভিন্ন উপাঙ্গের কাজ

অঙ্গ	উপাঙ্গ	উপাঙ্গের কাজ
মাথা	শুঙ্গ	স্বাদ ও স্পর্শ
	শুঙ্গাণু পুঞ্জাক্ষি	দেহের ভারসাম্যতা, স্বাদ ও স্পর্শ তীব্র আলোতে ও স্তিমিত বা অস্পষ্ট আলোকে দেখতে সহায়তা করে
	রোস্ট্রাম	আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়
	ম্যান্ডিবুল ম্যাক্সিলুলা ম্যাক্সিলা	খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য চিবানো ও খাদ্য নাড়াচাড়ার কাজে সাহায্য করে
	প্রথম ম্যাক্সিলিপেড দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড	স্পর্শ, স্বাদ, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য টুকরা ও মুখ থেকে বর্জিত খাদ্যাংশ দূরীকরণে ও শ্বাসকার্যে সহায়তা করে
বুক	প্রথম চলন পদ দ্বিতীয় চলন পদ তৃতীয় চলন পদ চতুর্থ চলন পদ পঞ্চম চলন পদ	খাদ্য আঁকড়িয়ে ধরা এবং আত্মরক্ষা ও হাঁটার কাজ করে ফুলকাতে পানি সরবরাহ ও শ্বসন কাজে সহায়তা করে

২০২২

উদর	প্রথম সন্তরণ পদ	স্ত্রী চিংড়ির শুক্র স্থানান্তরে কাজ করে। সন্তরণ কাজে সহায়তা করে
	দ্বিতীয় সন্তরণ পদ	পানি সংবহনে সহায়তা করে
	তৃতীয় সন্তরণ পদ	সন্তরণে কাজ করে
	চতুর্থ সন্তরণ পদ	ডিম রক্ষায় কাজ করে
	পঞ্চম সন্তরণ পদ	
	পুচ্ছ পদ	সন্তরণ কাজে সহায়তা করে প্রয়োজনে পিছনের দিকে চলে যেতে সহায়তা করে

গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ গঠন ও অঙ্গসমূহ

দেহের অভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের কার্যকারিতার ফলে চিংড়ি জীবনধারণ করে থাকে। চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান প্রধানত পুষ্টিতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র নিয়ে গঠিত।

চিংড়ির পুষ্টিতন্ত্র (Digestive system)

যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিংড়ির পুষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের সমষ্টিকে চিংড়ির পুষ্টিতন্ত্র বলা হয়। চিংড়ির পুষ্টিতন্ত্র সাধারণত পরিপাকনালী ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস নামক পরিপাক গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। পরিপাকনালী মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিপাকনালী প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা—

ক) অগ্রপরিপাকনালী (Forgut)
খ) মধ্য পরিপাকনালী (Midgut) ও
গ) পশ্চাৎ পরিপাকনালী (Hind gut)।

ক) অগ্রপরিপাকনালী (Forgut): মুখ, মুখগহ্বর, অন্ননালী ও পাকস্থলী নিয়ে অগ্রপরিপাকনালী গঠিত।

মুখ (Mouth): মস্তক খন্ডের নিচের দিকে মুখের অবস্থান। এর অগ্রভাগে উর্ধ্বোষ্ঠ বা লেব্রাম এবং পশ্চাৎ দিকে নিম্নোষ্ঠ বা লেবিয়াম অবস্থিত। এছাড়া ম্যান্ডিবুলের দুই পার্শ্বে দুটি ইনসিজর প্রসেস থাকে। নিম্নোষ্ঠের উভয় পার্শ্বে দুটি প্রশস্ত অংশ থাকে যা প্যারাগনাথা (Paradnatha) নামে পরিচিত।

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র

মুখ গহ্বর (Buccal cavity): মুখের পিছনেই মুখ গহ্বর অবস্থিত। মুখ গহ্বরের দুই পাশে ম্যান্ডিবুলের মোলার প্রসেস থাকে, এর সাহায্যে খাদ্যবস্তু মুখ গহ্বরে পেষিত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

অন্ননালী (Oesophagus): এটা পেশিযুক্ত মোটা নালীবিশেষ যা মুখ গহ্বরের পিছন থেকে শুরু হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করেছে। এই প্রবেশপথে কপাটিকা থাকে। এর ফলে খাদ্যবস্তু একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে আর অন্ননালীতে ফিরে আসতে পারে না।

পাকস্থলী (Stomach): পরিপাকনালীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের থলিটির নাম পাকস্থলী। পাকস্থলী চিংড়ির শিরোবক্ষের বেশির ভাগ স্থান দখল করে থাকে। পাকস্থলী প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক) কার্ডিয়াক পাকস্থলী ও

খ) পাইলোরিক পাকস্থলী।

খ) মধ্য পরিপাকনালী (Mid gut)

পাইলোরিক পাকস্থলীর পরবর্তী ভাগ থেকে মধ্য পরিপাকনালী শুরু। এই নালীটি লম্বা, সরু, সোজা ও নলাকৃতির এবং দেহের মাঝামাঝি স্থান বরাবর পিছনের দিকে ষষ্ঠ উদর খন্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য পরিপাকনালীর ভেতরের দেয়াল এপিথেলিয়াম স্তর দ্বারা আবৃত এবং এর পিছনের অংশ লম্বালম্বি অসংখ্য ভাঁজ দ্বারা সজ্জিত থাকে।

গ) পশ্চাৎ পরিপাকনালী (Hind gut)

মধ্য পরিপাকনালীর পরবর্তী অংশকে পশ্চাৎ পরিপাকনালী বলে এবং এই নালী পায়ু পর্যন্ত বিস্তত। পরিপাকনালীর এই অংশ স্ফীত হয়ে পুরু মাংসপেশী দ্বারা গঠিত ছোট থলিতে পরিণত হয়েছে। এই থলিকে মলাশয় বা রেকটাম (Rectum) বলে। এই মলাশয় সর্বশেষ উদর উপাঙ্গ দুটির মাঝ বরাবর একটি ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। এই পথকে পায়ুপথ (anus) বলে। পায়ুপথে মল দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

যকৃত-অগ্নাশয় গ্রন্থি (Hepatopancreas)

শিরোবক্ষের গহ্বরে কমলা রং এর এক প্রকার অঙ্গ দেখা যায়, একে যকৃত-অগ্নাশয় গ্রন্থি বলে। এই অঙ্গটি কার্ডিয়াক পাকস্থলীর শেষ অংশ, পার্শ্বদেশ, পাইলোরিক পাকস্থলী ও মধ্য অন্ননালীর কিছু অংশকে ঢেকে রাখে। হেপাটোপ্যানক্রিয়াস প্রধানত পাচক রস নিঃসরণ, খাদ্যরস শোষণ এবং গ্লাইকোজেন ও ফ্যাট প্রভৃতি সঞ্চয় করে রাখে। এই গ্রন্থি যকৃত-অগ্নাশয় উভয়ের কাজ করে বলে একে হেপাটোপ্যানক্রিয়াস বা যকৃৎ-অগ্নাশয় গ্রন্থি বলে।

চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া

চিংড়ি সাধারণত প্রথম ও দ্বিতীয় চলনপদের সাহায্যে খাদ্য ধরে এবং মুখছিদ্রের সম্মুখে নিয়ে আসে। এই ক্রিয়ায় তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড সাহায্য করে থাকে। চিংড়ি ম্যান্ডিবুলের সাহায্যে খাদ্যবস্তু টুকরা টুকরা করে এবং পরে মোলার প্রসেস দ্বারা খাদ্যবস্তু চূর্ণ-বিচুর্ণ করে অন্ননালী দিয়ে কার্ডিয়াক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। অন্ননালী ও কার্ডিয়াক পাকস্থলী পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্য কার্ডিয়াক পাকস্থলীতে আসে। অতঃপর চূর্ণ-বিচুর্ণ খাদ্য কণাগুলো কার্ডিয়াক পাকস্থলী থেকে পাইলোরিক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচকরস যকৃৎ-অগ্নাশয় নালী দিয়ে পাইলোরিক পাকস্থলীতে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়। এই পাচকরস মিশ্রিত খাদ্য হেস্টেট প্লেটের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রিস্টল এবং কমবেড প্লেট দ্বারা খাদ্য আরও ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়। পাইলোরিক পাকস্থলীতেও খাদ্য পরিপাক হয়। পাইলোরিক পাকস্থলীর ফিল্টার প্লেটের সাহায্যে পরিশ্রুত তরল খাদ্য যকৃত-অগ্নাশয়ের নালীর ছিদ্রপথ দিয়ে যকৃৎ-অগ্নাশয়ে প্রবেশ করে এবং এখানে খাদ্য শোষিত হয়। যকৃৎ অগ্নাশয় গ্রন্থি হজম এবং খাদ্যের সার অংশ ১০১১

শোষণের কাজ করে থাকে। পাইলোরিক পাকস্থলীর অবশিষ্ট খাদ্যরস ও কঠিন অপাচ্য খাদ্য মধ্য অন্ত্রনালীতে প্রবেশ করে। মধ্য অন্ত্রনালী অন্ত্রেও তরল খাদ্যের মূলরস শোষিত হয় এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে সাময়িকভাবে মলাশয়ে জমা থাকে এবং পরে পায়ুপথ দিয়ে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিংড়ির জননতন্ত্র (Reproductive system)

চিংড়ি একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী। যৌন জননের (Sexual reproduction) দ্বারা প্রাণী সাধারণত বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। যৌন জননের জন্য প্রাণীদেহে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ থাকে। এই অঙ্গ থেকে জননকোষ অর্থাৎ শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এদের প্রাথমিক জনন অঙ্গ বা গোনাড (Gonad) বলা হয়। জননকোষ প্রাথমিক জনন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়ে কয়েকটি নালীর মধ্য দিয়ে পরিশেষে ছিদ্র পথে দেহের বাইরে চলে আসে। এই নালীগুলোকে জন নালী (Genital duct) ও ছিদ্রগুলোকে জনন ছিদ্র (Gonopores) বলা হয়। এগুলোকে গৌণ জনন অঙ্গ (Secondary reproductive organ) বলা হয়। এই প্রাথমিক ও গৌণ জনন অঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট জননতন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীকুল জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এই অঙ্গতন্ত্রকে জননতন্ত্র (Reproductive system) বলা হয়।

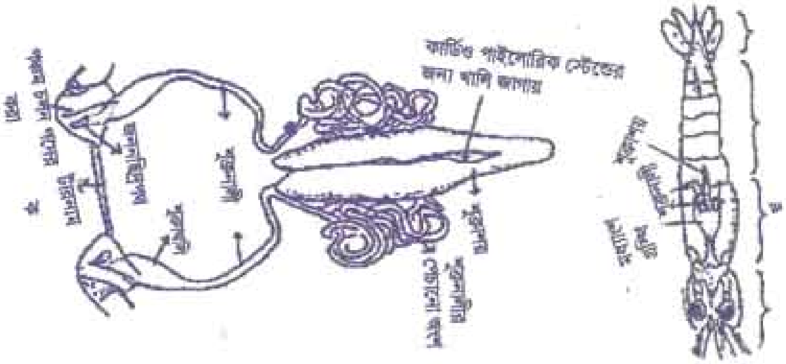

চিত্র: (ক) পুরুষ চিংড়ির প্রজনন অঙ্গ, (খ) শুক্রাশয় ও শুক্রনালীর অবস্থান

পুংজননতন্ত্র (Male reproductive system)

চিংড়ির পুংজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো দ্বারা গঠিত:

ক) শুক্রাশয়, খ) শুক্রনালী, গ) শুক্রথলি ও ঘ) পুংজনন ছিদ্র

ক) শুক্রাশয় (Testes): চিংড়ির দেহে একজোড়া শুক্রাশয় থাকে। এটা নরম ও লম্বা। শুক্রাশয় হৃদযন্ত্রের নিচে এবং যকৃত অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ঠিক উপরে অবস্থান করে। শুক্রাশয়ের অগ্রভাগগুলো পরস্পর যুক্ত ও রেচনথলি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঙ্গে অসংখ্য লবিউল (Lobules) দেখা যায়। এ লবিউলের ভিতরে স্পারমেটোসাইটস থেকে একটি করে স্পারমাটোজোয়া (Spermatojoa) তৈরি হয়। একটি পরিপক্ব শুক্রকীট (Sperm) দেখতে অনেকটা খোলা ছাতার মতো।

খ) শুক্রনালী (Vasa deferentia): চিংড়িতে একজোড়া শুক্রনালী দেখা যায়। প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাদপ্রান্ত থেকে একটি করে নালী বের হয়, একে শুক্রনালী বলে। শুক্রনালীর প্রথমাংশে একসাথে কুণ্ডলাকারে জড়িয়ে থাকে এবং এই অংশ যকৃত অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির উপরে অবস্থান করে এবং পরবর্তী অংশে বক্ষ প্রাচীরের মাধ্যমেই শুক্রকীট শুক্রাশয় থেকে পুংজনন ছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়।

গ) শুক্রথলি (Seminal vesicles): প্রতিটি শুক্রনালী পঞ্চমপদ উপাঙ্গের গোড়ায় এসে কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়ে ক্লাব আকৃতির (Club shaped) থলিতে পরিণত হয়, এই থলিকে শুক্রথলি বলে। শুক্রথলিতে শুক্রকীটগুলো একত্রে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এগুলোকে স্পারমাটোফোরস (Spermatophores) বলে।

ঘ) পুংজনন ছিদ্র (Male genital aperture): শুক্রথলি শুক্রনালীর মাধ্যমে পঞ্চম চলন উপাঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত একটি ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্র পথকে পুংজনন ছিদ্র বলা হয়। পুংজনন ছিদ্রটি একটি ঢাকনা দ্বারা আবৃত থাকে। এই ছিদ্রপথে স্পারমাটোফোর দেহের বাইরে চলে আসে।

স্ত্রী জননতন্ত্র (Female reproductive system)

চিংড়ির স্ত্রী জননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী ও স্ত্রীজনন ছিদ্র সমন্বয়ে গঠিত।

ক) ডিম্বাশয় (Ovaries): স্ত্রী চিংড়ির প্রধান জনন অঙ্গ ডিম্বাশয় হৃৎপিণ্ডের নিচে ও যকৃত অগ্ন্যাশয়ের পিছনে উপরের দিকে অবস্থান করে এবং সম্মুখের দিকে রেনাল স্যাক বা রেচনথলি ও পশ্চাৎদিকে উদর খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। ডিম্বাশয় দুইটি সামনে ও পিছনের দিকে যুক্ত থাকে এবং মধ্যভাগে পরস্পর পৃথক হয়ে একটি ছোট ফাঁক সৃষ্টি করে। ডিম্বাশয়ের ভিতরেই ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণুগুলো গোলাকার কোষ বিশেষ। পরিপক্ক ডিমে সাইটোপ্লাজমের কুসুমদানা ও মাঝখানে বড় নিউক্লিয়াস থাকে।

চিত্র:(ক) স্ত্রী চিংড়ির প্রজনন অঙ্গ, (খ) পরিপক্ক ডিম্বাশয়

খ) ডিম্বনালী (Oviducts): পাতলা প্রাচীর দ্বারা ডিম্বনালী আবৃত থাকে। ডিম্বনালীর উৎপত্তি ডিম্বাশয়ের মধ্যভাগের বাহির অংশ থেকে হয়। এই নালীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল স্ফীত হয় কিন্তু ক্রমশ সরু হয়ে বক্ষ প্রাচীর বরাবর অঙ্কীয় দেশে তৃতীয় চলনপদের দিকে অগ্রসর হয়ে কক্সার গোড়ায় অবস্থিত স্ত্রী জনন ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন ডিম্বাণু ডিম্বনালীর মাধ্যমে স্ত্রীজনন ছিদ্র দিকে অগ্রসর হয়।

গ) স্ত্রীজনন ছিদ্র (Female genital apertures): ডিম্বনালী চিংড়ির তৃতীয় চলনপদের গোড়ার ভেতরের দিকে উঁচু স্থানে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্রকে স্ত্রীজনন ছিদ্র বলা হয়। স্ত্রীজনন ছিদ্র দিয়ে ডিম্বাণু দেহের বাইরে নির্গত হয়।

জীবনচক্র

গলদা চিংড়ির জীবনচক্রে ৪টি প্রধান অবস্থা রয়েছে। যেমন-ডিম, লার্ভা, পোস্ট লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি।

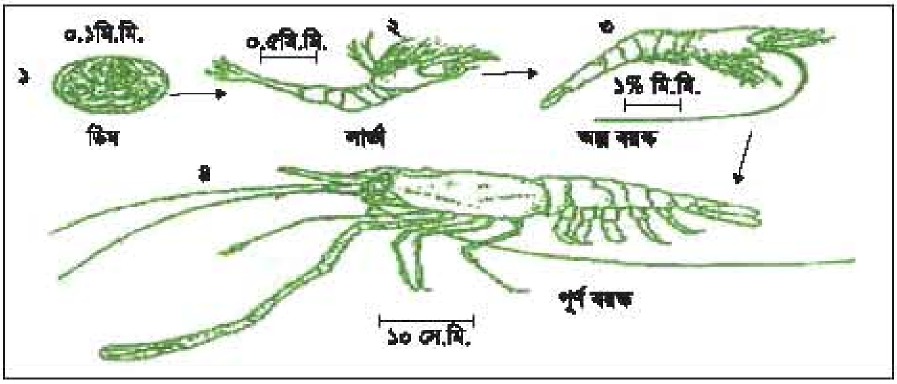

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির জীবন চক্র

ডিমঃ স্ত্রী গলদা চিংড়ির ডিমের রং প্রথমে কমলা থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ১৮-২১ দিনে কালচে ধূসর রং ধারণ করে। ২৮° সে তাপমাত্রায় ডিম ফুটতে প্রায় ১৮-২১ দিন সময় লাগে। গলদা চিংড়ির ডিম সর্বদা রাতের বেলা ফোটে, কখনো দিনের বেলায় ফোটে না। ডিম ফোটার পর স্ত্রী চিংড়ি সন্তরণ পদ নেড়ে লার্ভাগুলোকে পানিতে ছড়িয়ে দেয়। ডিম থেকে লার্ভা বের হতে ২ রাত পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

লার্ভাঃ লার্ভা দেখতে অনেকটা পোকার মত। এরা লেজ উপরে এবং মাথা নিচে রেখে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় এরা আধা লবণাক্ত (১২-১৫ পিপিটি) পানিতে অবস্থান করে এবং প্রাণিকণা খেতে শুরু করে। লার্ভা অবস্থা শেষ হতে ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

পোস্ট লার্ভাঃ পোস্ট-লার্ভায় পৌঁছানোর পর এদের স্বভাব পরিবর্তন হয়। তখন এদেরকে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো দেখায় এবং নদী, খাল বা বিলের পাড়ের কাছে তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে। এ অবস্থায় এরা অপেক্ষাকৃত বড় খাদ্য টুকরা (উদ্ভিদ ও প্রাণিজ) খেতে পারে। পোস্টলার্ভার লবণাক্তা সহনশীলতা বিস্তৃত। পোস্টলার্ভা অবস্থায় আসার ৭-১৫ দিনের মধ্যে (১.৫ সেমি.) এরা মিঠা পানির দিকে চলে আসতে শুরু করে। এ অবস্থায় এরা নদী স্রোতের বিপরীতে নদীর পাড় বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। প্রায় ৩০ দিনের মধ্যে পোস্টলার্ভা কিশোর চিংড়িতে (৩ সেমি) পরিণত হয়। ২-৩ মাস বয়সে (৬-৭ সেমি) এরা তরুণ এবং এর আরও ৩-৪ মাস পরে প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়িতে পরিণত হয়।

লার্ভার ধাপসমূহ

হ্যাচারিতে লার্ভা ঠিকভাবে বড় হচ্ছে কি না এবং খোলস পরিবর্তন হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হয়। পানি ব্যবস্থাপনাসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির তাপমাত্রা, পানির গুণাগুণ এবং খাদ্য পুষ্টির উপর লার্ভার ধাপ পরিবর্তন এবং রূপান্তরের সময় নির্ভরশীল। লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ চিংড়িতে রূপান্তরের (Metamorphosis) পূর্বে লার্ভা ১১টি ভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। প্রথম পর্যায়ে চঞ্চুর (Rostrum) আগা থেকে লেজের (Telson) শেষ মাথার দৈর্ঘ্য ২ মিমি এর কম থাকে। রূপান্তরের সময়ে এর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৭ মিমি। অপর পৃষ্ঠায় গলদা চিংড়ির লার্ভা অবস্থার ১১টি পর্যায়ের বা ধাপের শনাক্তকরণ সহজ সহায়ক সংকেত এবং চিহ্নিত চিত্র দেয়া হলো।

পর্যায়	উল্লেখযোগ্য শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য		ফোটার পর অতিক্রান্ত দিন
১	চক্ষু বৃন্তহীন (Sessile eyes)	১-২	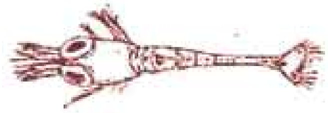
২	চক্ষু সবৃন্তক (Stalked eyes)	২-৪	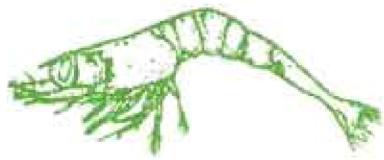
৩	পুচ্ছ পদের (Uropods) আবির্ভাব ঘটে	৪-৭	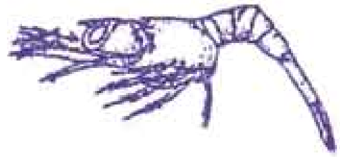
৪	চঞ্চু (Rostrum) পৃষ্ঠে দুটি দাঁত দেখা যায়	৭-১২	
৫	লেজ (Telson) সরু এবং প্রলম্বিত	১১-১৬	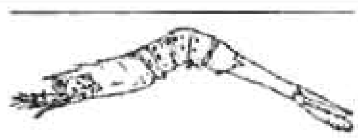
৬	সন্তরণ পদে (Pleopods) কুঁড়ি দেখা যায়	১৫-২১	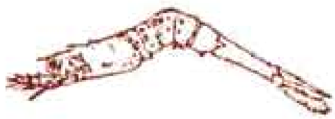
৭	সন্তরণ পদ দ্বিশাখাবিত এবং সিটা (Setae) বিহীন	১৮-২৪	
৭	সন্তরণ পদ সিটাযুক্ত	২২-২৮	

২০২২

পর্যায়	উল্লেখযোগ্য শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য		ফোটার পর অতিক্রান্ত দিন
৯	অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix internae) দেখা যায়	৯	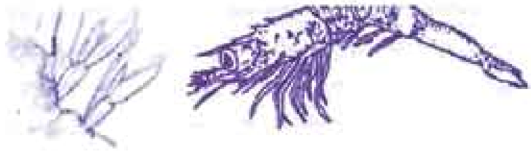
১০	চঞ্চুতে ৩-৪টি দাঁত উদয় হয়	২৮-৩৩	
১১	চঞ্চুর উপরের দিকের অর্ধেক পর্যন্ত দাঁতের আবির্ভাব ঘটে এবং করাতের মতো দেখা যায়	৩১-৫০	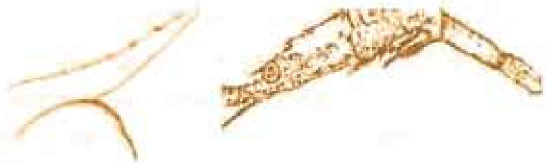
১২	রূপান্তর (Metamorphosis) চঞ্চুর উপরে ও নিচের প্রান্তে দাঁত দেখা যায়। সন্তরণ অভ্যাসে পরিবর্তন দেখা যায়। দেখতে সাধারণত স্বচ্ছ থাকে। মাথায় একটি হালকা বাদামি রঞ্জকধারী কোষ থাকে।	৩৫-৪০	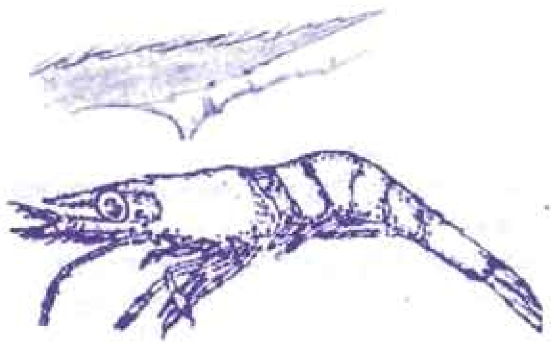

পানির তাপমাত্রা ২৮- ৩০° সে, রাখতে পারলে ২৫ দিনেই লার্ভা থেকে পাস্ট লার্ভা রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের চলমান আবহাওয়ায় প্রায় ৩০ দিন সময় লাগে। ১১ নং দশা পর্যন্ত লার্ভা পানিতে চিৎ হয়ে অর্থাৎ বুক উপরে রেখে সাঁতার কাটে বা চলাচল করে। পিএল বা জুভেনাইল অবস্থায় এরা বুক নিচের দিকে রেখে বড় চিংড়ির ন্যায় চলাচল করে। পিএল-এর পর্যায় শনাক্তকরণের জন্য বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা যায়। এ সময় লার্ভার খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা তার খাদ্যনালী ও পাকস্থলী পরীক্ষা করে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ও খাদ্যের প্রকার নির্ধারণ করা যায়। এছাড়া এ সময় পোনার পরজীবী সংক্রমণ এবং অন্য অন্য রোগের
২০২২ তথ্যাদিও সংগ্রহ করা যায় এবং এর প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়। এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ প্রতিদিন

পরীক্ষাগারে অভিজ্ঞ লোক দ্বারা সম্পাদন করতে হয়।

চিংড়ির বৃদ্ধি ও খোলসছাড়া (Growth and Moulting)

গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্ন নয়। চিংড়ির দেহ খোলস দ্বারা আবৃত থাকে। এই খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমেই চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে। চিংড়ির বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে পুরাতন খোলস খসে পড়ে এবং নতুন খোলসের সৃষ্টি হয়। চিংড়ির এই খোলস বদলানোর প্রক্রিয়াকে একডাইসিস (Ecdysis) বলে। খোলস বদলানোর প্রক্রিয়া সাধারণত রাতেই ঘটে। ছোট অবস্থায় নতুন খোলস শক্ত হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে এবং বড় অবস্থায় শক্ত হতে ১-২ দিন সময় লাগে। খোলস বদলানোর সময় চিংড়ি শারীরিকভাবে খুব দুর্বল থাকে। খাদ্য, আবহাওয়া, পরিবেশ, পানির গুণাগুণ, তাপমাত্রা, রোগবালাই প্রভৃতির ওপর চিংড়ির খোলস বদলানো নির্ভরশীল। লার্ভা অবস্থায় এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে চিংড়ি এগার বার খোলস পরিবর্তন করে থাকে। গলদা চিংড়ি জুভেনাইল অবস্থায় ৫-১০ দিন অন্তর একবার এবং বড় অবস্থায় ২০-৪০ দিনে একবার খোলস ছাড়ে। চিংড়ির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খোলস পরিবর্তনের সময়ের ব্যবধানও বাড়তে থাকে। প্রায় চার বৎসর বয়সে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সমাপ্ত হয়। গলদা চিংড়ির আয়ুষ্কাল সাধারণত ৩-৪ বছর হয়ে থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ির পার্থক্য

- স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা চিংড়ি বেশি বাড়ে, তাই একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে খানিকটা বড় হয়। পুরুষ চিংড়ির শিরোবক্ষ (Cephalothorax) আকারে মোটা এবং বড় হয় আর উদরাঞ্চল (Abdomen) অপেক্ষাকৃত সরু দেখায়। অপরদিকে স্ত্রী চিংড়ির মাথা ও দ্বিতীয় বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে এবং উদরাঞ্চলের তলারদিকে ডিমধারণের জন্য নিম্নেদর অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়।
- পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় ভ্রমণপদ লম্বা, মোটা, রঙিন, কন্টকযুক্ত এবং চিমটা বিশিষ্ট। এই দ্বিতীয় বাহুর দ্বারা পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়িকে সঙ্গমকালে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখে।
- পুরুষ চিংড়ির প্রথম উদর খন্ডের বুকের দিকে মাঝখানে একটা ছোট কাটার মত দেখা যায় যা স্ত্রী চিংড়ির থাকে না। পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় সন্তরণপদের ভিতরের দিকের পত্রের (Endopodite) গোড়ায় লোমের মত অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা (Appendix masculina) থাকে। জুভেনাইল অবস্থায় এই এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা দেখে পুরষ চিংড়ি শনাক্ত করা যায়। স্ত্রী চিংডির এ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকলিনা থাকে না।
- স্ত্রী চিংড়ির পিঠের খোলসগুলো পুরুষ চিংড়ি অপেক্ষা বড় হয় এবং উভয় দিকে নেমে এসে ডিমগুলো ঢেকে রাখতে সাহায্য করে।
- পুরুষ চিংড়ির জনন ছিদ্র পঞ্চম চলনপদের গোড়ায়, আর স্ত্রী চিংড়ির জনন ছিদ্র তৃতীয় চলনপদের গোড়ায় অবস্থিত।
- পরিপক্ক স্ত্রী চিংড়ির মাথার দিকে ক্যারাপেসের নিচে ও পার্শ্বে গোলাপি/কমলা রং এর আভা দেখে ওভারির অভ্যন্তরে ডিমের উপস্থিতি বুঝা যায়। কিনতু পুরুষ চিংড়ির ওভারি থাকে না। পুরুষ গলদা চিংড়ির ৫ম জোড়া চলনপদের দুইটি গোড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব স্ত্রী গলদা চিংড়ি অপেক্ষা সরু হয়ে থাকে।

চিত্র: স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ি

চিত্র: স্ত্রী চিংড়ি

চিত্র: পুরুষ চিংড়ি

বিভিন্ন ধরনের পুরুষ গলদা চিংড়ি

প্রকৃতিতে সাধারণত তিন ধরনের পুরুষ গলদা চিংড়ি পাওয়া যায় যেমন—

১. নীল নখর (Blue claw) বিশিষ্ট পুরুষ চিংড়ি

এগুলো বড় আকৃতি বিশিষ্ট। এদের নখর ও দেহের অনুপাত ১.৬ ± ০.১। এ ধরনের পুরুষ গলদা চিংড়ির আচরণ রাজকীয়, মিলন পদ্ধতি জটিল এবং বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত ধীর। এদের স্বজাতিভোজিতা অত্যন্ত প্রকট।

২. কমলা নখর (Orange claw) বিশিষ্ট পুরুষ চিংড়ি

এটি নীল নখরের মধ্যাকৃতির চেয়ে বড় এবং কমলা রঙের নখর বিশিষ্ট। এদের নখর ও দেহের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.০ ± ০.০৫। এদের ডিম শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্তকরণের হার তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু দৈহিক বৃদ্ধি খুব দ্রুত। এদের স্বজাতিভোজিতা নীল নখর বিশিষ্ট পুরুষ চিংড়ি অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম।

৩. ক্ষুদ্রাকৃতির নীল নখর (Small Blue claw) বিশিষ্ট পুরুষ চিংড়ি

এ ধরনের পুরুষ চিংড়ি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। এদের দেহের নখর কাটাবিহীন পরিষ্কার এবং নখর ও দেহের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ০.৫ ± ০.১। পুরুষ গলদা ও স্ত্রী গলদার সাথে মিলনের সময়, "সর্প মিলন" কৌশল (Snake mating strategy) অবলম্বন করে। এদের দেহের বৃদ্ধির হার তিন ধরনের পুরুষ চিংড়ির মধ্যে সবচেয়ে কম। এদের স্বজাতিভোজিতাও তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম।

বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী গলদা চিংড়ি

প্রকৃতিতে স্ত্রী গলদা চিংড়িও সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন

১. ভার্জিন স্ত্রী গলদা চিংড়ি — ওভারি পরিপক্ব নয় বা ডিম বহন করছে না এমন স্ত্রী গলদা চিংড়ি

২. ডিমবাহী স্ত্রী গলদা চিংড়ি — ডিম বহন করছে এমন স্ত্রী গলদা চিংড়ি

৩. উন্মুক্ত ডিম্বথলি বিশিষ্ট স্ত্রী গলদা চিংড়ি — ডিম ছেড়ে দিয়েছে এমন স্ত্রী গলদা চিংড়ি

স্ত্রী গলদা চিংড়িগুলো পুরুষ গলদা চিংড়ি অপেক্ষা কম আগ্রাসী এবং কম স্বজাতিভোজী হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. মিঠা পানির গলদা চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটন থেকে পোস্ট লার্ভা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ কোথায় সম্পন্ন হয়?
২. চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্ঠদেশের আবরণ কি নামে পরিচিত?
৩. চিংড়ি কিসের দ্বারা পুঞ্জাক্ষীকে চারিদিকে ঘুরাতে পারে?
৪. চিংড়ির দেহে সর্বমোট কয় জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে?
৫. প্রটোপাডোইটের বাইরের শাখাটি কি নামে পরিচিত?
৬. চিংড়ির কোন উপাঙ্গকে শুঙ্গাণু বলা হয়?
৭. সাঁতার কাটার সময় কোন অঙ্গের সাহায্যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে?
৮. চিংড়ির কোন চলনপদকে আদর্শ চলনপদ বলা হয়?
৯. কোন উপাঙ্গকে চিংড়ির আদর্শ সন্তরণ উপাঙ্গ বলা হয়?
১০. কোন উপাঙ্গের সাহায্যে চিংড়ি পিছনের দিকে দ্রুত চলে যেতে পারে?
১১. মুখ গহ্বরের কোথায় মালোর প্রসেস অবস্থিত?
১২. গলদা চিংড়ির ডিম ফুটতে মোট কত সময় লাগে?
১৩. গলদা চিংড়ির ডিম ফুটার জন্য পানির লবণাক্ততা কত হওয়া দরকার?
১৪. লার্ভা অবস্থায় গলদা চিংড়ি কতবার খোলস পাল্টায়?
১৫. লার্ভা থেকে পোস্ট লার্ভা অবস্থায় পৌছাতে গলদা চিংড়ির কতদিন সময় লাগে?
১৬. জুভেনাইল অবস্থায় চিংড়ি কতদিন অন্তর একবার খোলস বদলায়?
১৭. গলদা চিংড়ির বৈজ্ঞানিক নাম কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ির শিরোপাঙ্গগুলোর নাম লেখ।
২. একডাইসিস বলতে কি বোঝ লেখ।
৩. গলদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লেখ।
৪. বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী গলদা চিংড়ির নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন।

১. চিংড়ির বিভিন্ন উপাঙ্গের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
২. চিংড়ির খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৩. গলদা চিংড়ির লার্ভার রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গলদা চিংড়ি চাষ

গলদা চিংড়ি চাষের পটভূমি

গলদা চিংড়ি মিঠা ও ঈষৎ লোনা পানিতে বসবাসকারী চিংড়ির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আকারের চিংড়ি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই চিংড়ির গুরুত্ব আমাদের সকলেরই জানা। প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা জলাশয় থেকে গলদা চিংড়ি আহরণ করেই আমাদের চিংড়ি রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমঅগ্রসরমান। কিন্তু বিশ্ববাজারে গলদা চিংড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহরণ করে এই চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চিংড়ি চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। পরিকল্পিতভাবে গলদা চিংড়ি চাষের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সত্তর দশকের গোড়ার দিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিকল্পিতভাবে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়। বিশ্ববাজারে চিংড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অধিক মূল্যের কারণে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই চাষের পদ্ধতিগত বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচুর সম্ভাবনাময় গলদা চিংড়ি শিল্পের বিকাশ তেমন একটা ঘটেনি। গতানুগতিক ও অপরিকল্পিত চাষ পদ্ধতির গি- পেরিয়ে এখনও আমাদের গলদা চিংড়ি শিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। বিশ্ববাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি এবং অতি মূল্যের কারণে আমাদের দেশে গলদা চিংড়ির চাষের প্রসার ঘটছে। বিশেষ করে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ফেনী, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় পুকুরে, ঘেরে বা ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি পাওয়া যায় কিনতু সত্তর দশকের আগে এই চিংড়ি চাষের তেমন কোনো তথ্যভিত্তিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। উপকূলীয় অঞ্চলের পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা বা অন্যান্য জলাশয় গলদা চিংড়ির বিচরণ ক্ষেত্র কিনতু সুদুর অতীতে এর চাষ হত না। জোয়ারের পানির সাথে যে গলদা চিংড়ি আসত তা শুধু আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের চাহিদা পূরণে গলদা চিংড়ির চাষ যেমন সম্প্রসারিত হয়েছে তেমনি চাষ পদ্ধতিতেও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে যদিও তা আশানুরূপ নয়। তথাপি চাষ প্রযুক্তিতে পোনা মজুদ, খাদ্য প্রয়োগ, পুকুরের পানি পরিবর্তন প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটেছে সময়ের চাহিদা মিটাতে। বাংলাদেশের গলদা চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন হেক্টরে ৪০০ ৭০০ কেজি অথচ হাওয়াই, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হন্ডুরাস প্রভৃতি দেশে বর্তমানে বার্ষিক গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ৪০০০ কেজি।

১৯৮০-৯০ দশক থেকে গলদা চিংড়ি চাষের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০-৯৫ সালে গলদা চিংড়ির চাষ ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং নিচু বিল এলাকার ধানক্ষেতকে চাষিরা গলদা চিংড়ির পুকুর হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট, ফকিরহাট, চিতলমারি, বাগেরহাট সদর, মোড়লগঞ্জ ও কচুয়া, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, রূপসা, তেরখাদা ও বটিয়াঘাটা উপজেলা, পিরাজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলা এবং গোপালগঞ্জ ও নড়াইল জেলার সদর উপজেলার অধিকাংশ বিল এলাকায় গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মোট আহরিত চিংড়ির প্রায় ৭৫ ভাগই আসে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মিঠা পানির সকল জলাশয়েই গলদা চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। পুকুর ডোবা, বিল-বাওড়, মরা নদী, খাল, নিচু ধানক্ষেত, রেল লাইন, সড়ক ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ি বাঁধের পার্শ্বের বরোপিট প্রভৃতি জলাশয়ে চিংড়ির একক বা মিশ্র চাষ করা সম্ভব।

বিশ্বের মোট উৎপাদিত চিংড়ির মাত্র শ্বতকরা ৫ ভাগ গলদা চিংড়ি। বিশ্বে স্বাদু পানির চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গলদা চিংড়ির প্রায়

৫২% গলদা চিংড়ি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় । বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি রপ্তানি হয় ৭০ ভাগ । বাংলাদেশে মিঠা পানির পুকুরের সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখের মতো । এসব জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করলে প্রতি বছর ৮-১০ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব । পুকুর, দীঘি, খাল-বিল, হাওর বাঁওড় এবং ধানক্ষেতেও গলদা চিংড়ির একক বা মিশ্র চাষ অল্প সময়ের ব্যবধানেই ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু এই গলদা চিংড়ির চাষ আমাদের দেশে অপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরিবেশের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । তাছাড়া গলদার খামারগুলোও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠছে না ফলে পানি দূষণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে । উপরন্তু চিংড়ির খাদ্য হিসেবে শামুক ও ঝিনুক নির্বিচারে আহরণ হচ্ছে যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে । এ ব্যাপারে সংশিষ্ট সকলকে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । দেশের নিম্নাঞ্চল যেখানে প্রায় সারাবছরই পানি থাকে সেখানে গলদা চিংড়ির চাষ ভালোভাবে করা যায় । বর্তমানে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে দেশের কমপক্ষে ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব । চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে গত ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে । এ আয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে স্বাদু পানির চিংড়ির অবদান প্রায় ২৩% এবং এ পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব । বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে দেশে গলদা চিংড়ি উৎপাদন গড়ে হেক্টর প্রতি ৪০০-৭০০ কেজি যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম ।

গলদা চিংড়ি উৎপাদন ও সম্প্রসারণে বর্ণিত সমস্যাবলি সমাধান করা গেলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক গলদা চিংড়ির উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে । উপরন্তু দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এবং বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের অভাব পূরণ হবে । গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি হওয়ায় এর চাষ বদ্ধ ও মুক্ত উভয় জলাশয়ে সম্ভব । সাধারণভাবে বলা যায়, সব এলাকায় চিংড়ি চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । চিংড়ি খামারের আয়তন ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪,০০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখন এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৪০,০০০ হেক্টরে ।

চিংড়ির শতকরা প্রায় ২৩% ভাগ উৎপাদন গলদা চিংড়ি থেকে পাওয়া যায় । এটি একটি বিকাশমান কৃষিভিত্তিক শিল্প । চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধাগুলো হচ্ছে

- চাষ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ
- গলদা চিংড়ি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
- প্রায় সকল আকারই বাজারজাত উপযোগী । তবে ১২-৩০ গ্রেডের চিংড়িতে লাভ বেশি
- উচ্চ বাজার মূল্য, প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে ৪৫০-৬৫০ টাকা/কেজি
- স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, ৬-৮ মাসে সম্পূর্ণ চিংড়ি বাজারজাত করা যায়
- অগভীর পুকর/ঘেরে চাষাবাদ সম্ভব (১-১.৫ মিটার পানির গভীরতা) ।
- মৌসুমী পুকুরেও গলদার চাষ করা যায়
- গলদার সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ একত্রে করা যায় ।

২০২২

- উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় সারাবছর পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- উপকূলীয় জেলাগুলোর স্থায়ী জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগানো যায় ।
- ধানক্ষেতেও গলদা চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব ।
- অমেরুদন্ডী কাটাবিহীন প্রাণী বলে গলদা সকলের কাছে প্রিয়
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গলদার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নতমানের আমিষজাতীয় খাদ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে সারা বিশ্বে চিংড়ি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। ফলে বিশ্ববাজারেও চিংড়ির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে চিংড়ির উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও খামার থেকে উৎপাদিত চিংড়ির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বাগদা চিংড়ি খামারের সংখ্যা ৩২,০০০ টি এবং আয়তন প্রায় ১,৭০,০০০ হেক্টর। অপরদিকে গলদা চিংড়ি খামারের সংখ্যা ১০৫০০০ টি (ছোট ঘের/পুকুরসহ) এবং আয়তন প্রায় ৪৭,০০০ হেক্টর। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্ববাজারে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে খামার থেকে মাত্র ৪০০০ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। বর্তমানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫,০০০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালে চিংড়ি রপ্তানি করে আয় হয় ৩৮২ কোটি টাকা। বর্তমানে এ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপন্ন বাংলাদেশের চিংড়ির গুণগতমান ও বিশ্ববাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের এলাকা বৃদ্ধি পেলেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র জনগাষ্ঠৗ সমুদ্র উপকূল ও নদীতে পোনা আহরণের কাজে এবং প্রায় ৪ লক্ষ লাকে সরাসরি চিংড়ি চাষের সাথে জড়িত (হেক্টর প্রতি ২ জন হিসেবে)। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ডিপো, হ্যাচারি, নার্সারি, আড়ৎ ও অবতরণ কেন্দ্র, চিংড়ি আহরণ-সামগ্রী প্রস্তুত ও পরিবহন ইত্যাদি কাজে সার্বক্ষণিক ১.৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত। দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে চিংড়ি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তবে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করা হলে উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ/তিনগুণ পরিমাণে বৃদ্ধিসহ এ ক্ষেত্রে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ অন্যান্য আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে চিংড়ি শিল্পের অবদান সর্বাধিক। চিংড়িই বাংলাদেশের এমন একটি শিল্প যেখানে আমদানিকৃত সামগ্রী ছাড়াই এ পণ্য উৎপাদিত হয়ে আসছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রায় ১,৫০,০০০ হেক্টর জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান ও চিংড়ি চাষ এবং চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছের চাষ হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক ফসলে চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন ২০০ কেজি/হে. এবং ধানের বার্ষিক গড় উৎপাদন ২ ২.৫ মে. টন/হে.। পর্যায়ক্রমিক উৎপাদনে মাছের উৎপাদন ১-১.৫ টন/হে, যা জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর জমিতে পর্যায়ক্রমে লবণ ওচিংড়ির চাষ হচ্ছে এবং মাত্র ১৫-২০ হাজার হেক্টর জমিতে চিংড়ির একক চাষ হচ্ছে (অন্যান্য প্রাকৃতিক মাছসহ)। গলদা চাষ এলাকায় খামার পার্শ্বস্থ বাঁধে শাকসবজি, ফল, পশুখাদ্য ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে এবং জৈবিক ব্যবস্থাপনায় এ সকল ফসল কীটনাশক ছাড়া উৎপাদিত বলে "অর্গানিক পণ্য হিসেবে বিশেষভবে সমাদৃত হচ্ছে।

২০২২

গলদা চিংড়ি চাষের গুরুত্ব

বাংলাদেশে স্বাদুপানিতে যে সকল প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় তার মধ্যে গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় স্বাদু ও আধালবণাক্ত পানিতে এ চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। এছাড়া বেশিরভাগ দেশে খাদ্য হিসেবে গলদার জনপ্রিয়তা সমধিক। বাংলাদেশে প্রায় ২৭ প্রজাতির স্বাদুপানির চিংড়ি পাওয়া যায় এর মধ্যে গলদার আকার-আকৃতি সর্ববৃহৎ। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত গলদা চিংড়ির ওজন সর্বোচ্চ ৪০০-৪৫০ গ্রাম এবং চাষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০-২৫০ গ্রাম হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে গলদা চিংড়ির পিএল জুভেনাইল এবং পরিপক্ব চিংড়ি সাধারণত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আধা লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। গলদা চিংড়িকে কোনো কোনো অঞ্চলে শলা চিংড়ি বা ইছা বলা হয়। গলদা আধালবণাক্ত পানিতে ডিম ছাড়ে এবং লার্ভা এ এলাকায় প্রতিপালিত হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক নিয়মেই চিংড়ি পোনা খাল, বিল, প্লাবনভূমিতে বা প্লাবিত ধানক্ষেতে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বড় হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে দেশের নদ-নদীতে তেমন গলদা চিংড়ি বা গলদার চিংড়ির পোনা আর পাওয়া যায় না।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের নিম্নাঞ্চলে প্রায় সারাবছরই পানি থাকে বিধায় সেখানে গলদা চিংড়ির চাষ ভালোভাবে করা যায়। গলদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হতে প্রায় ৮-৯ মাস সময় লাগে। বর্তমানে প্রায় ৪৭ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে দেশের কমপক্ষে ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ির অবদান প্রায় ২৩% এবং এ পরিমাণ ও অবদান অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে দেশে গলদা চিংড়ি বর্তমান উৎপাদন গড়ে হেক্টর প্রতি ৪০০-৭০০ কেজি। এ উৎপাদন অন্যান্য গলদা চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম।

গলদা চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির দৈহিক বৈশিষ্ট্য

গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii)

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মিঠাপানিতে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোসহ মেঘনা বিধৌত জেলাসমূহ যেমন-কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলার নদ-নদী, খাল-বিলে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার হাওর এলাকায় গলদা চিংড়ির বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়।

ছবি: গলদা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: গলদা চিংড়ি দেখতে সাধারণত হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। এই চিংড়ির ক্যারাপেসের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি লম্বা দাগ দেখা যায়। রোস্টাম লম্বা ও বাঁকানো। রোস্টামের উপরিভাগে ১১-১৪টি এবং নিচের অংশে ৮-১৪ টি খাঁজ বা দাঁত থাকে। অন্যান্য চিংড়ির তুলনায় গলদা চিংড়ির শিরোবক্ষ (Cephalothorax) অংশ বেশ বড়। এই চিংড়ির দ্বিতীয় চলনপদ তুলামূলকভাবে বড় এবং নীল ও কিছুটা কালচে রঙের হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ির উদরের দ্বিতীয় প্লিউরা প্রথম ও তৃতীয় প্লিউরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে।

ছটকা চিংড়ি (Macrobrachium malcolmsonii)

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ময়মনসিংহ, দাউদকান্দি, চাঁদপুর, নরসিংদী, রংপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, ফেনী ও চট্টগ্রামে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ছবি: ছটকা চিংড়ি

দৈহিক বৈশিষ্ট্য: এই চিংড়ির পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশ হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। দেহে বাদামি কিংবা কমলা বর্ণের ফ্যাকাশে হালকা টান টান দাগ থাকে। রোস্ট্রামের গোড়া উত্তল এবং রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯ ১৪টি ও নিচের দিকে ৫-৯ টি দাঁত থাকে।

গলদা চিংড়ি চাষের প্রকারভেদ

স্বাদুপানির চিংড়িসমূহের একটি প্রজাতি গলদা চিংড়ি নামে পরিচিত। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের প্রায় ৪৫০ প্রজাতির চিংড়ি আছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৬৩ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় (মিঠাপানিতে প্রায় ২৭টি এবং সমুদ্রে প্রায় ৩৬টি প্রজাতি)। এদের মধ্যে বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পূর্ণ কয়েকটি স্বাদপানির চিংড়ি হলো গলদা চিংড়ি, ছটকা কাঁঠালিয়া, ছোছনো, ছোরিয়া, রদা, গোদা ইত্যাদি।

গলদা চিংড়ি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীস্মম-ল ও ক্রান্তীয়ম-লের কাছাকাছি বেশি পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্পুচিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত দেশের নদী, হ্রদ, পাবনভূমি, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদি এদের প্রাকৃতিক বাসস্থান। এরা নদী মোহনা হতে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত পরিভ্রমণে সক্ষম।

গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। চাষ ব্যবস্থাপনা, খামারের আয়তন, পোনা মজুদের হার ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে চিংড়ি চাষ পদ্ধতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা - (১) এক্সটেনসিভ পদ্ধতি, (২) আধানিবিড় পদ্ধতি ও (৩) নিবিড় চাষ পদ্ধতি। আমাদের দেশে সাধারণত (ক) সনাতনী চাষ (খ) স্বল্প উন্নত চাষ (গ) আধানিবিড় চাষ ও (ঘ) নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়।

(ক) সনাতনী চাষ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে অন্য ফসল যেমন লবণ বা ধানের সাথে পর্যায়ক্রমে চিংড়ি চাষ করা হয়। চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি সবচেয়ে পুরাতন এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ। এই চাষ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা হয় না বা খামার নির্মাণ করা হয় না। খামারের সুনির্দিষ্ট কোনো আকার নেই এবং এর তলদেশ অসমতল এবং পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা থাকে না। খামারের পানি ও খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই চাষ চলাকালে খামারে কোনো বাড়তি খাবার প্রয়োগ করা হয় না। এ পদ্ধতিতে খামারের মাটি ও পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য চুন বা সার প্রয়োগ করা হয় না এবং পানি ব্যবস্থাপনারও কোনো সুব্যবস্থা থাকে না। এই চাষ পদ্ধতিতে খামারে চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছও একত্রে চাষ করা হয়। চাষের জন্য জমির চারপাশে ৩-৪ ফুট উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। মাঘী পূর্ণিমার সময় জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে খামার পানিতে পূর্ণ করা হয়। জোয়ারের এই পানির সাথে বাগদাসহ অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের পোনা খামারে প্রবেশ করে। এর সাথে উপকূলীয় নদী থেকে সংগৃহীত বাগদার পোনা মজুদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ১-১.৫ টি হারে চিংড়ির মজুদ করা হয় এবং হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি থেকে ২৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট চিংড়ি খামারে প্রায় ৮৫ - ৯০ ভাগ এই চাষ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

(খ) বঙ্গ উন্নত চাষ পদ্ধতি

এটি কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং মধ্যম বিনিয়োগ সম্পন্ন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কম ঝুঁকি-পূর্ণ, অধিক লাভজনক এবং কম প্রযুক্তি নির্ভরশীল হওয়ায় এটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাটি ও পানির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য চুন ও সার প্রয়োগ এবং রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত জলজ প্রাণী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত খামারের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এই চাষ পদ্ধতির খামারের আয়তন মাঝারী, আয়তকার এবং খামারের তলদেশ সমতল ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে। এই জাতীয় খামারে প্রতি বর্গমিটারে ৩৫টি হারে পোনা মজুদ করে হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। পানির লবণাক্ততা ও পোনার প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে একই জমিতে দুটি ফসল উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫-২০% জমিতে এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। ফলে এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ক্রমাম্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে খামারের পানির ব্যবস্থাপনা, রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত জলজ প্রাণী দমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই জোয়ারের পানি খামারে ঢুকানোর সময় সূক্ষ্ম নেটের সাহায্যে পানি ছেঁকে উঠানো হয়। এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কম প্রযুক্তি নির্ভরশীল হওয়ায় এটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত, কম ঝুঁকিপূর্ণ ও লাভজনক।

২০২২

(গ) আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে সতর্কতার সাথে চিংড়ি চাষ করতে হয়। এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় এবং অধিক দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। এই চাষ ব্যবস্থাপনায় পুকুর সঠিকভাবে ধৌত ও পরিষ্কার করা এবং চিংড়ি পোনার উপযুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পরিমিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা হয়। পাম্প মেশিনের সাহায্যে পানি মজুদ ও শোধন করে খামারে পানি সরবরাহ করা হয় এবং খামারের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ, পানিতে হালকা স্রোত সৃষ্টি করা ও পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রাখার জন্য প্যাডেল হুইল ও এয়ার ইনজেক্টর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্যও খামারে প্রয়োগ করা হয়।

এই চাষ পদ্ধতিতে খামারে যাতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর জলজ প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। সেজন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে পানি ঢুকানো হয়। রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করার জন্য অনেক সময় চা বীজের খৈল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনায় খামারের আয়তন ২ হেক্টরের কম হওয়া উচিত এবং সাধারণত প্রতি বর্গমিটারের ৭-১৫টি হারে চিংড়ি পোনা মজুদ করা হয়। আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৩-৫ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। পানির গুণাগুণ যেমন-লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব, অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রেখে এই চাষ পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

(ঘ) নিবিড় চাষ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়াজন হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

- এই পদ্ধতিতে ০.২৫-১.০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট আয়তকার পুকুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- পুকুরে পানি প্রবেশ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য পৃথক সুইস গেইট ব্যবহার করা হয় এবং এজন্য পানি সরবরাহ খাল ও পানি নিষ্কাশন খাল থাকে। তাছাড়া সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের সুবিধার্থে পাইপ লাইন থাকে।
- পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পেডেল হুইল এবং পুকুরের তলদেশ পরিষ্কারের জন্য এয়ার ইনজেক্টর ব্যবহার করা হয়।
- প্রতি বর্গমিটারে ২০-২৫ টি পোনা মজুদ করা হয়।
- সম্পূরক খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ১০-২০ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় পোনার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ পোনা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ফলে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পোনা সরবরাহ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া বাংলাদেশে "ঘেরে চিংড়ি চাষ" এবং "লবণ উৎপাদন ও চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ২ টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। একক চাষ পদ্ধতি ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি।

একক চাষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির পিএল ঘের/পুকুরে ছাড়া হয়। এর সাথে অন্য কোনো প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় না।

সুবিধা: — এ পদ্ধতিতে চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়
- পরিচর্যা সুন্দরভাবে করা যায়।
- সহজে ধরা যায়।
- বড়গুলো সহজেই ধরে নেয়া যায়।
- খাদ্য প্রয়োগ সহজ হয়।

অসুবিধা: এ পদ্ধতিতে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না।

মিশ্র চাষ পদ্ধতি

একই জলাশয়ে একই সময়ে যখন গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য এক বা একাধিক প্রজাতির মাছ এক সাথে চাষ করা হয় তখন তাকে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বলে। এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে কেউ কারও প্রতিযোগী হয় না।

সুবিধা: — পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- তুলনামূলকভাবে লাভজনক
- রোগব্যাধি কম হয়।

অসুবিধা: — গলদার সাথে চাষযোগ্য কার্পের প্রজাতি নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্ক্ষিত লাভ নাও হতে পারে।
- মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় অধিক মনোযোগী হতে হয় বিধায় সব চাষির জন্য সম্ভব নাও হতে পারে।

মিশ্রচাষে জাত নির্বাচন

- গলদা চিংড়ির সাথে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কাতলা মিশ্র চাষে ব্যবহার করা যায়।
- সতর্ক থাকতে হবে যে পুকুরের তলায় বসবাসকারী ও খাদ্যগ্রহণকারী কোনো প্রজাতি গলদা চিংড়ির সাথে মিশ্রভাবে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- মৃগেল, কালবাউস ইত্যাদি।

প্রজাতি নির্বাচন: মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের মূলভিত্তি হচ্ছে পুকুর/ঘেরের পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা। পুকুর/ঘেরের পানির উপরস্তর, মধ্যস্তর ও তলার স্তরে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক খাবার জন্মায়। অন্যদিকে পুকুরে যে সব প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি চাষ করা হয় এদের খাদ্য অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং এরা পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করে সাধারণত সেখান থেকেই এরা খাদ্য গ্রহণ করে। এদের মধ্যে কাতলা, সিলভার কার্প ও বিগহেড পানির উপরের স্তরে, রুই মধ্যস্তরে এবং মৃগেল, কার্পিও, মিরর কার্প ও চিংড়ি পানির নিচের স্তরে বাস করে। কেবলমাত্র সরপুঁটি ও গ্রাসকার্প মাছ,পানির সকল স্তরে বিচরণ করে। সে কারণে পুকুরে যদি শুধুমাত্র কোনো একস্তরে বসবাসকারী মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় তাহলে এরা ঐ স্তরের খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে কিন্তু অন্য স্তর অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। তাই পোনা মজুদের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পুকুরের সকল স্তরের খাদ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এ ধরনের চাষকে মিশ্র চাষ বলে যা একক চাষের চেয়ে লাভজনক। শুধু কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে ৬-৭ প্রজাতির পোনা মজুদ করা গেলেও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষে মৃগেল, কার্পিও বা মিরর কার্পের পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। কারণ এরা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য চিংড়ির সাথে প্রতিযোগিতা করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঘের চাষিদের মতে, চিংড়ির সাথে মিশ্রচাষের জন্য কাতলা, সিলভার কার্প, রুই ও গ্রাসকার্প হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি। তবে বিগহেড এবং সরপুঁটিও লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। চিংড়ির সাথে চাষের জন্য উপরিলিখিত প্রজাতিগুলোর এলাকাগত প্রাপ্যতা বিবেচনা করেই প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়।

মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ: পুকুরের সকল স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছের পোনা ও জুভেনাইল মজুদের উপর মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। অতি ঘনত্বে মাছের পোনা ও চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, অক্সিজেন ও বাসস্থানের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। যার কারণে আশানুরূপ উৎপাদন এবং লাভ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করলেও মোট উৎপাদন কমে যায়। সে কারণে পুকুরের সার্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করতে হয়। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো—

পুকুর উৎপাদনশীলতা: মাটি ও পানির গুণাগুণ ভেদে কোনো একটি জলাশয়ে মাছের পোনা ও চিংড়ির জুভেনাইলের মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে। যেমন- বেলে ও এঁটেল মাটির উৎপাদনশীলতা দোআঁশ মাটির চেয়ে কম। ফলে দোআঁশ মাটির পুকুরে তাদের মজুদ ঘনত্ব অন্যান্য মাটির পুকুরের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে।

কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন আকার: যদি নির্দিষ্ট সময়ে বড় আকারের মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করতে (৫-৬ মাসে মাছ ৫০০ গ্রাম-১ কেজি এবং চিংড়ি > ৮০ গ্রাম) হয় তবে কম ঘনত্বে পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করা উচিত। মজুদ ঘনত্ব বেশি হলে একই সময়ে মাছ ও চিংড়ির গড় ওজন কম হবে।

পোনা আকার: পুকুরে বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল (মাছ ১০-১৫ সেমি এবং চিংড়ি ৫-৭ সেমি) মজুদ করা হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুদের সময় বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল পাওয়া যায় না; ফলে ছোট আকারের পোনা ও জুভেনাইল কিছুটা বেশি ছাড়া যায়। বড় আকারের পোনা বা জুভেনাইলের ক্ষেত্রে মজুদ ঘনত্ব ২৫% কম হতে পারে।

পুকুরের ধরন: পুকুরের ধরনের উপরও মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে। সে কারণে মৌসুমী ও বাৎসরিক পুকুরের মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে।

চাষের ধরন: চাষের ধরন যেমন-একক ও মিশ্রচাষে মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনার ধরন: পুকুরে শুধুমাত্র সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশি হতে পারে। আবার জলাশয়ে আংশিক পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকলে আরও অধিক ঘনত্বে মজুদ করা যেতে পারে। কোন পুকুরে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও মজুদ হার প্রকৃতই উহার ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। উপযুক্ত বিষয়গুলোর আলোকে নিচে একক ও মিশ্রচাষের কিছু নমুনা ঘনত্ব উল্লেখ করা হলো

(১) মৌসুমী পুকুর

একক চাষ: গলদা চিংড়ি- ৫৫ টি পোনা/ শতাংশ। তবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে এই মজুদ ঘনত্ব। দেড় থেকে দুইগুণ বাড়ানো যায়।

মিশ্র চাষ: মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২
গলদা	৩০ টি	৩০ টি
সিলভার কার্প	২০ টি	৫ টি
সরপুঁটি	৫ টি	২০ টি
মোট	৫৫ টি	৫৫ টি

(২) বাৎসরিক পুকুর

একক চাষ: গলদা চিংড়ি ৫০-৭০টি/শতাংশ প্রতিপালনের সময় ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে এই মজুদ ঘনত্ব আরও দেড় থেকে দুইগুণ করা যায়।

কার্প-চিংড়ি মিশ্র চাষ-মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

প্রজাতি	আকার (সেমি)	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪	মন্তব্য
গলদা চিংড়ি	৩-৫	৩৩-৩৫	৩৪-৩৬	৩৩-৩৪	৩৪-৩৫	চিংড়ির আকার ৬-৮সেমি হওয়ার পর ১০-১৪ সেমি আকারের কার্প পোনা মজুদ করতে হবে
কাতলা	৭-১০	২-৩	১০-১১	-	৪-৫	
সিলভার কার্প	৭-১০	৯-১০	-	৭-১০	৫-৬	
বিগহেড	৭-১০	-	-	২-৩	-	
রুই	৭-১০	৪-৫	৫-৬	৫-৬	৫-৬	
গ্রাসকার্প	১০-১৫	-	১-২	১-২	২-৩	
সরপুঁটি	৩-৫	২	-	-	-	
মোট	৫০-৫৫	৫০-৫৫	৫০-৫৫	৫০-৫৫	-	

বি.দ্র. গলদা-কার্প মিশ্রচাষে গ্রাস কার্প মজুদ না করাই ভালো। যদি মজুদ করতেই হয় তবে প্রতিদিন গ্রাসকার্পের ওজনের নির্দিষ্ট মাত্রায় সবুজপাতা জাতীয় খাদ্য অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) ঘের

ঘেরে বিভিন্ন কৌশলে পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করে চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে সে কারণে মজুদ ঘনত্বেও তারতম্য দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের চাষ কৌশলের উপর ভিত্তি করে মজুদ ঘনত্বের নমুনা উল্লেখ করা হলো-

(ক) ঘেরটি যখন পুরোপুরি বড় চিংড়ি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়-

প্রজাতি	আকার (সেমি)	পরিমাণ (প্রতি শতাংশে)
গলদা	৩-৫	৫০-৬০
কাতলা	৭-১০	৬-৮
সিলভার কার্প	৭-১০	৬-৮
রুই	৭-১০	৪-৬
গ্রাসকার্প	১০-১৫	০-১
	মোট	৬৫-৮০টি

২০২২

(খ) যেরটি প্রথমে নার্সারি ও পরে মজুদ কাজে ব্যবহৃত হলে ৮০-১০০টি পিএল/শতাংশে

(গ) যেরটি পুরোপুরি নার্সারি হিসেবে ব্যবহৃত হলে ১০০০-২০০০টি পিএল/শতাংশে

ভালো মানের গলদা পোনা শনাক্তকরণ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভালো মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পোনা ও পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং হ্যান্ডলিং এদের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। যে কোনো কারণেই গুণগত মান খারাপ হোক না কেন ঐ সমস্ত পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করা হলে চাষি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যথাযথ মানসম্পন্ন পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ না করা হলে

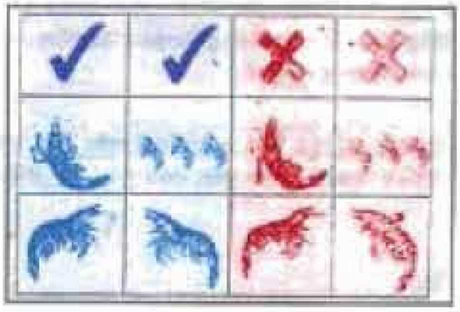

- মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে
- বৃদ্ধির হার কম হয়।
- সময়মতো বিক্রয়যোগ্য না হওয়ার বাজার মূল্য কম পাওয়া যেতে পারে

সে কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে এদের যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভালো ও খারাপ পোনা ও জুভেনাইল শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো -

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভালো জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের, খারাপ জুভেনাইল লালচে/কালচে
- ভালো জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না
- ভালো জুভেনাইলের খোলস পরিষ্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত।
- ভালো জুভেনাইলের খাদ্যথলি পরিপূর্ণ, খারাপ জুভেনাইলে খাদ্যথলি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে।

চিত্রঃ হ্যাচারিতে উৎপাদিতসুস্থ সবল পিএল

চিত্রঃ সুস্থ সবল পিএল এর চলাচল পরীক্ষা

মাছের পোনা

- সুস্থ সবল পোনা চঞ্চল, সন্তরণশীল কিন্তু খারাপ পোনা ধীর-স্থির
- ভালো পোনার আঁইশ ঝকঝকে উজ্জ্বল, খারাপ পোনার দেহ ফ্যাকাসে
- ভালো পোনার দেহ পিচ্ছিল, খারাপ পোনার দেহ খসখসে
- ভালো পোনার দেহে কোনো দাগ নেই, খারাপ পোনার দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ দেখা যায়।

গলদা চিংড়ি চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ

মাটির গুণাগুণ

১. মাটি

মাটির গুণাগুণ জেনে গলদা খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। কারণ মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতার ওপর পানির গুণাগুণ ও উর্বরতা নির্ভরশীল আর পানির উর্বরতার ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। তাই খামার বা পুকুর নির্মাণের স্থান নির্বাচনের পূর্বে মাটির গুণাগুণ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাটি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক বস্তু বিশেষ। ক্ষয়ীভূত শিলা ও খনিজের সাথে জৈব পদার্থ ও পানির মিশ্রণের ফলে মাটি তৈরি হয়। কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকারে খনিজ দ্রব্য, জৈব দ্রব্য এবং জলীয় ও বায়বীয় অংশ সমন্বয়ে মাটি গঠিত।

সাধারণ কৃষি মাটির গঠন দ্রব্যের পরিমাণ

উপকরণ	পরিমাণ			
	আয়তনভিত্তিক		ওজনভিত্তিক	
	মাত্রা	গড়	মাত্রা	গড়
খনিজ	৪০-৫০	৪৫	৬০-৮৫	৭৯
জৈব	৫-১০	৫	<২	<২
বায়ু	১-৫০	২৫	<১	<১
পানি	১-৫০	২৫	১৫-৩৫	মাত্রা

মাটির ৪টি গঠন দ্রব্য-খনিজ, জৈব, বায়ু ও পানি সমন্বিতভাবে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। মাটিতে পানির পরিমাণের ওপর বায়ুর পরিমাণ নির্ভরশীল অর্থাৎ মাটিতে পানির পরিমাণ বাড়লে বায়ুর পরিমাণ কমে যায় এবং পানির পরিমাণ কমলে বায়ুর পরিমাণ ও বায়ু চলাচল বেড়ে যায়। আবার মাটিতে খনিজ দ্রব্যের আকার বড় হলে এবং নুড়ি বা স্থুল বালি কণার পরিমাণ বেশি হলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা কমে যায়। মাটিতে কর্দম কণার পরিমাণ বেশি হলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটিতে বায়ু চলাচল কমে যায়। মাটিতে জৈব পদাথের পরিমাণ বেশি হলে মাটির গুণাগুণ উন্নত হয় এবং মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মৃত্তিকা খনিজের মধ্যে বালিকণা, পলিকণা ও কর্দম কণাকে মাটি (Soil particle) বলা হয় । দুই মিলিমিটারের কম ব্যাস সম্পন্ন নির্দিষ্ট আকার ও মাত্রার অন্তর্ভুক্ত খনিজ কণাকে মৃত্তিকা কণা বলে । আকারের ভিত্তিতে মৃত্তিকা কণা তিন ভাগে বিভক্ত যথা- বালিকণা, পলিকণা ও কর্দম কণা ।

মৃত্তিকা কণার নাম	পরিমাণ	
	আয়তনভিত্তিক	
	যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতি	আন্তর্জাতিক পদ্ধতি
খুব মোটা বালিকণা	২.০০-১.০০	-
মোটা বালিকণা	১.০০-০.৫০	২.০০-০.২০
মাঝারি বালিকণা	০.৫০-০.২৫	-
মিহি বালিকণা	০.২৫-০.১০	০.২০-০.০২
অতি মিহি বালিকণা	০.১০-০.০৫	-
পলিকণা	০.০৫-০.০০২	০.০২-০.০০
কর্দমকণা	<০.০০২	<০.০০২

মাটির বিভিন্ন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অম্লমান ও লবণাক্ততা চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ১ থেকে ১৪ সংখ্যা দ্বারা অম্লমান (পিএইচ) প্রকাশ করা হয় । মাটির অম্লমান পানির গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । কোন মাটির অম্লমান ৭ এর কম হলে তাকে অম্লমাটি বলে । মাটিতে সালফার লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি হলে মাটিতে অম্লত্ব দেখা দেয় । বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা, মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটির অম্লত্ব বেশি । এসব অঞ্চলের মাটিতে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে । সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ও চকোরিয়ার জোয়ার প্লাবিত অঞ্চলের মাটিতে পাইরাইটিক সালফাইড বেশি থাকে। এই পাইরাইটিক সালফাইডের জারনের ফলে সালফিউরিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয় । সালফিউরিক অ্যাসিডের কারণে মাটির অম্লত্ব বেশি হয়। এ ধরনের মাটিকে কষযুক্ত মাটি (Acid sulphate soil) বলে। এই মাটি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী । মাটির অম্লত্ব তিন প্রকার, যথা-

ক) সক্রিয় অম্লত্ব (Active acidity)

পিএইচ মিটার দ্বারা মাটির দ্রবণের যে অম্লত্বমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাতে কেবল মুক্ত হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন এর পরিমাণ জানা যায় । এই মুক্ত হাইড্রোজেন (H^+) আয়নই মাটির সক্রিয় অম্লত্ব নির্দেশ করে ।

খ) বিনিময়ী অম্লত্ব (Exchangeable acidity)

মাটির H^+ ও Al^{+++} আয়নের ঘনত্বকে বিনিময়ী অম্লত্ব বলে । মাটির দ্রবণে KCI প্রয়োগ করলে K^+ আয়ন Al^{+++} আয়নের স্থান দখল করে । এভাবে বিমুক্ত H^+ আয়ন ও Al^{+++} আয়ন পরিমাপ করে বিনিময়ী অম্লত্ব পরিমাপ করা যায় ।

২০২২

গ) অবশিষ্ট অম্লত্ব (Residual acidity)

মাটির H^+ ও Al^{+++} জনিত অম্লত্ব প্রশমিত করার পরও মাটিতে যে অম্লত্ব থেকে যায় তাকে অবশিষ্ট অম্লত্ব। বলে। মাটির অম্লত্বের তীব্রতা অনুসারে অম্লত্বকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

মৃত্তিকার অম্লত্ব শ্রেণি	অম্লমান
মৃদু অম্ল	৫.৬-৬.৫
অধিক অম্ল	৪.৫-৫.৫
অত্যধিক অম্ল	৪.৫ এর নিচে

মাটির এই অম্লত্ব প্রতিরোধের জন্য সাধারণত ৩ প্রকারের চুন ব্যবহার করা হয়, যেমন

ক) কার্বনেট চুন — $CaCO_3$ (ক্যালসাইট, পাথুরে চুন)

— $CaMg(CO_3)_2$ (ডলোমাইট)

খ) অক্সাইড চুন — CaO (পোড়াচুন/কুইক লাইম)

গ) হাইড্রোক্সাইড চুন — $Ca(OH)_2$

মৃদু অম্লযুক্ত মাটির এলাকায় চিংড়ি খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা ভালো। কারণ মৃদু অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত ভাল। অধিক অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী। এজন্য মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ জেনে গলদা খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। দোআঁশ, এঁটেল বা বেলে দোআঁশ মাটি সাধারণত গলদা চিংড়ির পুকুরের জন্য উত্তম। এ ধরনের মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বেশি এবং এই মাটি দিয়ে তৈরি পুকুরের পাড় শক্ত, মজবুত ও স্থায়ী হয়। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

উপাদান মৃত্তিকার অম্লত্ব শ্রেণী	পরিমাণ
মাটির বুনট	এঁটেল-দোআঁশ
পিএইচ	৫.০-৬.৫
নাইট্রেট	৫০-৭৫ (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
ফসফেট	১০-১২ (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
ক্যালসিয়াম	৪০-৫০(মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
জৈব পদার্থ	২.৫-৫%

পৃথিবী পৃষ্ঠের যে অংশ থেকে উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহ করে তাই মাটি। পুকুরের পানি সংলগ্ন ১৫-২০ সেমি মাটি পানির সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে। মাটি প্রধানত চারটি প্রধান উপাদান সমন্বয়ে গঠিত।

উপাদানগুলো হচ্ছে

(১) খনিজ পদার্থ - ৪৫%

(২) জৈব পদার্থ - ৫%

(৩) বায়ু - ২৫%

(৪) পানি - ২৫%

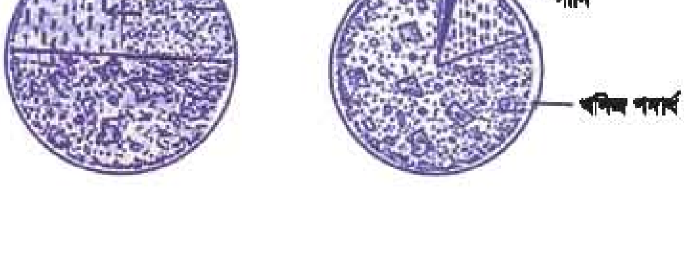

২০২২

(১) খনিজ পদার্থ

মাটির এ অংশ বালি, পলি, কাদা কণা দ্বারা গঠিত। এটাই মাটির মুখ্য উপাদান। পুকুরের মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নির্ভর করে মাটির এই উপাদানের ওপর। যে মাটিতে অধিক পরিমাণ কাদা কণা থাকে তাকে কাদা মাটি (এঁটেল মাটি), যে মাটিতে অধিক পরিমাণ পলিকণা থাকে তাকে পলিমাটি এবং যে মাটিতে অধিক পরিমাণ বালিকণা থাকে তাকে বালিমাটি বলে। কাদা মাটি ও পলি মাটির (এঁটেল জাতীয়) পুকুরে পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বালিমাটির পুকুরের চেয়ে বেশি।

(২) জৈব পদার্থ

মাটিতে সাধারণত ১-২% হারে জৈব পদার্থ থাকে তবে হিম অঞ্চলে তা ৫% পর্যন্ত পাওয়া যায়। পুকুরের তলার মাটির জৈব অংশের ওপর পুকুরের উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের অন্যতম উৎস তলার মাটি। তলার মাটির জৈব অংশের উৎস পুকুরের পাশের জমি ও প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থ। তলার মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান পানিতে মুক্ত হওয়ার মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে মাটির ধরন, তাপমাত্রা, গভীরতা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, মোট ক্ষারত্ব ইত্যাদি এবং ব্যাকটেরিয়ার কর্মকাণ্ডের ওপর। পুকুরের তলদেশের মাটিকে বলা হয় পুকুরের ল্যাবরেটরি। এখানেই হাজার রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব পদার্থ অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং পুনরায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। জৈব পদার্থ পুকুরের পানি ধারণক্ষমতা বাড়ায়।

(৩) বায়ু

বায়ু যদিও মাটির একটি অন্যতম উপাদান কিনতু পুকুরের মাটি বলতে যা বুঝায় সে মাটিতে বায়ুর উপস্থিতি খুবই কম। জৈব-অজৈব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদিত গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া পুকুরের মাটিতে অন্য কোনো গ্যাসীয় অংশ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট গ্যাস মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে।

(৪) পানি

পুকুরের মাটি ও পানি জৈব-অজৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান বিমুক্ত ও স্থানান্তরে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

মাটির রাসায়নিক উপাদান

মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পিএইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। মাছ চাষের জন্য মাটির উপরাক্তে উপাদানগুলোর মাত্রা নিম্নরূপ হলে ভালো হয়

পিএইচ	—৬.৫-৯
ফসফরাস	—১০-১৫ মিগ্রা/১০০ গ্রাম
নাইট্রোজেন	—৮-১০ মিগ্রা/১০০ গ্রাম
জৈব পদার্থ	—১-২% জৈব কার্বন

পানির গুণাগুণ

পুকুরের উর্বরতা বা জৈব উৎপাদন নির্ভর করে পুকুরের পানির ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। পুকুরের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে এমন উপাদানগুলো নিম্নরূপ

ভৌত গুণাগুণ

পানির গভীরতা: উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়। যথা-ইপিলিমনিয়ন (উপরের স্তর), থার্মোক্লাইন (মধ্য স্তর) হাইপোলিমনিয়ন (নিচের স্তর)। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরগুলোর গভীরতা ২-৩ মিটারের মধ্যে। ফলে হাইপোলিমনিয়ন স্তরটি দেখা যায় না। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। নার্সারি পুকুরের গভীরতা বেশি হলে চিংড়ির পিএল পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পিএল অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। নার্সারি পুকুরের গভীরতা ৭৫-৯০ সেমি (২.৫-৩.০ ফুট) হলে ভালো হয়।

তাপমাত্রা: গলদা চিংড়ির তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি মাত্রা রয়েছে। পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। গলদা চিংড়ির পানা উৎপাদনে সহায়ক তাপমাত্রা ২৫-৩১ সে.।

সূর্যালোক: সূর্যই সকল শক্তির উৎস। সূর্যালোকের প্রাপ্ততা ও প্রখরতার ওপর সালোকসংশ্লেষণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। গলদা নার্সারি পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬ -৮ ঘণ্টা সূর্যালোকে পড়া আবশ্যক।

রাসায়নিক

অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্ষারত্ব ও খরতা, পিএইচ, লবণাক্ততা ইত্যাদি।

অক্সিজেন: পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস প্রধানত দুটি

- পানি সংলগ্ন বাতাস
- সালোকসংশ্লেষণ

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, অন্যান্য গ্যাসের আংশিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বায়ুচাপ বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা বাড়ে। নার্সারি পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা ৫-৭ পিপিএম হলে ভালো হয়।

অ্যামোনিয়া: মাছ ও চিংড়ির বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন দ্রব্যের পচন ইত্যাদির ফলে অ্যামানিয়ার সৃষ্টি হয়। যার আধিক্য গলদা নার্সারির জন্য ক্ষতিকর। আয়নিত ও অআয়নিত দুভাবেই অ্যামোনিয়া পানিতে থাকতে পারে। তবে প্রথমটি কম ক্ষতিকর। অআয়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিগ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

নাইট্রাইট: এটি ব্যাকটেরিয়া দহনের ফলে অ্যামানিয়া ও নাইট্রাইটের মধ্যবর্তী অবস্থা। পুকুরের তলার পচা পদার্থ বেড়ে গেলে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিণত করে। নাইট্রাইটের খুব স্বল্পমাত্রাও গলদা চিংড়ির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ মিগ্রা/লিটারের কম থাকা উচিত। ২০২২

কার্বন ডাই-অক্সাইড: পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎস প্রধানত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ জীবের শ্বাস প্রশ্বাস। মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পানির পিএইচ-এর মান ৪.৫ পর্যন্ত নামাতে পারে। ১২ মিগ্রা/লি মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গলদা চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিষাক্ততা অক্সিজেনের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রয়োজনীয় উপাদান। পানিতে এ গ্যাস বেশি থাকলে জলজ প্রাণীর অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতা: পানিতে উপস্থিত কার্বনেট, বাই-কার্বনেটের ঘনত্বই ক্ষারত্ব এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর যৌথ ঘনত্বই হচ্ছে খরতা। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভালো। পানির ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মিগ্রা/লি এর কম বা খুব বেশি বেড়ে গেলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, প্রাথমিক উৎপাদন কমে যায়, সারের কার্যকারিতা কমে, গলদা চিংড়ি সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষারত্ব ও খরতার মান ৪০-২০০ মিগ্রা/লি হওয়া উচিত।

পিএইচ: পিএইচ হচ্ছে কোনো বস্তুর অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায় যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৭ দ্বারা নিরপেক্ষ মান নির্দেশিত হয়। পিএইচ এর মান ৭ এর কম হলে অম্লত্ব এবং ৭ এর বেশি হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। গলদা চিংড়ির নার্সারির ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ-এর মান ৭.৫-৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভালো।

চিত্র: মাছ ও চিংড়ির ওপর পিএইচ এর প্রভাব

লবণাক্ততা: গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি তবে স্বল্প লবণাক্ততায় গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের ক্ষেত্রে পানির লবণাক্ততা ০-৪ পিপিটি হওয়া উচিত।

দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ

চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর/ঘের প্রস্তুতিকালে তলার দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ পুকুর/ঘেরের কালো কাদা অপসারণ করা না হলে চাষকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-

- পুকুর/ঘেরের পানি দূষিত করে ফেলে
- মাছ ও চিংড়ির জন্য অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয়
- তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়।
- চিংড়ির রং কালো হয়ে যায় ফলে বাজার মূল্য কমে যায়
- সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়
- চিংড়ি ধরা কষ্টকর হয়

চিত্রঃ দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা অপসারণ

মাছ ও চিংড়ি চাষের ঋতুভিত্তিক ঝুঁকি

মাছ ও চিংড়ি চাষে ঋতুভিত্তিক বেশ কিছু ঝুঁকি থাকে। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন কি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ঝুঁকিগুলো হচ্ছে

(১) বর্ষাকালীন ঝুঁকি

বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি বা বন্যায় সমস্ত মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে। তাই এ সময়ের আগেই বড় অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

(২) শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকি

শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যেতে পারে বা পানির গভীরতা কমে যেতে পারে। এ অবস্থায় পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফলে সমস্ত মাছ ও চিংড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই বাজারজাতযোগ্য মাছ ও চিংড়ি ধরে ফেলা উচিত।

(৩) শীতকালীন ঝুঁকি

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে ক্ষতরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। এ রোগ সাধারণত নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসেই বেশি দেখা দেয়। এ সময়ে পুকুরে জীবভর বেশি থাকলে এ রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সে কারণে এ সময়ের আগেই বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে পুকুরের জীবভর কমিয়ে দেয়া উচিত।

(৪) চুরি

এটা একটা সাধারণ সামাজিক ঝুঁকি। পুকুরে মাছ ও চিংড়ি বড় হলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়। সে কারণে বড় মাছ ও চিংড়ি আহরণ করলে চুরির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. কোন সময় থেকে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ শুরু হয়?
২. বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি গলদা চিংড়ির গড় উৎপাদন কত?
৩. বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কত হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে?
৪. বিশ্বের মোট উৎপাদিত গলদা চিংড়ির কত ভাগ বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়?
৫. বাংলাদেশে কয়টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ হয়?
৬. গলদা খামারের পার্শ্বস্থ বাঁধে কী চাষ করা হয়?
৭. গলদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হতে কত সময় লাগে?
৮. নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে কয়টি পোনা মজুদ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রপ্তানিযোগ্য ৩টি স্বাদু পানির চিংড়ির নাম লেখ।
২. বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ এলাকার পরিমাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৩. চিংড়ির উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।
৪. চিংড়ির আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদের ভূমিকা বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশের গলদা চিংড়ি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।

২০২২

তৃতীয় অধ্যায়

গলদা চিংড়ির খামারের স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশল

গলদা চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ বলতে এমন একটি পরিবেশকে বুঝায় যেখানে অবকাঠামোগত সুবিধা, পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পানির প্রাচুর্য, উৎপাদন সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত চিংড়ির সঠিক গুণগতমাণ বজায় রেখে রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়। বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন গলদা চিংড়ি দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ডোবা ও ধানক্ষেতসহ প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি চাষ করা হয়ে থাকে। এই চাষ এলাকা প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন চাষ পদ্ধতির জন্য চিংড়ি খামারের সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন রকম হলেও কিছু কিছু সুবিধাদি সকল ক্ষেত্রেই একই রকম এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহও প্রায় একই ধরনের। উপযুক্ত স্থানে চিংড়ি খামার স্থাপন ও নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যায়।

— খামার ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং ব্যবস্থাপনা খরচও কম হয়।

— পানি ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না এবং উপযুক্ত লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে সহজ হয়।

স্থান নির্বাচনের সুবিধা

উপযুক্ত স্থানে গলদা চিংড়ির খামার/পুকুর স্থাপন করা গেলে নিম্নবর্ণিত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়:

(১) খামার / পুকুর নির্মাণের খরচ কম হয়।
(২) খামার ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কম হয়।
(৩) পানি ব্যবস্থাপনার কোনো সমস্যা হয় না।
(৪) সহনশীল লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ সহজতর হয়।
(৫) প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর প্রভাব ফেলে না।
(৬) চিংড়ির আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায়।

স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ি চাষের জন্য খামার নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে:

(১) মাটির গুণাগুণ
(২) পানির গুণাগুণ
(৩) বন্যা, প্লাবন ও দূষণমুক্ত এলাকা
(৪) পানির উৎস
(৫) পোনা ও চাষ উপকরণাদির প্রাপ্যতা
(৬) অবকাঠামোগত সুবিধাদি
(৭) ভূমির উচ্চতা ও বন্ধুরতা
(৮) বিদ্যুৎ সরবরাহ
(৯) দক্ষ জনশক্তি
(১০) বিবিধ

২০২২

(১) মাটি

মাটির গুণাগুণ জেনে গলদা খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। কারণ মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতার ওপর পানির গুণাগুণ ও উর্বরতা নির্ভরশীল আর পানির উর্বরতার ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। তাই খামার বা পুকুর নির্মাণের স্থান নির্বাচনের পূর্বে মাটির গুণাগুণ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি যা ভূপৃষ্ঠকে স্তূপাকারে আহরিত করেছে, যেখানে গাছ জন্মায়, যা শিলা থেকে জলবায়ু ও বীজ কার্যের সমন্বিত প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে এবং সময়ের ব্যবধানে নিষ্কাশন অবস্থাভেদে বর্তমান রূপ লাভ করেছে অথাৎ উদ্ভিদ ও জীব উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার মাধ্যম তথা এসব কর্মকাণ্ডের উপযোগী ভূপৃষ্ঠের নরম অংশকে মৃত্তিকা বা মাটি বলা হয়। মাটি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক বস্তু বিশেষ। ক্ষয়ীভূত শিলা ও খনিজের সাথে জৈব পদার্থ ও পানির মিশ্রণের ফলে মাটি তৈরি হয়। কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকারে খনিজ দ্রব্য, জৈব দ্রব্য এবং জলীয় ও বায়বীয় অংশ সমম্বয়ে মাটি গঠিত।

মাটির বিভিন্ন রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অম্লমান ও লবণাক্ততা চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১ থেকে ১৪ সংখ্যা দ্বারা অম্লমান (পিএইচ) প্রকাশ করা হয়। মাটির অম্লমান পানির গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো মাটির অম্লমান ৭ এর কম হলে তাকে অম্লমাটি বলে। মাটিতে সালফার লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি হলে মাটিতে অম্লত্ব দেখা দেয়। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা, মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটির অম্লত্ব বেশি। এসব অঞ্চলের মাটিতে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকা ও চকোরিয়ার জোয়ার প্লাবিত অঞ্চলের মাটিতে পাইরাইটিক সালফাইড বেশি থাকে। এই পাইরাইটিক সালফাইডের জারণের ফলে সালফিউরিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারণে মাটির অম্লত্ব বেশি হয়। এ ধরনের মাটিকে কষযুক্ত মাটি বলে। এই মাটি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী। মাটির এই অম্লত্ব প্রতিরোধের জন্য সাধারণত ৩ প্রকারের চুন ব্যবহার করা হয়, যেমন

(ক) কার্বনেট চুন (পাথুরে চুন)- (ডলোমাইট)
(খ) অক্সাইড চুন- (পোড়া চুন/কুইক লাইম)
(গ) হাইড্রোক্সাইড চুন

মৃদু অম্লযুক্ত মাটির এলাকায় চিংড়ি খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা ভালো। কারণ মৃদু অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত ভালো। অধিক অম্লযুক্ত মাটি চিংড়ি চাষের অনুপযোগী। এজন্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ জেনে গলদা খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। দোআঁশ, এঁটেল, বা বেলে দোআঁশ মাটি সাধারণত গলদা চিংড়ির পুকুরের জন্য উত্তম। এ ধরনের মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বেশি এবং এই মাটি দিয়ে তৈরি পুকুরের পাড় শক্ত ও মজবুত ও স্থায়ী হয় গলদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া উচিত:

উপাদান	পরিমাণ
মাটির বুনট	এঁটেল-দোআঁশ
পিএইচ	৫.০-৬.৫
নাইট্রেট	৫০-৭৫ (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
ফসফেট	১০-১২ (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
ক্যালসিয়াম	৪০-৫০ (মিগ্রা/১০০ গ্রাম)
জৈব পদার্থ	২.৫-৫%

২০২২

(২) পানি

পানির গুণাগুণের ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। গলদা খামারের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন স্বাদু পানি সহজেই পাওয়া যায়। মিঠা পানিতে সাধারণত গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। তবে ৪ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ত পানিতে গলদা চাষে কোনো সমস্যা হয় না। পানির তাপমাত্রা ১৮° সে এর নিচে এবং ৩৫° সে এর উর্ধ্বে হলে চিংড়ির মৃত্যু ঘটে। পানির তাপমাত্রা ২৪° সে এর নিচে নামলে এবং ৩১° সে এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। জোয়ার ভাটা প্রভাবিত এলাকায় গলদা খামার স্থাপন করলে পানি ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়। এর ফলে নলকূপের পানির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে যায় এবং এতে চাষির অনেক অর্থেরও সাশ্রয় হয়। গলদা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত পানির গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া দরকার:

১. তাপমাত্রা	: ২৬-৩০° সে
২. দ্রবীভূত অক্সিজেন	: ৪ পিপিএম এর বেশি
৩. পিএইচ	: ৭.৫-৮.৫
৪. লবণাক্ততা	: ০-৪.০ পিপিটি
৫. সম্পূর্ণ হার্ডনেস	: ১০০ পিপিএম এর কম
৬. লৌহ	: ১.০ পিপিএম এর কম
৭. হাইড্রোজেন সালফাইড	: ০.০৩ পিপিএম এর কম
৮. অআয়নিত অ্যামোনিয়া	: ০.১ পিপিএম এর কম।

কীটনাশক দূষণমুক্ত এবং ভারী ধাতুমুক্ত পানি গলদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত। এছাড়া কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থজনিত দূষণমুক্ত পানির উৎসের কাছাকাছি গলদা খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করা ভাল।

(৩) বন্যা, প্লাবন ও দূষণমুক্ত এলাকা

হঠাৎ বন্যা, প্লাবন বা ঢলে খামার যেন তলিয়ে না যায় এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে। বন্যা, প্লাবন বা ঢলে খামার তলিয়ে গেলে সমস্ত চিংড়ি বের হয়ে যায়, খামারের পাড় ও স্লুইস গেইট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে চাষির ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। শহর এবং শিল্প এলাকায় পার্শ্বস্থ নদীতে পানি দূষণের সম্ভাবনা থাকে। শহরের ময়লা আবর্জনা এবং শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিতে মিশে পানি দূষণ করে। এই পানি গলদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত পানি গলদা খামারে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৪) পানির উৎস

বৃষ্টির পানি, নদী-খাল বা ভূগর্ভস্থ নলকুপ থেকে পানি গলদার খামারে সরবরাহ করা যায়। খামার এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেখানে স্বচ্ছ, দূষণমুক্ত ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ মিঠা পানি সহজেই পাওয়া যায়। নদী বা খালের পানিতে জৈব ও অজৈব ভাসমান পদার্থ কম থাকতে হবে এবং পানি দূষণমুক্ত হওয়া একান্তভাবে দরকার। নলকূপের পানিতে সাধারণত লৌহ বা ভারী ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এসব উৎসের পানি সরাসরি পুকুরে সরবরাহ করা ঠিক নয়। এই পানি থিতানারে পর খামারে সরবরাহ করা উচিত।

২০২২

(৫) পোনা ও চাষ উপকরণাদির প্রাপ্যতা

গলদা খামার এমন জায়গায় স্থাপন করা উচিত যেখানে চিংড়ি পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- চুন, সার, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণাদি সহজে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

(৬) অবকাঠামোগত সুবিধাদি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, বিপণন বাজার ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধাদি আছে এমন এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করতে হবে।

(৭) ভূমির উচ্চতা ও বন্ধুরতা

খামারের জন্য নির্বাচনকালে জমির এবং বন্ধুরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। পুকুর নির্মাণের জন্য কতটা মাটি খনন করতে হবে, বাঁধের উচ্চতা কত হবে এবং পুকুরে কি পরিমাণ পানি ধারণ করা যাবে, পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমির উচ্চতা ও বনধুরতা সম্পর্কে পূর্বধারণা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন।

(৮) বিদ্যুৎ সরবরাহ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দরকার। বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব নয়। চিংড়ি খামারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা প্রয়োজন।

(৯) দক্ষ জনশক্তি

দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি ছাড়া সফলভাবে চিংড়ি চাষ করা যেমন সম্ভব নয় ঠিক তেমনিভাবে চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। এজন্য সহজে দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় এবং নিয়োগকৃত কর্মচারীগণ যেন বসবাসের ভালো পরিবেশ পায় এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিত যাতে কর্মচারীদের দক্ষতা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

(১০) বিবিধ

নিরাপত্তা, সামাজিক পরিবেশ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা খামার স্থাপনকালে বিবেচনায় রাখা উচিত। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয় এমন এলাকায় খামার স্থাপন করতে হবে।

খামার নির্মাণ কৌশল

খামারের উপযুক্ত নকশা প্রণয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পিত চাষ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। গলদা চিংড়ি খামারে উৎপাদন, লক্ষ্যমাত্রা, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বিশেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয়। চাষ সুবিধার জন্য খামারে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসম্মত পানি সঞ্চালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এছাড়া পানির গভীরতা ও চাষকৃত চিংড়ির পরিচর্যার জন্য খামারে বিভিন্ন প্রকার পুকুর নির্মাণ করতে হবে। একটি আধুনিক খামারের নকশা চূড়ান্তকরণের পূর্বে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার।

(১) পানি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা
(২) পানি নিষ্কাশনের সুবিধা।
(৩) বন্যা বা প্লাবনের সময় পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা
(৪) মাটির ধরন।
(৫) বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
(৬) মাটির পানি ধারণক্ষমতা ইত্যাদি

চাষ সুবিধার জন্য খামারে মূল অবকাঠামোর ব্যবহার ও নির্মাণ পদ্ধতি নিচে বর্ণিত হলোঃ

নার্সারি পুকুর

বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারে নার্সারি পুকুর রাখা হয় না। বর্তমানে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সরাসরি গলদা চাষের পুকুরে মজুদ করা হয়। এর ফলে পোনার মৃত্যু হার অনেক বেশি হয় এবং চিংড়ি চাষি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অধুনা নার্সারি পুকুরে প্রতিপালিত ৩-৫ গ্রাম ওজনের চিংড়ি পোনার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা নার্সারি পুকুরে ৩০-৪০ দিন প্রতিপালনের পর মজুদ পুকুরে মজুদ করলে উৎপাদন বেশি হয়। মোট চাষ এলাকার ১০-১৫% এলাকায় নার্সারি পুকুর স্থাপন করা যেতে পারে। নার্সারি পুকুরে পোনা পরিচর্যা পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থ সবল পোনা উৎপাদন করা যায়। বর্গাকার বা আয়তকার নার্সারি পুকুরের আয়তন ৫০০ বর্গমিটার থেকে ১০০০ বর্গমিটার হতে পারে এবং সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ৩০ থেকে ৫০টি পোনা মজুদ করা যায়। নার্সারি পুকুরে পোনার বাঁচার হার প্রায় ৭০%। নার্সারি পুকুরে ৩০-৪০ দিন পোনা প্রতিপালনের পর মজুদ পুকুরে ৪-৫ মাস প্রতিপালন করে বছরে কমপক্ষে ২টি ফসল উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর ছাড়াও বর্তমানে পেন নার্সারি, ভাসমান নার্সারি বা ট্যাংক নার্সারিতে পোনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। নার্সারিতে পানির সঞ্চালন ও গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পোনার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

মজুদ বা পালন পুকুর

পালন পুকুর একটি খামারের প্রধান অবকাঠামো যেখান থেকে চিংড়ি চাষের লাভ ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পালন পুকুর বর্গাকার বা আয়তকার হলে ভালো হয়। পালন পুকুরের আয়তন ০.৫ হেক্টর থেকে ১.০ হেক্টর হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। বেশি বড় পুকুর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে নির্মাণ খরচ কমানোর জন্য অনেকে ২-৩ হেক্টর আয়তনের পুকুরও নির্মাণ করে থাকে। সাধারণত চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গলদা চাষের পুকুরের আয়তন নির্ধারণ করা হয়। সনাতন চাষ পদ্ধতিতে পুকুরের আকারের বা আয়তনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মিশ্র চাষ ও আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ০.২৫-২.০ হেক্টরের পুকুরে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয় এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ০.২৫-১.০ হেক্টর আয়তনের পুকুরে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। খামারের প্রতিটি পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেইট থাকা প্রয়োজন। পুকুরের তলদেশ ক্রমান্বয়ে নিষ্কাশন গেইটের দিকে ঢালু থাকা উচিত। এর ফলে প্রয়োজনানুসারে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সহজ হয়। পুকুরের পাড় থেকে ৩ মিটার দূরে পুকুরের ভিতরের দিকে ২ মিটার প্রশস্থ ও ০.৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি খাল পাড়ের চারপাশে এবং পুকুরের মাঝ বরাবর দু'পাড়ের খালের সংযোগের জন্য খাল নির্মাণ করা হয়। এই খাল চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুকুর থেকে চূড়ান্তভাবে চিংড়ি ধরার, সময় এসব খাল ব্যবহার করা যায়। পালন পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.২ মিটার রাখা দরকার। এজন্য পুকুর পাড় থেকে পুকুরের তলার পানির গভীরতা ১.৫ মিটার হলে ভালো হয়।

বাঁধসমূহ

বাঁধের উচ্চতা পুকুরের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা কমপক্ষে ০.৬০ মিটার উঁচু থাকা দরকার। বেষ্টনী বাঁধ, পুকুর বা খালের বাঁধ যাই নির্মাণ করা হোক তা অবশ্যই ভালোভাবে কমপ্যাক্ট করে নির্মাণ করতে হবে। সঠিকভাবে কমপ্যাক্ট করা না হলে বাঁধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং পুকুরের পানি ধরে রাখতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। বাঁধের উচ্চতা, মাটির ধরন এবং পানির ঢেউ ও স্রোতের ওপর নির্ভর করে বাঁধের ঢাল নির্ধারণ করা হয়। মাটির পুকুরের বাঁধের বাইরে ও ভিতরের উভয় দিকে ৩:১ এবং এঁটেল মাটিতে ২:১ হারে ঢালু হওয়া প্রয়োজন। এঁটেল মাটির ক্ষেত্রে বাঁধের ঢাল পুকুরের ভিতরের দিকে ১:১ রাখা যায়।

২০২১

চিত্রঃ গলদা চিংড়ি খামারের বাঁধ একটি বাঁধের উচ্চতা নিম্নবর্ণিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়ঃ

$$\text{বাঁধের উচ্চতা} = \frac{(\text{ক}-\text{খ}+\text{গ})}{\text{১}-\%\ \text{সংকোচন}}$$

এখানে,

ক= সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক সর্বোচ্চ জোয়ারের উচ্চতা

খ= চাষের জমির উচ্চতা থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতার পার্থক্য এবং

গ= বাঁধ কতটুকু অতিরিক্ত উঁচু করা হবে তার পরিমাণ

উদাহরণঃ

মনে করি, একটি চিংড়ি চাষের জমি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে ১.০ মিটার উঁচু। উক্ত স্থানে জোয়ারের পানির সাধারণ উচ্চতা ২ মিটার এবং ১০ বছরের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী উক্ত স্থানে সর্বোচ্চ জোয়ারের উচ্চতা ২.৫ মিটার তবে বাঁধের উচ্চতা কত হবে? (সাধারণত একটি বাঁধের সংকোচন ২০% এবং বাঁধের অতিরিক্ত উচ্চতা ০.৬০ মিটার ধরা হয়)।

$$\text{বাঁধের উচ্চতা} = \frac{(\text{২.৫}-\text{১})+\text{০.৬০}}{\text{১}-\text{২০}\%}$$

$$= \frac{\text{১.৫}+\text{০.৬০}}{\text{১}-\frac{\text{২০}}{\text{১০০}}} = \frac{\text{২.১}}{\frac{\text{১০০}-\text{২০}}{\text{১০০}}}$$

$$= \frac{\text{২.১}}{\frac{\text{৮০}}{\text{১০০}}} = \frac{\text{২.১}\times\text{১০০}}{\text{৮০}}$$

$$= \frac{\text{২.১}\times\text{১০}}{\text{৮}} = \frac{\text{২১}}{\text{৮}}$$

$$= \text{২.৬২ মিটার}$$

যে কোনো খামারে কোনো বাঁধ নতুনভাবে তৈরি করতে কি পরিমাণ মাটির প্রয়োজন হবে তা সহজেই নিচের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। মোট মাটির পরিমাণ =১/২ (উপরিতলের প্রশস্ততা + ভূমির প্রশস্ততা)×উচ্চতা ×মোট দৈর্ঘ্য। যদি একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, প্রস্থ ৪০ মিটার, বাঁধের ভূমির প্রশস্ততা ৩ মিটার এবং বাঁধের উপরিভাগের প্রশস্ততা ১ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার হয় তাহলে তলের বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য হবে ২৮০ মিটার। অতএব মোট মাটির পরিমাণ = ১/২(১+৩)×২×২৮০ ঘনমিটার = ১১২০ ঘনমিটার।

১ হেক্টর আয়তনের পুকুর নির্মাণের জন্য একটি আয়তকার স্থান নির্বাচন করতে হবে। ধরা যাক, পুকুরের দৈর্ঘ্য ১২৫ মিটার এবং প্রস্থ ৮০ মিটার। এবার পুকুরের জন্য নির্বাচিত স্থানের চার কোণায় ৪টি বাঁশের খুঁটি স্থাপন

করতে হবে। খুঁটি থেকে দড়ি বা চুনের সাহায্যে চারপাশে সোজা দাগ দিতে হবে। বাঁধের ভিতরের ঢাল ১.৫: ১ এবং গভীরতা ১ মিটারের জন্য চারপাশের দাগ থেকে ১.৫ মিটার ভেতরের দিকে আর একটি আয়তক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে। ভিতরের এই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১২২ মিটার ও প্রস্থ ৭৭ মিটার হবে এবং এই আয়তক্ষেত্রের চারকোণায় বাঁশের খুঁটি পুঁতে চিহ্নিত করতে হবে। এবার বাইরের চারপাশের দাগ থেকে ভিতরের চারপাশের দাগ পর্যন্ত সরল রেখা বরাবর ১.৫ঃ ১ ঢাল রক্ষা করে মাটি কাটতে হবে। উত্তোলিত মাটি পুকুরের পাড় তৈরির জন্য বাইরের দাগ থেকে ১ মিটার দুরে ফেলতে হবে। এতে পুকরের চতুর্দিকে ভূমির সমতলে ১ মিটার প্রশত বকচর সৃষ্টি হবে। উত্তোলিত মাটি দিয়ে পাড় তৈরি করতে হবে এবং এই পাড়ের বাইরের দিকে ঢাল ২:১ রাখতে হবে। পুকুরের মাটি কাটা শেষ হলে পুকুরের তলদেশের আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ১২২ মিটার এবং প্রস্থ ৭৭ মিটার হবে। তৈরি করার সময় পাড়ের মাটি ভালোভাবে কমপ্যাক্ট করতে হবে যাতে পাড় শক্ত হয়। পাড়ের মাটি যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে না যায় সেজন্য পাড়ে ঘাসের চাপ ভালোভাবে লাগাতে হবে।

পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা।

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি গলদা খামারের পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা পানি সরবরাহ, পানি শোধন, পানি সরবরাহ খাল ও পানি নিষ্কাশন খাল সমন্বয়ে গঠিত। সাফল্যজনকভাবে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য খামারে পরিকল্পিত ও উন্নতমানের পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পুকুরে পরিকল্পিত ও নিয়মিত পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা যায়।

(১) পানি সরবরাহ

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য তিনটি উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করা যায়। উৎস তিনটি হচ্ছে

(ক) বৃষ্টির পানি

(খ) নদী বা খালের থিতানো দূষণমুক্ত পানি

(গ) ভূগর্ভস্থ ভারী ধাতুমুক্ত পানি

গলদা খামারে বর্ষাকালে সাধারণত বৃষ্টির পানি সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে অন্য কোনো উৎস থেকে খামারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা ভালো। চিংড়ি চাষ পদ্ধতি এবং পুকুরে চিংড়ির মজুদ সংখ্যার ওপর নির্ভর করে পুকুরে পানি সরবরাহের পরিমাণ। যে সমস্ত পুকুরে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সে সমস্ত পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। পানি পরিবর্তন ছাড়াও পুকুরে পানির গভীরতা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য পুকুরে পানি সরবরাহ করা হয়।

(২) পানি শোধন

খাল বা নদীর পানি পুকুরে সরবরাহের পূর্বে তা থিতিয়ে নেয়া ভালো, কারণ এ পানিতে দ্রবীভূত ভাসমান জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে যা চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। তাছাড়া এই পানিতে অবাঞ্ছিত প্রাণী, প্রাণীর ডিম, লার্ভা ইত্যাদি থাকে যা পানির সাথে পুকুরে প্রবেশ করে চিংড়ির উৎপাদন কমিয়ে দেয়। তাই এই পানি পুকুরে সরবরাহের পূর্বে সরবরাহ খালে বা জলাধারে তা থিতিয়ে ফিল্টার বা ২৫০ মাইক্রন নেটের মাধ্যমে ছেকে পুকুরে সরবরাহ করা উচিত। এর ফলে অবাঞ্ছিত প্রাণীর প্রবেশ রোধ করা যায়। ভূগর্ভস্থ পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভারী ধাতু মিশ্রিত থাকে। এই সব ভারী ধাতু অনেক সময় চিংড়ি চাষ বাধাগ্রত করে। এই জন্য ভূগর্ভস্থ পানি সরাসরি সরবরাহ করা ঠিক নয়।

ভূগর্ভস্থ পানি পুকুরে সরবরাহের পূর্বে তা সরবরাহ খাল বা জলাধারে পর্যাপ্ত বায়বীয় করে নেওয়া উচিত। পানির ভারী ধাতু চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর।

(৩) পানি সরবরাহ খাল

পানি সরবরাহের জন্য যে সমস্ত খামার বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল সেসব খামারে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল নির্মাণের প্রয়োজন নেই। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির অভাব হলে চিংড়ি চাষের বিঘ্ন ঘটে। এজন্য প্রয়োজনে যে কোনো সময় খামারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর এই আপদকালীন সময়ে পানি সরবরাহের জন্যই খামারে পানি সরবরাহ খাল নির্মাণ করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় পানি প্রাপ্তির উৎস থেকে সরাসরি পানি পুকুরে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ খালের মাধ্যমে পানি পুকুরে সরবরাহ করা হয়। পুকুরে সরবরাহের সময় যাতে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি পুকুরে স্লুইস গেইট থাকা দরকার। আবার যেসব খামারে শোধনকৃত পানি সরবরাহ করা হয় সেসব খামারের পুকুরের বাঁধের উপর নির্মিত নালার মাধ্যমে অভিকর্ষ পদ্ধতিতে পুকুরে পানি সরবরাহ করা হয়।

(৪) পানি নিষ্কাশন খাল

পুকুর শুকানো এবং পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হয়। নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হয়। এই নিষ্কাশন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পুকুরের তলদেশ পানি প্রবেশ করানোর গেইটের দিক থেকে নিষ্কাশন গেইটের দিকে ঢালু (১:২০০) হতে হবে। সাধারণত পুকুরের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে অভিকর্ষ পদ্ধতিতে পুকুর থেকে নিষ্কাশন করা হয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে খামারের বাইরের পানির উচ্চতা বেশি থাকে বিধায় অনেক সময় খালের মাধ্যমে পানি অভিকর্ষ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ গলদা খামারেই পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে খামারের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং চিংড়ির নানা রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. মাটির অম্লমান কত হলে তাকে অম্লমাটি বলা হয়?

২. পাথুরে চুনের রাসায়নিক নাম কি?

৩. গলদা চাষের জন্য কী ধরনের মাটি উত্তম?

৪. গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত থাকা দরকার?

৫. চিংড়ি চাষের পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া দরকার?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. গলদা চিংড়ি চাষের জন্য স্থান নির্বাচনের সুবিধাগুলে লেখ।

২. বাংলাদেশের কোন এলাকার মাটির অম্লত্ব বেশি?

৩. বাঁধের উচ্চতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

৪. নতুন বাঁধের মোট মাটির পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন।

১. গলদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগুণ বর্ণনা কর।

২. গলদা চিংড়ির চাষে ব্যবহৃত পানির গুণাগুণ বর্ণনা কর।

৩. গলদা চিংড়ি চাষের পুকুর নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. গলদা খামারের পানি সরবরাহ খাল সম্পর্কে লেখ।

২০২২

চতুর্থ অধ্যায়

গলদা খামার প্রস্তুতকরণ

চিংড়ি চাষের জন্য খামারে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করে খামারটিকে মজুদের উপযোগী করে তালোই হচ্ছে খামার প্রস্তুতকরণ অর্থাৎ পুকুরে চিংড়ি চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে খামার প্রস্তুতকরণের প্রধান উদ্দেশ্য । খামার প্রস্তুতকরণের প্রধান পদক্ষেপগুলো হচ্ছে- পুকুরের পাড় মেরামত, সুইস গেইট মেরামত, আগাছা দমন, পুকুর শুকানো, রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন, চুন প্রয়োগ ও পানি সংগ্রহ ।

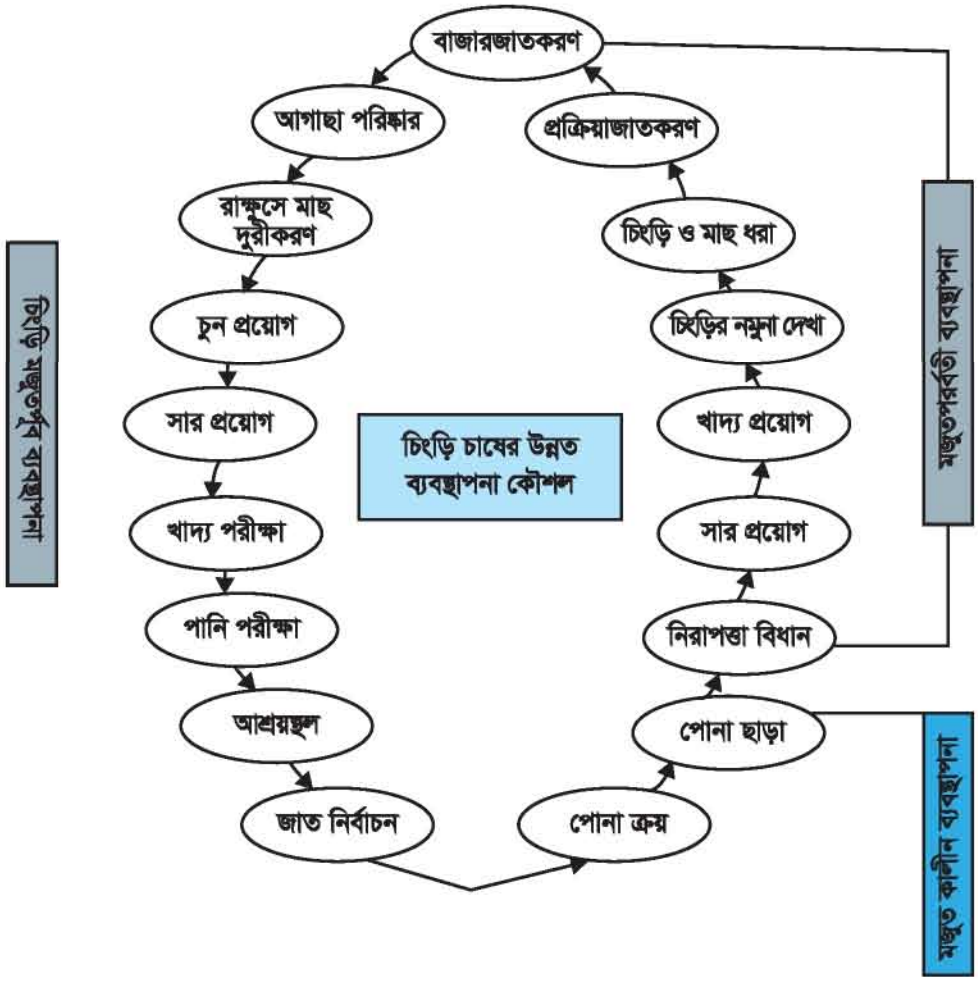

চিত্র: গলদা চিংড়ি চাষ

পাড় মেরামত

চিংড়ি চাষের জন্য কখনও কখনও পাড় মেরামত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ পুকুরের ভাঙা পাড় মেরামত না করলে নিম্নবর্ণিত সমস্যা দেখা দিতে পারে:

— বাইরে থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্ছিত মাছ প্রবেশ করতে পারে।
— বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে।
— বাইরের দূষিত পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে।
— ভেতরের খাদ্যযুক্ত উর্বর প্রাণী বের হয়ে যেতে পারে।

চিত্র: গলদা খামার

স্লুইস গেইট মেরামত

গলদা চিংড়ির পুকুরে পানি সরবরাহ খালে ছোট ছোট স্লুইস গেইট স্থাপন করা থাকে। এসব স্লুইস গেইট ভেঙে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো মেরামত বা পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা পুকুরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটবে। ফলে চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

আগাছা দমন

গলদা চিংড়ির পুকুরে নানা ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। পুকুরে অল্প পরিমাণ উদ্ভিদ চিংড়ি চাষের সহায়ক হলেও এর পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হলে তা চিংড়ি চাষের জন্য অনেক সময় মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। পুকুরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সহাবস্থান প্রয়োজন। তবে এই সহাবস্থান উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। তাই চিংড়ি চাষের জন্য আগাছা সীমিত পর্যায়ে রাখতে এর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো উদ্ভিদ রৌদ্রের প্রখর তাপ থেকে চিংড়িকে রক্ষা করে। তবে মাত্রাতিরিক্ত উদ্ভিদ চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর। গলদা চিংড়ির পুকুরে জলজ উদ্ভিদের ক্ষতিকর দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- চিংড়ির আশ্রয়স্থল দখল করে ফেলে
- রাক্ষুসে মাছের আবাসস্থল সৃষ্টি করে
- পুকুরে পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে পানির উর্বরা শক্তি কমিয়ে ফেলে
- অবাঞ্ছিত প্রাণী যেমন, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়
- জলজ উদ্ভিদ পুকুর থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে

২০২২

- পানিতে সূর্যালোক পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়
- জলজ উদ্ভিদ পচে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে ।
- চিংড়ির চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে ।
- চিংড়ি আহরণে বাধার সৃষ্টি করে ।

জলজ উদ্ভিদ বলতে অতি ক্ষুদ্র শেওলা যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় সে রকম উদ্ভিদ থেকে কচুরিপানা, কলমিলতা পর্যন্ত সব উদ্ভিদকে বুঝায় । বৃদ্ধি, সভাব ও বাসস্থলের প্রকৃতি অনুসারে জলজ উদ্ভিদকে নিচের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় । পুকুরে সাধারণত পাঁচ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় । যথা

(১) শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ
(২) নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ
(৩) ভাসমান উদ্ভিদ
(৪) নির্গমনশীল উদ্ভিদ
(৫) লতানো উদ্ভিদ

(১) শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ

শেওলা বলতে শুধু অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদকেই বুঝায় না । তন্তুজাতীয় উদ্ভিদ এবং দলবদ্ধ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত । শেওলার পাতা ও ফুল থাকে না তবে এদের বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ অপেক্ষা দ্রুত ঘটে থাকে । শেওলা সাধারণত পানির উপরিভাগে অবস্থান করে । পুকুরে সাধারণত তিন ধরনের শেওলা দেখা যায় । যথা-

(ক) শাখাযুক্ত শেওলা: এই জাতীয় শেওলা শাখাযুক্ত এবং পুষ্পবাহী উদ্ভিদের মতো । এই শেওলার কোনো অংশ পানির উপরিভাগের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় না । যথা-চারা, নিটেলা ইত্যাদি ।

(খ) তন্তু জাতীয় শেওলা: এই জাতীয় শেওলা খালি চোখে দেখা যায় । পুকুরের পাড় ও তলদেশে এরা জন্মায় এবং পরে পানির উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে । এই শেওলা পচে পানির উপরিভাগে গাদ সৃষ্টি করে ফলে পানি দূষিত হয় এবং এতে মাছ মারা যেতে পারে । যেমন-ইউলোথ্রিক্স, পাইরোগাইরা, ক্লাডোফোরা ইত্যাদি ।

(গ) এককোষী বা দলবদ্ধ শেওলা: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই জাতীয় শেওলা ভালোভাবে দেখা যায় । পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে এই জাতীয় শেওলা জন্মায় যা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । তবে অধিক পরিমাণে জন্মালে পানিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে ফলে মাছের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় । এই শেওলার আধিক্য পানিতে সূর্যালোক পৌছাতে বাধা দেয় । যেমন-ইউগেনা, ডায়াটম, ভলভক্স ইত্যাদি ।

(২) নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ

এই জাতীয় উদ্ভিদ পুকুরের তলদেশে জন্মায় । এদের বৃদ্ধি পানির তলদেশেই ঘটে থাকে । নিমজ্জনশীল উদ্ভিদের কা- ও পাতা পানির তলদেশে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে । তাই এ জাতীয় উদ্ভিদকে ডুবন্ত উদ্ভিদ বলা হয় । চিংড়ি বা মাছের স্বাভাবিক চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় । এরা পুকুরের তলদেশে সূর্যালোক পৌছাতে । বিঘ্ন ঘটায় । যেমন- পাতা ঝাঝি, কাঁটা ঝাঝি ইত্যাদি ।

২০২২

চিত্র: নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ

(গ) ভাসমান উদ্ভিদ

এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও পাতা আছে। পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদের শিকড় পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। আবার কিছু উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের তলদেশে মাটিতে থাকে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে জলজ আগাছা হিসেবে পরিচিত। কারণ এরা পুকুরে সূর্যালোক পৌঁছতে বাধা দেয় এবং পানির পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করে। যথা- কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

কচুরিপানা

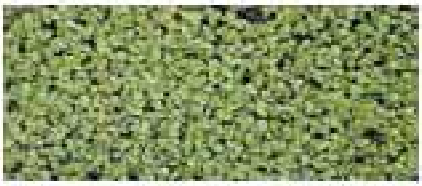

ক্ষুদিপানা

শাপলা

পদ্ম

চিত্র: ভাসমান উদ্ভিদ

(৪) নির্গমনশীল উদ্ভিদ

এই উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের তলদেশে মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে। এই উদ্ভিদের অংশ বিশেষ পানির উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পুকুরের তলদেশে সূর্যালোক পৌঁছাতে এরা বাধা সৃষ্টি করে। যেমন বিষকাটালি, আড়াইল ইত্যাদি।

চিত্র: নির্গমনশীল উদ্ভিদ

(৫) লতানো উদ্ভিদ

এই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের পাড়ে থাকে কিন্তু এদের কান্ড ও পাতা পানির উপরিভাগে থাকে এবং পানির উপরিভাগকে প্রায় আবৃত করে ফেলে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি।

চিত্র: লতানো উদ্ভিদ

আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

চিংড়ি চাষে যাতে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য আগাছা দমন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকা দরকার কিন্তু জলজ উদ্ভিদ পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ফলে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয়। তাই চিংড়ি চাষের পুকুরে আগাছা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে খুব অল্প সময়েই একটি পুকুর অনাবাদী বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হতে পারে। পুকুরের আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণ চারটি উপায়ে করা যায়। যথা-

(১) সার প্রয়োগ পদ্ধতি
(২) যান্ত্রিক পদ্ধতি
(৩) জৈবিক পদ্ধতি
(৪) রাসায়নিক পদ্ধতি

চিত্রঃ পাড় মেরামত

চিত্রঃ জলজ আগাছা পরিষ্কার

(১) সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সাধারণত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। তবে নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণের জন্যও অনেক সময় পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সার প্রয়োগে উৎপাদিত তলাতু শেওলা, নিমজ্জনশীল আগাছা দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পানির উপরিভাগে একটি স্তর পড়ে যায় ফলে সূর্যরশ্মি পুকুরের তলদেশে প্রবেশ করতে পারে না এবং এ কারণে আগাছার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও পরবর্তীতে মারা যায়। এভাবে সার প্রয়োগের মাধ্যমে নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ দমন করা সহজ।

(২) যান্ত্রিক পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ বেশ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য। স্টিল ক্যাবল ও উইড স' ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায়। স্টিল ক্যাবল দিয়ে শেওলা ছাড়া সব ধরনের জলজ আগাছা পরিষ্কার করা যায়। পক্ষান্তরে উইড স' দিয়ে কেবল নরম জাতীয় নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ দমন করা যায়। তবে বাংলাদেশে মজুরি সস্তা বিধায় শ্রমিক দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ এবং এতে খরচও কম। কচুরিপানা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা ইত্যাদি আগাছা কায়িক শ্রম দ্বারা অপসারণ করা সহজ।

(৩) জৈবিক পদ্ধতি

জলজ আগাছা দমনের জন্য জৈবিক পদ্ধতি অধিক নিরাপদ ও কার্যকর। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে খরচও অনেক কম। এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের জন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের ফলে পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ নষ্ট হয় না। এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের জন্য রাজহাঁস ও পাতিহাঁস এবং গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া প্রভৃতি মাছ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) রাসায়নিক পদ্ধতি

জলজ আগাছা দমনের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে রাসায়নিক পদ্ধতি অধিক কার্যকর। অল্প সময়ে ও অল্প খরচে এই পদ্ধতিতে সব ধরনের আগাছা দমন করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের পূর্বে কোনো মৎস্যবিজ্ঞানী বা নিকটবর্তী মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া রাসায়নিক পদার্থ পুকুরে প্রয়োগের সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। পুকুরে চিংড়ি থাকা অবস্থায় কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ পুকুরে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কপার সালফেট, সোডিয়াম আরসেনাইট, ২-৪ ডি, এ্যাকুয়াথল পাস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন প্রকার জলজ আগাছা দমনে ব্যবহার করা হয়।

পুকুর শুকানো

প্রতিবার চিংড়ি চাষ করার পূর্বে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করে পুকুরের তলদেশের মাটি শুকিয়ে ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত রৌদ্রে শুকাতে হবে। বাংলাদেশে সাধারণত ফালগুন-চৈত্র মাসে পুকুর শুকানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। কারণ এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও খুব কম থাকে। এছাড়াও পুকুর মালিকগণ সুবিধাজনক যে কোন সময়ে পুকুর শুকাতে পারে। সম্পূর্ণভাবে পানি নিষ্কাশন করার পর পুকুর ভালোমত শুকাতে ২-৫ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়। পুকুরের তলদেশ সূর্যালোকে এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে মাটিতে ৪-৫ সেমি ফাটল সৃষ্টি হয়। তবে মাটিতে অ্যাসিড বা কষ থাকলে ফাটল সৃষ্টি না করাই উত্তম। তাছাড়া পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ৩-৫ সেমি এর বেশি গর্ত না হয় তবে এতেও শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ সময় পুকুরের তলদেশে কাদার পরিমাণ বেশি থাকলে প্রয়োজনবোধে এক স্তর কাদা উঠিয়ে ফেলা যেতে পারে। এ সময় পুকুরের তলদেশের উপরিভাগ যাতে সমতল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর ফলে পুকুরের চিংড়ি আহরণ এবং পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা সহজ হয়।

যে সব পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয় সে সব পুকুরের পানি এমন পরিমাণে নিষ্কাশন করতে হবে যেন পুকুরের তলদেশ পর্যন্ত প্রচুর সূর্যরশ্মি পৌছতে পারে। এসব পুকুরে পরে বিষ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করা হয়। যে সব পুকুরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিরামভাবে চিংড়ি চাষ করা হয়েছে অথবা পুকুরের তলদেশে যদি কালো রঙের জৈব তলানি সৃষ্টি হতে দেখা যায় তবে পুকুরের তলদেশ কিছুদিন শুকানোর পর ৫-১৫ সেমি গভীর করে ভালোভাবে চাষ দিতে হবে এবং রোদে আবারও ভালোভাবে শুকাতে হবে।

পুকুর শুকানোর উপকারিতা

- পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকানোর ফলে সব ধরনের রাক্ষুসে মাছ, অবাঞ্ছিত প্রাণী ইত্যাদি দূরীভূত হয়।
- পুকুরের তলদেশে বিদ্যমান জৈবিক পদার্থসমূহ আলো বাতাসের প্রভাবে মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটিতে পুষ্টিকারক উপাদানের পর্যাপ্ততা ঘটে এবং এতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- মাটিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসসমূহ দূরীভূত হয়।
- পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে মাটিতে বিদ্যমান অনেক ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগজীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
- পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে মাটির গাঠনিক কাঠামো মজবুত হয়। ফলে মাটির পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- মাটি শুকানোর ফলে তলদেশের মাটি পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

আধুনিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী মুক্ত খামারই উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। তাই চিংড়ি খামারে পোনা মজুদ করার পূর্বেই পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করা দরকার। পুকুর শুকিয়ে অথবা নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পেস্টিসাইড ব্যবহার করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করা যায়। গলদা চিংড়ির খামারে যে সব রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে বেলে, ভেটকি, টেংরা, দাতিনা, তেড়ে বোয়াল, শোল, ফলি প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য। গলদা খামারে অবাঞ্ছিত প্রাণীর মধ্যে চান্দা, পোর্স, তেলাপিয়া, তপসী, পায়রা, কঁকলে, সাপ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ফলি

টেংরা

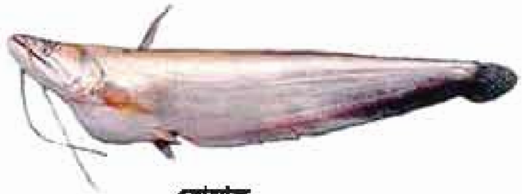
বোয়াল

ভেটকি

বেলে

শোল

চিত্রঃ বিভিন্ন প্রজাতির রাক্ষুসে মাছ

রাক্ষুসে মাছ এবং অবাঞ্ছিত মাছ ও প্রাণীর ক্ষতিকর দিকসমূহঃ

- এরা গলদা চিংড়ি খেয়ে ফেলে
- গলদা চিংড়ির জন্য সরবরাহকৃত খাবারে ভাগ বসায়
- এরা চিংড়ির আবাসস্থল দখল করে
- পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে
- এরা রোগ জীবাণু ছড়ায়
- পুকুরের পাড়ে গর্ত করে পাড় নষ্ট করে ফেলে

চিত্র: বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত মাছ

চিত্র: বিভিন্ন প্রজাতির অবাঞ্ছিত জলজ পোকা

পেস্টিসাইড

রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব বা রাসায়নিক পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যে কোনো ধরনের পেস্টিসাইড পুকুরে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ কিছু কিছু পেস্টিসাইড আছে, যেগুলো প্রয়োগের ফলে মৃত মাছ খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাছাড়া এসব পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ থাকে। এতে চিংড়ি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য বারবার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা এবং পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভালো। যদি পুকুর সম্পূর্ণরূপে শুকানো সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে জৈব পেস্টিসাইড হিসেবে রোটেনন, মহুয়ার খৈল, চা বীজ খৈল, তামাকের গুড়া প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারে সুবিধাসমূহ নিচে দেয়া হলো:

- পোনা মজুদের পূর্বে জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং ক্ষতিকর পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে মজুদকৃত পোনার মৃত্যুহার অনেক কমে যায়।
- জৈব পেস্টিসাইড মাছের ফুলকার কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। ফলে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং মাছের দেহে কোনো বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এভাবে মৃত মাছ খেলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।
- এদের বিক্রিয়া অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এরা জৈব সার হিসেবে কাজ করে। ফলে চিংড়ি চাষির আর্থিক সাশ্রয় হয়।
- পরিমিত মাত্রায় জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে পুকুরের পানি ব্যবহার উপযোগী থাকে।
- পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় না।
- কোনো কোনো পেস্টিসাইড যেমন- রোটেনন, চা বীজ খৈল ইত্যাদি চিংড়ি চাষকৃত পুকুরে প্রয়োগ করেও রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করা যায়।

জৈব পেস্টিসাইড প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুরের পানির আয়তন ও গভীরতা জেনে সুবিধামতো পেস্টিসাইড নির্বাচন করে নিম্নে বর্ণিত ছক অনুযায়ী পরিমাণ জেনে নিচের নির্দেশিত উপায়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে:

পানিতে জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের মাত্রা

পেস্টিসাইড	কেজি/হে/মি	কেজি/একর/মি	গ্রাম/শতকমিশ	গ্রাম/ঘনমিটার	গ্রাম/ঘনফুট
১. রোটেনন	২০-৩০	৮-১২	৮০-১২০	২-৩	০০৭
২. চা বীজ খৈল	৪০	১৬	১৬০	৪	০.১১
৩. তামাকের গুড়া	২০০-৪০০	৮০-১৬০	৮০০-১৬০০	২০-৪০	০.৮৫

* পানির গভীরতার পরিমাণ

রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

রোটেনন এক ধরনের হালকা বাদামি রং এর পাউডার জাতীয় পদার্থ। ডেরিস নামক এক ধরনের গাছের শিকড় থেকে রোটেনন তৈরি করা হয়। পাহাড়ি এলাকায় এ জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রোটেনন

২০২২

প্রয়োগে মৃত মাছ খেলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। নির্ধারিত পরিমাণ রোটেনন পাউডারের কিছু অংশ অল্প পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করে পুকুরের গভীর পানিতে নিক্ষেপ করতে হবে। এর ফলে কাদার নিচের ও উপরিভাগের প্রাণীসমূহ মারা যাবে। অবশিষ্ট পাউডার বেশি পানিতে গুলে পাউডারের দ্রবণ সমস্ত পুকুরে উত্তমরূপে ছিটিয়ে দিতে হবে। সূর্যালোকে এই পাউডারের বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু হয় বিধায় রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এই পাউডার পুকুরে প্রয়োগ করা ভালো।

চা বীজ খৈল প্রয়োগ পদ্ধতি

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমনের জন্য জানা মতে ক্যামেলিয়া প্রজাতির চা বীজ খৈল সবচেয়ে ভালো। এই পেস্টিসাইড প্রয়োগে পুকুরের চিংড়ি ও প্রাকৃতিক খাদ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। ফলে পুকুরে চিংড়ি চাষ করা অবস্থায় এই পেস্টিসাইড পুকুরে ব্যবহার করা যায়। নির্ধারিত মাত্রায় চা বীজ খৈল প্রয়োগ করলে পুকুরের পানিতে অবস্থিত রোটিফার, কপিপাড়ে প্রভৃতি খাদ্যকণার কোনো ক্ষতি হয় না এবং পেস্টিসাইড সহজেই পচনশীল এবং ২-৩ দিনের মধ্যে এর বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া চা বীজ খৈলের অবশিষ্ট অংশ পুকুরে সার হিসেবে কাজ করে। নির্ধারিত পরিমাণ চা বীজ খৈল প্রায় ২৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে স্যাপোনিন নামক বিষাক্ত পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়। পরে এই দ্রবণ আরও বেশি পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরের সমস্ত পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এই দ্রবণ পুকুরের পানিতে প্রয়োগের ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যেই সাধারণত মাছ মরতে শুরু করে। এই দ্রবণ প্রয়োগের সময় পানির গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত অর্থাৎ পানির গভীরতা একই মাত্রায় রাখলে দ্রবণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এই দ্রবণ প্রয়োগের সময় পুকুরের পানির গভীরতা যতদূর সম্ভব কম রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরপর মৃত মাছ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

তামাকের গুড়া প্রয়োগ পদ্ধতি

সিগারেট বা বিড়ি ফ্যাক্টরি থেকে তামাকের গুড়া সংগ্রহ করে অল্প পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়। নিকোটিন মিশ্রিত দ্রবণ বেশি পানিতে মিশিয়ে পুকুরের সমস্ত পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর কিছু সময়ের মধ্যেই এর বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সাধারণত শামুক, ঝিনুক ও কঁকড়া দমনের জন্য তামাকের গুড়া ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করে কাদার উপরিভাগে তামাকের গুড়া প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দিনের তাপমাত্রা বেশি থাকলে এবং রৌদ্রময় দিনে এই পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে এর বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু হয়। জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

- জৈব পেস্টিসাইড প্রয়োগের ফলে মৃত মাছ সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে নতুবা এই মাছ পচে পুকুরের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলতে পারে
- পেস্টিসাইড প্রয়োগের পর এর বিষক্রিয়া প্রশমনের জন্য কমপক্ষে ৭ দিন পুকুরের পানি ব্যবহার না করা ভাল
- বিষক্রিয়া দ্রুত সংগঠিত হওয়ার জন্য রৌদ্রময় দিনে পেস্টিসাইড ব্যবহার করা ভালো এবং রৌদ্রময় দিনে এর বিষক্রিয়াও তাড়াতাড়ি প্রশমিত হয়
- পেস্টিসাইড প্রয়োগের সময় শরীরে যাতে না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- পেস্টিসাইড প্রয়োগের সময় নির্ধারিত প্রয়োগ মাত্রার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে যেন এর ব্যবহার নির্ধারিত মাত্রার কম বা বেশি না হয়।

অজৈব পেস্টিসাইড প্রয়োগ পদ্ধতি

অজৈব বা রাসায়নিক পেস্টিসাইড প্রয়োগ করেও রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং প্রাণী দমন করা যায়। সাধারণত রাক্ষুসে মাছ দমন করতে এনড্রিন, থায়োডিন, বিচিং পাউডার, ফসটক্সিন প্রভৃতি রাসায়নিক পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সব রাসায়নিক দ্রব্যের বিষক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী, মৃত মাছ খাওয়া যায় না এবং গৃহস্থালির স্বাভাবিক কাজকর্মে পুকুরের পানি ব্যবহারও নিরাপদ নয়। এ সব পেস্টিসাইডের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এদের বিষক্রিয়া প্রশমিত হতে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ সময় লাগে। তাছাড়া অজৈব পেস্টিসাইড প্রয়োগের ফলে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়। এ সব কারণে পেস্টিসাইড হিসেবে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করাই ভাল।

ফসটক্সিন/কুইকফস/সেলফস প্রয়োগ পদ্ধতি

এই পেস্টিসাইড বাজারে ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায়। এই ট্যাবলেট সমানভাবে সমস্ত পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর জাল টেনে পুকুরের পানি ওলট-পালট করে দিতে হবে। এই ট্যাবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘণ্টা পর মাছ মরে ভাসতে শুরু করে এবং সাথে সাথে এ সব মৃত মাছ উঠিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ঔষধের বিষক্রিয়া ৭-১০ দিন স্থায়ী হয়। কম গভীর পুকুরে এর কার্যকারিতা বেশি।

প্রয়োগ মাত্রা

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	ট্যাবলেট সংখ্যা
১	৩০ সে.মি (১ ফুট)	১ টি
১০	৩০ সে.মি (১ ফুট)	১০ টি
৩৩	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	১৬৫ টি
৫০	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	২৫০ টি

বিচিং পাউডার প্রয়োগ পদ্ধতি

বিচিং পাউডার পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। তারপর এই দ্রবণ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটেয়ে দিতে হবে। এই দ্রবণ ছিটানারে ৩০ মিনিট পর জাল টেনে পানি ওলট-পালট করে দিতে হবে যাতে বিচিং পাউডারের দ্রবণ পুকুরে ভালাভাবে মিশে। এরপর ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে সমস্ত মাছ পুকুর থেকে তুলে ফেলতে হবে পুকুরে বিচিং পাউডারের বিষক্রিয়া ৮-১০ দিন পর্যন্ত থাকে। বিচিং পাউডার প্রয়োগের ফলে পুকুরের সমস্ত মাছ ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুক, পরজীবী প্রাণী ও অন্যান্য রোগজীবাণু মারা যায়। বিচিং পাউডার পুকুরে চুনের কাজও করে। ফলে পুকুরে বিচিং পাউডার প্রয়োগ করলে চুন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

প্রয়োগ মাত্রা

মাছ ও অন্যান্য প্রাণী দমনের জন্য ৫ নিযুতাংশ হারে ক্লোরিন প্রয়োগ করা হয়। বিচিং পাউডারে ৩০-৬০% ক্লোরিন থাকে। সুতরাং পুকুরে পাউডার প্রয়োগের পূর্বেই ৫ নিযুতাংশ হারে মোট কী পরিমাণ পাউডারের প্রয়োজন তা বের করে নিতে হবে। অথবা নিচে বর্ণিত ছক অনুযায়ী বিচিং পাউডার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	পাউডারের পরিমাণ
১	৩০ সে.মি (১ ফুট)	৯০০ গ্রাম
১০	৩০ সে.মি (১ ফুট)	৯ কেজি
৩৩	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	১৫০ কেজি
৫০	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	২৫০ কেজি

চুন প্রয়োগ

পুকুরে পেস্টিসাইড ব্যবহারের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে মাটিতে চুন প্রয়োগ করা। মাটির উর্বরতা শক্তির ওপর চিংড়ির ফলন নির্ভরশীল বিধায় মাটির শোধন ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করা দরকার। মাটিতে চুন প্রয়োগের উপকারিতা নিম্নরূপঃ

(১) চুন মাটির অম্লত্বকে কমিয়ে আনে ফলে মাটির ক্ষারীয় গুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মাটির পিএইচ বৃদ্ধি পায়

(২) চুন বাফার দ্রবণ হিসেবে মাটি বা পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে

(৩) চুন প্রয়োগের ফলে মাটিতে বিদ্যমান ক্ষতিকর জীবসহ পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া এবং তাদের মাধ্যমিক পোষক মারা যায়।

(৪) মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে মাটি থেকে পুষ্টিকারক উপাদানের নিঃসরণ ত্বরান্বিত হয়। ফলে মাটির প্রকৃতি উন্নত হয় এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৫) চুন প্রয়োগের ফলে মাটির ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের বিষাক্ততা দূরীভূত হয় এবং পানিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে জলজ পরিবেশ থেকে জটিল যৌগসমূহ গ্রহণাপেযোগী হয়ে ওঠে।

(৬) চুন প্রয়োগে পানির ঘোলাত্ব দূর হয়। ফলে পুকুরে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

(৭) পুকুরে চিংড়ির চাষের অন্তরায় তন্তুময় শেওলা চুন প্রয়োগ করে দমন করা যায়

(৮) চুন থেকে প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম ও কার্বনেট চিংড়ির খোলস তৈরির একটি অন্যতম উপাদান। ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় চিংড়ির খোলস বদল হয় না বা বদল বিলম্বিত হয়। এমনকি খোলস বদল হলেও তা শক্ত হতে দেরি হয়। ফলে চিংড়ির দেহ দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে। এর ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

(৯)চুন পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সালোকসংশেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করতে পারে।

(১০) চুনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম পুকুরে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চুনের প্রকারভেদ

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়। এর সবগুলোই ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের স্থানীয় বাজারে যেসব চুন পাওয়া যায় তাদের নাম নিচে দেয়া হলোঃ

(১) পাথুরে চুন ($CaCO_3$)

(২) কলি চুন $\{Ca(OH)_2\}$

(৩) পোড়া চুন (CaO)

(৪) ডলোমাইট $\{CaMg(CO_3)_2\}$

(৫) জিপসাম $\{CaSO_4, 2H_2O\}$

পচা কাদাযুক্ত পুকুরে ডলোমাইট জাতীয় চুন ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল। কারণ পচা কাদাযুক্ত পুকুরে এই চুনের কার্যকারিতা সবেচেয়ে বেশি। তবে এই চুন আমাদের দেশের স্থানীয় বাজারে এখনও সহজ প্রাপ্য নয়।

২০২২

চুন প্রয়োগের মাত্রা

মাটির পিএইচ এর ওপর নির্ভর করে চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। মাটির এই পিএইচ নির্ভর করে মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ, খনিজ ধাতব যেমন লৌহের উপস্থিতির ওপর। জৈব পদার্থ ও লৌহের পরিমাণ বেশি হলে মাটির পিএইচ মান কম হয়। মাটির পিএইচ মান ৪ এর কম হলে সেখানে চিংড়ি বা মাছ চাষের উপযোগী করে তালো সম্ভব নয়। আবার মাটির পিএইচ এর মান ৭.০ এর বেশি হলে সেখানে চুন প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। এরূপ মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মাছ চাষের সাধারণ মাত্রার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা উচিত। এর ফলে জলীয় পরিবেশ সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত হয় এবং মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরে আসে। যেসব পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি সেখানে বেশি পরিমাণে চুন প্রয়োগ করা দরকার। গলদা চিংড়ি চাষে জৈব সার খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় বলে পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সারকে ক্রিয়াশীল করার জন্য বেশি পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এ কারণে থাইল্যান্ডে চিংড়ির পুকুরে যখনই পানি শুকিয়ে ফেলা হয় তখনই হেক্টর প্রতি এক টন কৃষি চুন প্রয়োগ করা হয়। চিংড়ি চাষ কালে পানির পিএইচ ৭.৫ এর নিচে নেমে আসলে অথবা ২৪ ঘন্টার মধ্যে পিএইচ এর তারতম্য ০.৫ এর বেশি হলে পানিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (ডলোমাইট) জাতীয় চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবর্তনের পরপরই চুন প্রয়োগ করতে হবে। মূলকথা প্রতিবার পুকুরের পানি পরিবর্তন অথবা অতিবৃষ্টির পরপরই পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। গলদা চাষের পুকুর প্রস্তুতির সময় নিচের ছক অনুযায়ী পুকুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পিএইচ	ক্যালসিয়াম কার্বনেট চুন প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)									
পানিতে / মাটিতে	৭.৯	৭.৮	৭.৭	৭.৬	৭.৫	৭.৪	৭.৩	৭.২	৭.১	৭.০
৫.৭	১২১	২৪২	৩৬৩	৪৮৪	৬০৫	৭২৬	৮৪৭	৯৬৮	১০৮৯	১২১০
৫.৬	১৬৮	৩৩৬	৫০৪	৬৭২	৮৪০	১০০৮	১১৭৬	১৩৪৪	১৫১২	১৬৮০
৫.৫	২৬৯	৫৩৮	৮০৬	১০৭৫	১৩৪৪	১৬১৩	১৮৮১	২১৫০	২৪১৯	১৬৮৮
৫.৪	৩৮৬	৭৭৩	১১৫৯	১৫৪৬	১৯৩২	২৩১৮	২৭০৫	৩০৯১	৩৪৭৮	৩৮৬৪
৫.৩	৪৫৪	৯০৭	১৩৬১	১৮১৪	২০৬৮	২৭২২	৩১৭৫	৩৬২৯	৪০৮২	৪৫৩৬
৫.২	৫২১	১০৪২	১৫৬২	২০৮৩	২২৬৪	৩১২৫	৩৬৪৫	৪১৬৬	৪৬৮৭	৫২০৮
৫.১	৫৮৮	১১৭৬	১৭৬৪	২৩৫৩	২৯৪০	৩৫২৮	৪১১৬	৪৭০৪	৫২৯২	৫৮৮০
৫.০	৬৭২	১৩৪৪	২০১৬	২৬৮৮	৩৩৬০	৪০৩২	৪৭০৪	৫৩৭৬	৬০৪৮	৬৭২০

২০২২

গোবর পুকুরের চারকোণে অথবা পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি বাঁশের খাঁচায় আংশিক ডুবন্ত অবস্থায় রেখে দিলে ঢেউয়ের সাথে সাথে গোবর ধীরে ধীরে গলে পানিতে মিশে যায়। বিভিন্ন প্রকার অণুজীবের সাহায্যে পচন ক্রিয়ায় গোবরের নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রভৃতি পুষ্টিকারক উপাদান পানিতে মুক্ত হয়। পরবর্তী-তে এই পুষ্টিকারক উপাদানসমূহ পুকুরে উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত খাদ্যকণা উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে যা চিংড়ি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বেশি পরিমাণ গোবর পুকুরে একসাথে প্রয়োগ করলে পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায় যা চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর।

হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা

হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা জৈব সার হিসেবে চিংড়ির পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এই সারে পুষ্টিকারক উপাদান নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এ জাতীয় সার পুকুরে প্রয়োগ করলে অল্প সময়কালের মধ্যেই উদ্ভিদজাত কণার সৃষ্টি হয় এবং এই সার প্রয়োগে পানি দূষণের সম্ভাবনাও কম থাকে। তাছাড়া এই সার প্রয়োগের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এর কার্যকারিতা শুরু হয়।

কম্পোস্ট সার

মাটির গর্তে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতির সাথে কচুরিপানা, কলমিলতা, ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ নানা প্রকারের লতাপাতা রেখে দিলে পচন ক্রিয়ার ফলে যে মিশ্র সার তৈরি হয় তাকে কম্পোস্ট সার বলে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম্পোস্ট সার হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন আছে। মাছ চাষেও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার করা যায়। তবে একসাথে বেশি পরিমাণ সার পুকুরে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। কারণ এতে অক্সিজেন ঘাটতির আশংকা থাকে। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় পুকুরেও সবুজ সার ব্যবহার করা যায়। পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে চাষ দিতে হবে। তারপর ধনচে, দূর্বা, কলমিলতা প্রভৃতি পুকুরের তলদেশে রোপণ করে চাষ করা হয়। বর্ষার পানিতে পুকুর ভরে গেলে এসব উদ্ভিদ পচে মাছ চাষের জন্য উত্তম সার তৈরি হয়। এই সবুজ সার প্রয়োগে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় যা চিংড়ি ও মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

খৈলজাতীয় সার

সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিসির খৈল, তিলের খৈল প্রভৃতি বীজদানার খৈল পুকুরে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত সরিষার খৈল জৈব সার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরিষার খৈলে সাধারণত ৪.৭% নাইট্রোজেন, ২.৫% ফসফরাস ও ১.০% পটাশিয়াম থাকে। সরিষার খৈল কমপক্ষে এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে অতঃপর পুকুরে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এই ভিজানো খৈল সারের সাথে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। এই সার প্রয়োগের কয়েক দিনের মধ্যেই পুকুরে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরিষার খৈল চিংড়ির পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(২) অজৈব সার

কলকারখানার কৃত্রিম উপায়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যথা- ইউরিয়া, টিএসপি এমপি ইত্যাদি। রাসায়নিক সারের মূল পুষ্টিকারক উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম। এই রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পুকুরে নানা ধরনের উদ্ভিদ কণা বা ফাইটোপ্লাংকটন জন্মায় ও পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের মধ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য নাইট্রোজেনঘটিত সারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগেই ভালো ফল পাওয়া যায়। এই সার পুকুরে প্রয়োগ করলে চিংড়ির খাদ্য উদ্ভিদ জাত সবুজ প্ল্যাংকটন প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

ফসফেটঘটিত সার

ফসফরাসঘটিত সার বাজারে সিঙ্গেল সুপার ফসফেট (এসএসপি) , ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি), রক ফসফেট প্রভৃতি হিসেবে পাওয়া যায়। এই সার অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে পুকুরে ফসফেটের ঘাটতি দূর হয় ও পুকুরের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সার দেখতে ছাই রঙের এবং পানিতে দ্রবীভূত হতে একটু সময় লাগে। এজন্য ফসফেট জাতীয় সার পানিতে গুলে নিয়ে তারপরে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। এতে সারের কার্যকারিতা দ্রুত শুরু হয়। ট্রিপল সুপার ফসফেট সারে প্রায় শতকরা ৪৪-৫৪ ভাগ ফসফরাস থাকে।

পটাশঘটিত সার

পটাশঘটিত সার হিসেবে পটাসিয়াম অক্সাইড, পটাসিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি বাজারে পাওয়া যায়। এসব সারের মধ্যে পটাসিয়াম অক্সাইড বা মিউরেট অব পটাশ (এমপি) সার পুকুর প্রস্তুতকালে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এই সার দেখতে দানাদার লাল রঙের। মিউরেট অব পটাশ সারে প্রায় শতকরা ৩৮-৮২ ভাগ K_2O থাকে। এই সার সহজেই পানিতে দ্রবণীয়। পটাশঘটিত সার অল্প বা বেশি পরিমাণ ব্যবহারে মাটির পিএইচ এর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না।

অন্যান্য রাসায়নিক সার

ম্যাগনেসিয়ামঘটিত সারও অনেক সময় পুকুরে ব্যবহার করা হয়। মাটিতে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে এই সার প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান যেমন-জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, লোহা, বোরন, মলিবডেনাম, আয়োডিন প্রভৃতি মাটিতে খুব অল্প মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। এসব রাসায়নিক উপাদানকে ট্রেস উপাদান বলা হয়। এদের যে কোনো একটির অভাব দেখা দিলে মাটি তথা পুকুরের উর্বরতা শক্তি কমে যায়। পুকুরে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনে এসব ট্রেস উপাদান এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুকুরে সারের উৎস

সাধারণত একটি পুকুর বা জলাশয়ে নিম্নে বর্ণিত উৎস থেকে সার আসতে পারে:

- পুকুর বা জলাশয়ের পানিধারণকারী মাটি থেকে
- পুকুর বা জলাশয়ে গড়িয়ে আসা প্রবাহমান পানি থেকে
- গৃহপালিত জীবজনতুর মলমূত্র ব্যবহারের ফলে
- পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত বর্জ্য পদার্থ থেকে
- মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পুকুরের পানিতে ধোয়ার ফলে
- পানিতে পড়ে থাকা গুল্ম, লতাপাতা ইত্যাদি পচনের ফলে।

২০২২

সার নির্বাচন

অন্যান্য প্রাণীর মতো চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্যও পুষ্টিকারক উপাদানের বিশেষ প্রয়াজন। চিংড়ির খোলস তৈরি ও পেশীকলার বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকারক উপাদানের দরকার। চিংড়ির পেশীকলা গঠনের জন্য প্রধান পুষ্টিকারক উপাদান হচ্ছে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম। এজন্য চিংড়ি খামারে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক উপাদান সরবরাহের জন্য উপযুক্ত সার নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে বিভিন্ন প্রকার সারের পুষ্টিকারক উপাদানের তালিকা দেয়া হলো:

সার	নাট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাসিয়াম (%)
ইউরিয়া	৪৬	-	-
টিএসপি	০	৪৪-৫৪	০
অ্যামোনিয়া সালফেট	২০-২১	০	০
গোবর	০.৭	১.৩	০.৫
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	১.২	১.৩	.০৬

চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি নিয়মিত খোলস পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। চিংড়ির খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকারক উপাদান থাকলে খোলস পরিবর্তন নিয়মিত হয় এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। খোলস পবির্তনের সময় চিংড়ির দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ যেমন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস চলে যায়। আবার নতুন খোলস তৈরির জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এসব দিক বিবেচনা করে গলদা চিংড়ির পুকুরে গোবর, ইউরিয়া ও টিএসপি সার ব্যবহার করাই ভালো। এছাড়া পুকুর প্রস্তুতকালে পরিমিত পরিমাণে চুন প্রয়োগ করলে পরবর্তী সময়ে সাধারণত ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয় না।

সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ

পানিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রেখে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে পানিতে ০.৯৫ পিপিএম নাইট্রোজেন ও ০.১১ পিপিএম ফরফরাস থাকলে ভালো হয়। সার প্রয়োগের মূলনীতি হচ্ছে পুকুরে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য প্যাঙ্কটন (ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন) উৎপাদন করা। সুতরাং ফাইটোপ্ল্যাংকটন বৃদ্ধির জন্য পানি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

নিচের সূত্রের সাহায্যে ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

$$\text{ইউরিয়া} = \frac{\text{পুকুরের পানির আয়তন (ঘন মি.)} \times (\text{০.৯৫ পিপিএম পানিতে বিদ্যমান পিপিএম নাইট্রোজেন}) \times \text{১০০}}{\text{কেজি সারে নাইট্রোজেনের মাত্রা (\%)} \times \text{১০০০}}$$

$$\text{টিএসপি} = \frac{\text{পুকুরের পানির আয়তন (ঘন মি.)} \times (\text{০.১১ পিপিএম - পানিতে বিদ্যমান পিপিএম ফসফরাস}) \times \text{১০০}}{\text{কেজি সারে ফসফরাসের মাত্রা (\%)} \times \text{১০০০}}$$

উদাহরণ: যদি ৮০ সেমি গভীরতা বিশিষ্ট ১.০ হেক্টর আয়তনের একটি পুকুরের পানি পরীক্ষা করে দেখা যায় নাইট্রোজেন ০.৬০ পিপিএম এবং ফসফরাস ০.০৭ পিপিএম আছে, তবে ঐ পুকুরে কি পরিমাণ ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে?

২০২২

ধরা যাক, বাজারে প্রাপ্ত ইউরিয়া সারে ৪৬.০০% নাইট্রোজেন এবং টিএসপি সারে ৪৪.০০% ফসফরাস আছে।

পুকুরটির আয়তন = ১ হেক্টর × ৮০ সে মি

= ১০,০০০ বর্গমিটার × ০.৮০ মিটার

= ৮০০০ ঘন মিটার

পুকুরে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন = ০.৯৫ - ০.৬৫ = ০.৩০ পিপিএম

পুকুরে ফসফরাসের প্রয়োজন = ০.১১ - ০.০৭ = ০.০৪ পিপিএম

অতএব, উক্ত পুকুরে ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগের পরিমাণ হবে ?

$$\text{ইউরিয়া} = \frac{৮০০০ \times ০.৩০ \times ১০০}{৪৬ \times ১০০০} \text{ কেজি} = ৫.২১ \text{ কেজি}$$

$$\text{টিএসপি} = \frac{৮০০০ \times ০.০৪ \times ১০০}{৪৪ \times ১০০০} \text{ কেজি} = ০.৭৩ \text{ কেজি}$$

সেকি ডিস্কের ব্যবহার

আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে উপগ্রাহকে দিয়ে সূক্ষভাবে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সেকি ডিস্কের সাহায্যে পানিতে বিদ্যমান প্লাঙ্কটনের ঘনত্ব নির্ণয় করে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। পুকুরের পানির প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের জন্য সিকি ডিস্ক খুবই কাজে সেকি ডিস্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত লোহা বা ভারী টিনের তৈরি গোলাকার চাকতিকে সেকি ডিস্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই চাকতির উপরি পৃষ্ঠকে চারটি সমান ভাগে ভাগ করে এই অংশগুলোকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাদা ও কালো রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর এর কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দুতে সুতা বা একটি শক্ত কাঠের দণ্ড স্থাপন করা হয়। এই সুতা বা কাঠিকে স্কেল দ্বারা মেপে সেন্টিমিটারে দাগাঙ্কিত করা হয়। এই সুতা বা কাঠির ২৫ সেমি ও ৪০ সেমি দূরত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে অতি সহজেই একটি সেকি ডিস্ক তৈরি করা যায়। সেকি ডিস্ক ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেকি ডিস্ক দ্বারা পানির স্বচ্ছতা নির্ণয় করে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সাধারণত সার প্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতার কারণে পানির রঙের পরিবর্তন ঘটে। পানির সবুজাভ বা নীলাভ সবুজ বা বাদামি প্রভৃতি রং দ্বারা পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য কারণে পানি ঘোলা বা অস্বচ্ছ হলে সেখানে সেকি ডিস্ক ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। প্রথমে সেকি ডিস্ককে পানিতে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে আবার কিছুটা উঠা নামা করে।

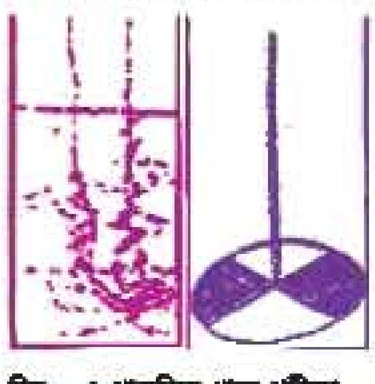

চিত্র: ৩৫ প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সেক্কি ডিস্কের প্রতি ভালভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেক্কি ডিস্ক এভাবে ওঠা-নামা করতে করতে যখন সেক্কি ডিস্কের সাদা ও কালো রং অস্পষ্ট দেখা যাবে তখন পানির উপরিতল থেকে সুতা বা কাঠির যে পরিমাপ পাওয়া যাবে তাকেই সেক্কি ডিস্ক পাঠ বলা হয়। সেক্কি ডিস্ক পাঠ ২৫ সেমি হতে ৪০ সেমি এর মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে পানির প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। সেক্কি ডিস্ক পাঠ ৩০ সেমি বা এর কাছাকাছি থাকলে সবচেয়ে ভালো। এই অবস্থায় পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য থাকে ফলে আর সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। সেক্কি ডিস্ক পাঠ ২৫ সেমি বা তার কম হলে বুঝতে হবে পুকুরে অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান যা যে কোনো মুহূর্তে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে এবং পুকুরের কিছু পানি পরিবর্তন করা ভালো। যদি সেক্কি ডিস্ক পাঠ ৪০ সেমি বা তার বেশি হয় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে নিচের তালিকা অনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় সার প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

সার	পানির গভীরতা	কেজি/হেক্টর	কেজি/একর	গ্রাম/শতক	গ্রাম/বর্গমিটার
ইউরিয়া	১.০ মি	২০.০০	৮.০০	৮০.০০	২.০০
টিএসপি	১.০ মি	৪০.০০	১৬.০০	১৬০.০০	৪.০০
গোবর সার	১.০ মি	১০০.০০	৪০০.০০	৪.০০	১০০.০০

প্রাণী প্যাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য পুকুরে জৈব সার যেমন গোবর সার প্রয়োগ করা যায়। পুকুরে সাধারণত ১৫ দিন পরপর ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও প্রাণী প্যাংকটনের পর্যায়ক্রমিক প্রাচুর্যতা দেখা যায়। এজন্য ১৫ দিনের ব্যবধানে জৈব ও অজৈব সার পর্যায়ক্রমে পুকুরে প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব হয় না।

সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের এক সপ্তাহ পর শতাংশ প্রতি ২-৫ কেজি জৈব সার, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ গ্রাম পটাশ সার পুকুর প্রস্তুতির সময় সরাসরি পুকুরের তলদেশে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। পানিতে সার প্রয়োগ করার সময় টিএসপি সার পানিতে এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। টিএসপি সার পানিতে ভালোভাবে গুলে তার সাথে ইউরিয়া সার মেশাতে হবে। এরপর মিশ্রিত সারের দ্রবণ পুকুরের পানিতে উত্তমরূপে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগে সতর্কতা

- রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে
- পানির গভীরতার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
- দানাদার অবস্থায় সার পানিতে প্রয়োগ করা উচিত নয়
- সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য নিয়মিত সেক্কি ডিস্ক ব্যবহার করতে হবে
- মাত্রার অতিরিক্ত সার ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট হবে এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়

পানি সংগ্রহ

সার প্রয়োগের পরপরই পুকুরে ৫-১০ সেমি পানি ঢুকাতে হবে। এর ফলে ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ বের হয়ে যাবে। সার পচানোর পর পানির গভীরতা বাড়িয়ে ৪০-৫০ সেমি করে ১ সপ্তাহ রাখতে হবে। এরপর সেক্কি ডিস্ক ব্যবহার করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা পরীক্ষা করতে হবে। যদি প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে তবে পুনরায় ইউরিয়া ও টিএসপি সার পানিতে গুলে পুকুরের পানিতে সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের ৪/৫ দিন পর পানির রং সবুজাভ হলে বুঝতে হবে পুকুর পোনা মজুদের উপযোগী হয়েছে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. পুকুর প্রস্তুতকালে সূর্যালোকে তলদেশে কতটুকু গভীর ফাটল সৃষ্টি করা উচিত ?
২. গলদা চিংড়ির পুকুরে সাধারণত কয় ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় ?
৩. ক্লাডোফোরা কোন ধরনের উদ্ভিদ ?
৪. কচুরিপানা ও ক্ষুদিপানা কোন ধরনের উদ্ভিদ ?
৫. কলমিলতা কোন ধরনের উদ্ভিদ ?
৬. আগাছা দমনের পদ্ধতি কয়টি ?
৭. সার প্রয়োগ করে কোন ধরনের উদ্ভিদ দমন করা যায়?
৮. রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুইটি রাসায়নিক পদার্থের নাম লিখ ।
৯. অজৈব পেস্টিসাইড ফসটক্সিন-এর বিষক্রিয়া কয়দিন স্থায়ী হয় ?
১০. বিচিং পাউডারে কত ভাগ ক্লোরিন থাকে ?
১১. চুন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন ধরনের শেওলা দমন করা যায়?
১২. সরিষার খৈলে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে?
১৩. পুকুরের পানির প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা নির্ণয়ের জন্য চিংড়ি চাষিরা কি ব্যবহার করে থাকে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. পুকুরে যে কয় শ্রেণির জলজ আগাছা জন্মায় তাদের নাম লিখ ।
২. নিগর্মনশীল উদ্ভিদ ও নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ এর মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. জলজ উদ্ভিদ দমনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।
৪. পুকুরের তলদেশে শুকানারে উপকারিতাগুলো লেখ ।
৫. ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লেখ ।
৬. টিএসপি সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লেখ ।
৭. মাছ চাষে সেক্কি ডিক মাত্রা কত হওয়া সমীচীন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুকুরে জলজ উদ্ভিদের ক্ষতিকর দিকসমূহ বর্ণনা কর ।
২. সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা কর ।
৩. পুকুরে সারের উৎসগুলো বর্ণনা কর ।
৪. সেক্কি ডিক ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

পঞ্চম অধ্যায়

পুকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদ

লাভজনক চিংড়ি চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে পুকুরে সুস্থ ও সবল পোনা মজুদ করা। সুতরাং গলদার ভাল উৎপাদন পেতে হলে পোনা মজুদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা প্রয়োজন। গলদা চিংড়ির পোনা মজুদের ক্ষেত্রে পোনা শনাক্তকরণ, পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন পদ্ধতি, মজুদ হার নির্ধারণ ও মজুদ করার নিয়ম সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত।

পোনা শনাক্তকরণ

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত গলদার পোনা অন্যান্য চিংড়ির পোনা থেকে পৃথক করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ছোট অবস্থায় গলদা চিংড়ির পোনা আতস কাচের সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। রোস্ট্রামের উপরের দিকে ১২-২৫টি এবং নিচের দিকে ৮-১৪ টি খাঁজ থাকে। মাথার ক্যারাপেস অঞ্চলের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি দাগ থাকে। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা চিংড়ির পোনা চেনার আরেকটি উপায় হচ্ছে-গলদা চিংড়ির রেণু স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে থাকে এবং কখনও কখনও চিৎ হয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। এই রেণু পোনার পিঠে কালো দাগ থাকে।

সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায়

- সুস্থ ও সবল পোস্ট-লার্ভার রং সাধারণত হালকা বাদামি বা স্বচ্ছ হয়ে থাকে। তবে দুর্বল ও পীড়িত পোনার রং লালচে বা নীল বর্ণের হয়ে থাকে।
- সুস্থ ও সবল পোনা সক্রিয়ভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এসব পোনা পাত্রের ছায়াযুক্ত স্থান ও টেপের পানির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। রোগাক্রান্ত পোনা পাত্রের মধ্যে সাধারণত সক্রিয় থাকে না এবং পাত্রের মাঝখানে জমাট বেঁধে থাকে।
- একটি প্লাস্টিক গামলা বা অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের পানিসহ পোনা রেখে হাত দিয়ে পাত্রের পানিতে ঘূর্ণন সৃষ্টি করলে যদি পোনা পাত্রের মাঝখানে জমা হয় তবে বুঝতে হবে পাত্রস্থিত পোনা দুর্বল।
- পোনা রাখা পাত্রের গায়ে টোকা দিলে সবল পোনা খুব দ্রুত সরে পড়ে এবং অনেক সময় লাফ দিয়ে পাত্রের বাইরে পড়ে যায়।
- সুস্থ ও সবল পোনা নিয়মিতভাবে খোলস পাল্টায় ফলে এদের গাত্রবর্ণ বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখায়। সবল পোনার পেটে খাদ্য দৃশ্যমান হয়। দুর্বল পোনা নোংরা থাকে এবং মাঝে মধ্যে কালো দেখা যায়।

পোনার উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীতে বিশেষ করে মোহনার সাথে সংযুক্ত নদীর নিচু বা খাড়ি অঞ্চলে বিশেষ করে জোয়ার ভাটার প্রভাব থাকে এরপ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গলদা চিংডির পোনা পাওয়া যায়। এসব নদীতে এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চট্টগ্রাম থেকে সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন নদীতে বিশেষ করে যে সব নদীতে জোয়ার ভাটার প্রভাব আছে সেসব নদীতে প্রচুর চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। উপকূলীয় জেলা ছাড়াও চাঁদপুর, ফরিদপুর, যশারে, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উৎসের পাশাপাশি হ্যাচারিতেও গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির পোনার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৪০টি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনার সাথে মিঠা পানির অন্যান্য চিংড়ির পোনা মিশ্রিত থাকে এবং এরা দেখতে প্রায় একই রকমের। তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদার যে পোনা পাওয়া যায় তা আকারে বেশ বড় এবং সহজেই এদের শনাক্ত করা যায়। প্রজনন মৌসুমে নদীর মোহনায় অল্প লবণাক্ত পানিতে গলদা চিংড়ি সাধারণত অভিপ্রয়াণ (Migration) করে এবং পোস্ট লার্ভা পর্যায়ে পৌঁছানোর পর পুনরায় মিঠা পানিতে ফিরে আসে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ও জাল দিয়ে গলদা চিংড়ির অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পোনা সংগ্রহ করা হয়।

গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন

প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি থেকে সংগৃহীত পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে মজুদ করা উচিত নয়। চিংড়ির পোনা সরাসরি উৎপাদন পুকুরে মজুদ করলে পোনার মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যায় এবং সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এজন্য নার্সারিতে গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন করে কিশোর চিংড়ির বা বড় পোনা পুকুরে মজুদ করলে চিংড়ির সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

পোনা প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা

চিংড়ি পোনা সাধারণত পরিবেশের সামান্য তারতম্যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবহনজনিত পীড়নের ফলে চিংড়ি পোনা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শ্বাসকষ্টে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব অসুস্থ দুর্বল পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে ছাড়া হলে সাধারণত অধিকাংশ পোনা মারা যায়। মজুদ পুকুরে চিংড়ির উৎপাদন নিশ্চিত করতে নার্সারিতে পানা প্রতিপালনের উপকারিতা নিম্নরূপঃ

- নতুন পরিবেশের সাথে পোনা সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- পোনার মৃত্যুর হার কমানো যায়।
- পরিবেশের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পীড়ন বা শ্বাসকষ্ট রোধ করা যায়
- অল্প সময়ে পোনাকে সবল ও বড় করা যায়।
- ক্ষতিকর ও রাক্ষুসে প্রাণীর আক্রমণ থেকে পোনাকে রক্ষা করা যায়।
- অন্যান্য ছোট প্রজাতির চিংড়ি থেকে গলদা চিংড়ির পোনা সহজেই বাছাই করা যায়।
- পোনার বেঁচে থাকার হার সহজেই অনুমান করা যায়
- মজুদ পুকুরের উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়

নার্সারি পুকুর

খামারের মোট আয়তনের সাধারণত ১০-১৫% এলাকায় নার্সারি পুকুর করা উচিত। সাধারণত মজুদ পুকুরের মধ্যে বাঁধ দিয়ে অথবা ঘন জালের বেড়া দিয়ে ছোট আকারের নার্সারি পুকুর তৈরি করা যায়। এছাড়া মজুদ পুকুরের পাশেও পোনার চাহিদা অনুযায়ী নার্সারি পুকুর তৈরি করা যেতে পারে। নার্সারি পুকুর অপেক্ষাকৃত ছোট হলে ভালো হয়। নার্সারি পুকুরের আয়তন ২-৩ বিঘা হলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি, এঁটেল দোআঁশ কিংবা বেলে দো-আঁশ মাটি নার্সারি পুকুর নির্মাণের জন্য সবচেয়ে ভালো। অ্যাসিড সালফেট যুক্ত কিংবা বেলেযুক্ত মাটি নার্সারি পুকুর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। পাড়ের উচ্চতা বন্যামুক্ত হতে হবে এবং পাড়ের ঢাল ১ অথবা ৩৪১ এর মধ্যে রাখতে হবে। পুকুরের গভীরতা চাষ উপযোগী হতে হবে। পুকুরের গভীরতা বর্ষাকালে ৯০-১০০ সেমি এবং শুকনো মৌসুমে ৭০-৮০ সেমি হলে ভালো হয়। পুকুরের তলদেশ সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সমস্ত চিংড়ি আহরণ করা ছাড়াও পুকুর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।

২০২২

নার্সারি পুকুরের পানির গুণাবলি

পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিংড়ির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। চিংড়ি সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্ল্যাংকটন, ছোট পোকা-মাকড় ও পচা জৈব পদার্থ খেয়ে বড় হয়। এ সব অণুজীব ও ছোট প্রাণী পানিতে একটি বিশেষ পরিবেশে জন্মায়। এই উপযুক্ত পরিবেশের জন্য পানিতে নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

পানির গুণাগুণ		মাত্রা
পানির গভীরতা	--	৭০-৯০ সেমি
তাপমাত্রা	--	২৫-৩০° সেমি
অক্সিজেন	--	৫.০-৮.৫ পিপিএম
পিএইচ	--	৭.৫-৮.৫
পানির স্বচ্ছতা	--	২৫-৩৫ সেমি

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির নিয়মাবলি

পুকুরের পরিবেশের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পুকুর প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পুকুর প্রস্তুতির ওপর চিংড়ি উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর প্রস্তুত করা একান্তভাবে দরকার। পুকুর প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

- সমস্ত জলজ আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করতে হবে।
- পুকুরের পুরাতন পানি নিষ্কাশন করে পুকুরের তলদেশ ৬-৭ দিন রোদে শুকাতে হবে।
- পুকুরের পাড় ভালোভাবে মেরামত করতে হবে এবং পাড়ে কোনো গর্ত থাকলে তা ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে
- পুকুরের তলদেশে হালকা চাষ দিতে হবে।
- চাষ দেওয়ার পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগে উপকারিতা নিম্নরূপ:
    - পানি দূষণমুক্ত করে;
    - মাটির অম্লতা দূর করে।
    - সালফাইড ও অন্যান্য অ্যাসিডের ক্রিয়া প্রশমিত করে;
    - রোগজীবাণু দমনে সহায়তা করে; এবং
    - নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
- চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি শতাংশে ৮-১০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করতে হবে।
- গোবর প্রয়োগের পর ১০ সেমি পানি ঢুকাতে হবে এবং এর পর ৫-৭ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
- অতঃপর ২০-২৫ সেমি পর্যন্ত পানি পুকুরে ঢুকিয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ:

ইউরিয়া	--	১০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে
টিএসপি	--	১০০ গ্রাম প্রতি শতাংশে
পটাশ	--	৫০ গ্রাম প্রতি শতাংশে

পুকুরে চিংড়ির পোনার আবাসস্থলের উন্নয়ন করতে হবে। আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষে পুকুরের তলায় বাঁশের কঞ্চি বা ডাল কাত করে পুঁতে দিতে হবে। চিংড়ির পোনা ছোট অবস্থায় ডালপালার সাথে আকড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া গাছের ডালপালা খাদ্য যোগাতে সহায়তা করে থাকে।

- সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর নির্ধারিত হারে পোনা মজুদ করতে হবে।
- নার্সারি পুকুরে ৭০-৯০ সেমি পানি রাখতে হবে।

পোনা মজুদের হার

পুকুরে লাভজনক উৎপাদনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ ও সবল পোনা মজুদ। এই পোনা প্রাকৃতিক উৎস কিংবা হ্যাচারি থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনার সাথে অন্যান্য চিংড়ির পোনা মিশ্রিত থাকে বিধায় হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা মজুদ করাই উত্তম। হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা ১-১.৫ সেমি আকারের হয়ে থাকে। নার্সারি পুকুরে প্রতি শতাংশে ১৫০০-২০০০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। তবে ঝুঁকি এড়ানারে জন্য প্রতি শতাংশে ১০০০টি পোনা মজুদ করা ভাল। নার্সারি পুকুরে এই পোনা ২-৩ মাস প্রতিপালন করলে সাধারণত এরা ৪-৫ সেমি পর্যন্ত বড় হয়। এ সময় এদেরকে কিশোর চিংড়ি বা জুভেনাইল বলা হয়।

নার্সারি পুকুরে খাবার সরবরাহ

প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পোনা মজুদের প্রথম সপ্তাহে পুকুরে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই সম্পূরক খাবার চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তবে কোনোক্রমেই পুকুরে যাতে অতিরিক্ত খাবার সরাহ করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ অতিরিক্ত খাবারের পচনক্রিয়ার ফলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে এবং পীড়ন ও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে পোনা অতি অল্প সময়ে মারা যায়। চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, মাছের চূর্ণ, ছোট আকারের চিংড়ির শুটকি, ছোট প্রজাতির মাছ জীবের রক্ত, সরিষার খৈল, সয়াবিনের খৈল, ভিটামিন ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে চিংড়ির সম্পূরক খাবার তৈরি করা যায়। খাবার পিলেট, সেমাই অথবা মায়ো তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করলে খাবারের অপচয় কম হয় এবং খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফিডিং ট্রে বা অন্য যে কোনো পাত্রের মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্য প্রয়োগের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ হয়। চিংড়ি যদিও সর্বভুক প্রাণী তথাপি এরা প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে। চিংড়ির খাদ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থাকা আবশ্যক।

আমিষ	--	৩০-৪০ ভাগ
স্নেহ/চর্বি	--	৫-৭ ভাগ
শর্করা	--	৩০-৩৫ ভাগ
ভিটামিন/মিনারেলস	--	১-২ ভাগ

খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ

১ বিঘা বা ৩৩ শতাংশের একটি নার্সারি পুকুরে ৩৩০০০-৩৫০০০ পোনা (পিএল ১২-১৫) মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের ১ম সপ্তাহে নিম্নবর্ণিত হারে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

লালনকাল	প্রতিদিন
১ম সপ্তাহে	৪০০ গ্রাম
২য় সপ্তাহে	৮০০ গ্রাম
৩য় সপ্তাহে	১০০০ গ্রাম
৪র্থ সপ্তাহে	১৩০০ গ্রাম

পোনা মজুদের সময় সাধারণত প্রতিটি পোনার ওজন ০.২-০.৩ গ্রাম হয়ে থাকে। চতুর্থ সপ্তাহের পর প্রতিটি চিংড়ির ওজন ১.৫-২.০ গ্রাম হওয়া উচিত এবং ৩০ দিন বয়সের পোনার বেঁচে থাকার হার সাধারণত ৭০-৭৫%। পোনার এই বয়স থেকেই ট্রেতে খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। এক মাসের পোনার নমুনা সংগ্রহ করে মোট ওজনের শতকারা ৪-৫ ভাগ হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

মোট পোনার পরিমাণ বেঁচে থাকার হার ৭৫%)	--	২৪৭৫০ টি (প্রায়)
প্রতিটির গড় ওজন	--	১.৭৫ গ্রাম (প্রায়)
মোট পোনার ওজন	--	৪৫ কেজি (প্রায়)
পানার মোট ওজনের	--	৪-৫% হিসেবে প্রতিদিন
খাদ্যের প্রয়োজন	--	২.৫ কেজি

এভাবে সপ্তাহভিত্তিক খাবার সরবরাহের পরিমাণ নিম্নরূপ:

লালনকাল	প্রতিদিন
৫ম সপ্তাহে	২.৫ কেজি
৬ষ্ঠ সপ্তাহে	৩.৬০ কেজি
৭ম সপ্তাহে	৪.৮০ কেজি
৮র্ম সপ্তাহে	৬.০০ কেজি

এভাবে ১ বিঘার নার্সারি পুকুরে ৩৩-৩৫ হাজার পোনা ছেড়ে ৬০ দিন লালন করতে প্রায় ১৪০ কেজি সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন। এই দুই মাস প্রতিপালনের পর পোনা বিক্রয়যোগ্য হয় অথবা মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হয়। নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালনের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার।

- ক্ষতিকর ও রাক্ষুসে প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা
- পানির গভীরতা ঠিক রাখা
- নিয়মিতভাবে পানির গুণগতমান নিয়মিত পরীক্ষা করা
- নিয়মতিভাবে পোনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা
- পুকুরের পানি প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা
- বিভিন্ন প্রাণী কর্তৃক পুকুরের পাড়ে সৃষ্ট গর্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা
- গ্রীষ্মকালে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা
- পোনা যাতে চুরি না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখা

২০২২

ভালো মানের গলদা পোনা শনাক্তকরণ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে না। বেশি উৎপাদন, পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভালো মানসম্পন্ন সুস্থ-সবল পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পোনা ও পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং হ্যান্ডলিং। এদের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। যে কোনো কারণেই এদের গুণগতমান খারাপ হোক না কেন ঐ সমস্ত পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করা হলে চাষি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যথাযথ মানসম্পন্ন পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ না করা হলে

- মজুদের পর ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে
- বৃদ্ধির হার কম হয়
- সময়মত বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় বাজার মূল্য কম পাওয়া যেতে পারে

সে কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে তাদের যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভালো ও খারাপ পোনা ও জুভেনাইল শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো -

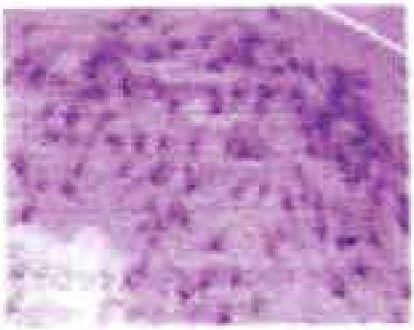

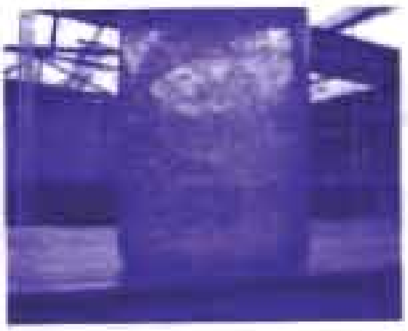

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভালো জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রঙের, খারাপ জুভেনাইল লালচে কালচে।
- ভালো জুভেনাইলের এন্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙা থাকে না।
- ভালো জুভেনাইলের খোলস পরিষ্কার কিন্তু খারাপ জুভেনাইলের খোলস কালচে ও শেওলাযুক্ত
- ভালো জুভেনাইলের খাদ্য থলি পরিপূর্ণ, খারাপ জুভেনাইলে খাদ্যথলি আংশিক পরিপূর্ণ বা খালি থাকে।

গলদা পোনা পরিবহন ও পোনা মজুদকরণ

বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির পোনা সরবরাহের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ করেই গলদা চিংড়ি পোনার চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা হয়। পোনা আহরণ স্থল থেকে পুকুরে মজুদ করা পর্যন্ত প্রায় ৫০% পোনা মারা যায় বলে অনুমান করা হয়। চিংড়ি পোনার পরিবহন পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে চললে পোনার মৃত্যুর হার বহুলাংশে কমানো সম্ভব। অনেক পোনা এক সাথে হ্যাচারি কিংবা প্রাকৃতিক উৎস থেকে দূর দূরান্তে পরিবহনের জন্য পোনার সুষ্ঠু প্যাকিং একান্ত প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে প্যাকিং করে পানির তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তাই পোনার প্যাকিং সঠিকভাবে করা না হলে অধিকাংশে পোনা পরিবহনকালে মারা যেতে পারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা পোনা পরিবহন

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে গলদা চিংড়ির পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনও অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহনকালে ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, এমন কি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে পোনা ও জুভেনাইল পরিবহনে অধিক সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

পোনা পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন ঘনত্ব মূলত নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহন দূরত্বের উপর। সাধারণভাবে ৩৬ ইঞ্চি×২০ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ির পোনার আকার ও দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহন ঘনত্ব।

পোনার আকার/ধরন	পরিবহন ঘনত্ব/লিটার	পরিবহন সময় (ঘণ্টা)	পরিবহন পদ্ধতি
পোস্ট লার্ভা-২০	৫০০-১০০০	১২-১৬ অক্সিজেনসহ	পলি ব্যাগ
পোস্ট লার্ভা-৩০-৩৫	৩৫০-৫০০	৬	-ঐ-
জুভেনাইল (৫-৭ সেমি)	১০-২০	৩-৬	-ঐ-

বাংলাদেশে সাধারণত দুভাবে পোনা পরিবহন করা যায় ?

১. আধুনিক পদ্ধতি (অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থাসহ)

২. সনাতন পদ্ধতি (অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়া)

১। **আধুনিক পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পোনা পরিবহন করা হয়। অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে লিটার প্রতি ৫০০টি হারে ছোট পোনা পরিবহন করা যায়। একটি ৬ × ৪০ সে. মিটার ব্যাগের ৬-৮ লিটার পানিতে অক্সিজেন দিয়ে ৩০০০-৪০০০ টি ১০-১৫ দিন বয়সের পোনা ১২ ঘণ্টার জন্য পরিবহন করা যায়।

২। **সনাতন পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে পোনা পরিবহন করা হয়। অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়া ৬ ঘণ্টার জন্য পলিথিন ব্যাগে নিম্নহারে পোনা পরিবহন করা যায়।

পোস্ট লার্ভার গড় দৈর্ঘ্য (সে:মি)	পোস্ট লার্ভার পরিমাণ (সংখ্যা)	পানির পরিমাণ লিটার
১০	৪০০০-৫০০০	১০
১৫	২০০০-২৫০০	১০
২০	১৫০০-২০০০	১০
২৫	৮০০-১২০০	১০

২০২২

পোনা প্যাকিং:

পোনা প্যাকিং-এ নিম্নলিখিত জিনিসপত্রাদির প্রয়োজন

- পলিথিন ব্যাগ
- রেগুলেটরসহ অক্সিজেন সিলিন্ডার
- পরিষ্কার মিঠা পানি

চিত্র: সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন

- ফের টুকরা
- থার্মোমিটার
- কাগজের কার্টুন অথবা কাঠের বা স্টীলের ইনসুলেটেড বক্স
- পোনা রাখার ডিশ বা গামলা
- রাবার ব্যান্ড ইত্যাদি

পোনা প্যাকিং পদ্ধতি

গলদা চিংড়ির পোনা অত্যন্ত কোমল, স্পর্শকাতর এবং খুব সহজেই পীড়িত হয়ে পড়ে বিধায় প্যাকিং-এর সময় এদেরকে খুব যত্ন সহকারে নাড়াচাড়া করতে হয়। নিচে পোনার প্যাকিং পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো।

- পোনা পরিবহনের কমপক্ষে ২ ঘণ্টা পূর্বে পোনাকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে। তবে দূরপাল্লা পরিবহনের ক্ষেত্রে আর্টিমিয়া নপ্লি জীবিত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এরপর পোনা একই লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট পরিষ্কার রাখতে হবে। পোনা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পানি গ্লাস উলের সাহায্যে পরিষ্কার পানিতে রাখতে হবে।
- ৫০ × ৯০ সেমি আকারের একটি পলিথিন ব্যাগ একই আকারের আরেকটি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগের নিচের দুই কোন রাবারের ব্যান্ড দিয়ে মুড়িয়ে বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে ব্যাগ ছিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পোনাও ব্যাগের কোণায় আটকে থাকার সম্ভাবনা থাকে না।
- পলিথিন ব্যাগের এক তৃতীয়াংশ ৮-১০ লিটার একই পরিবেশের পানি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এরপর পরিবহনের দূরত্ব ও পোনার আকার অনুযায়ী ১০০০-৫০০০ পোনা গণনা করে ব্যাগের মধ্যে রাখতে হবে। ব্যাগের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করে ব্যাগের মুখ ভালোভাবে মুড়িয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

- পরিবহনকালে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ২২° সে. এর কাছাকাছি রাখতে হবে। যদি পরিবহন সময় ৪ ঘন্টার কম হয়, তবে এক্ষেত্রে অক্সিজেনের প্রয়োজন নেই কিন্তু বরফ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ১০ লিটার পানিকে প্রতি ঘন্টার পরিবহন দূরত্বের জন্য ১০০ গ্রাম বরফ পলিথিন ব্যাগে করে পরিবহন পাত্রের ভিতর রাখতে হবে।
- পরিবহনের সময় ৪ ঘন্টার বেশি হলে বরফ ও অক্সিজেন উভয়ই ব্যবহার করতে হবে।
- ব্যাগের পানির তাপমাত্রা উঠানামা রোধকল্পে পোনা দুই পালাযুক্ত তাপ নিরোধক পাত্রে প্যাকিং করতে হবে। এটা নিম্নোক্ত যে কোনো একভাবে করা যেতে পারে:
  - ২ টি কার্ডবোর্ডের বাক্স একটির মধ্যে অন্যটি বসানো, মধ্যস্থলে ফেনা বা সংঘর্ষ নিরোধক বস্তু রাখতে
  - ২টি প্লাস্টিক ব্যাগ একসঙ্গে যুক্ত করে ভিতরে পোনা রাখতে হবে। ব্যাগের উপরিভাগ মুড়ে দুই প্রস্থ করে শক্তভাবে বাঁধতে হবে যেন এই ব্যাগ সম্পূর্ণরূপে বায়ু নিরোধক হয়।
  - পলিথিন ব্যাগগুলোর উপরিভাগ শক্তভাবে বেঁধে তা পরিবহন পাত্রে রাখতে হবে। তাপমাত্রা নিরোধক স্টাইরোফোম বাক্সে পোনা পরিবহন অধিক নিরাপদ।

পোনা পরিবহন পদ্ধতি

প্যাকিংসহ অথবা প্যাকিং ছাড়া পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কম দূরত্বে অথবা সময় কম লাগলে মুখ খোলা পাত্রে সীমিত পরিমাণ পোনা মাথায় বা গাড়িতে করে খামার পর্যন্ত পরিবহন করা যায়। পানিতে বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার জন্য পরিবহনকালে পাত্রটি ঝাঁকুনি দেয়া ভালো। গাড়ির চলার পথেও ঝাঁকুনিতে অক্সিজেন সমস্যাদ্রের কাজ হয়। তবে স্বল্প দূরত্বে পরিবহনকালেও পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেনসহ পরিবহন করা ভালো। এতে ঝুঁকি কম থাকে। কার্টুন অথবা ইনসুলেটেড বক্সে পরিবহনকালে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যায়। বাক্সের ভেতরে পলিথিন ব্যাগের পানি ঠাণ্ডা থাকে বলে পোনা কম পীড়িত হয়।

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির পোনা প্যাকিং কৌশল

পানির ট্যাংকে পোনা পরিবহন

এই পদ্ধতিতে একসাথে অনেক বেশি পোনা সহজে পরিবহন করা সম্ভব। পোনা পরিবহনের জন্য ফাইবার গ্লাস মেটারিয়ালের সাহায্যে হাইড্রোট্যাংক নির্মাণ করা যায়। ব্যাটারি চালিত অ্যারেটর বা প্রেসার ট্যাংক থেকে হাইড্রোট্যাংকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও স্থায়ী। পানির ট্যাংকের সাহায্যে চিংড়ি পরিবহনের পর্যায়গুলো নিম্নরূপ

- পরিবহন যানের উপর স্থাপিত ট্যাংক উত্তমরূপে ধৌত করতে হবে;
- স্বাদুপানি দিয়ে এই ট্যাংকের অর্ধেক পূর্ণ করতে হবে;
- ৬-৮ লিটার পানিসহ একটি সাদা পাত্রে ১৫-২০ দিন বয়সের ৫০০০ পোনা রাখতে হবে। একইভাবে অন্যান্য পাত্রেও এই একই পরিমাণ পানিতে সমপরিমাণ পোনা রাখতে হবে;
- ধীরে ধীরে পানিসহ পোনা ট্যাংকে রাখতে হবে। এতে পোনার পরিমাণ হবে প্রতি লিটারে ২০০-৩০০টি। ১ অর্থাৎ ২৫০ লিটার ক্যাপাসিটির ট্যাংকে ১২৫ লিটার পানিতে ২৫০০০-৩৭৫০০ পোনা থাকবে। সহজে ও নাড়াচাড়ার জন্য প্লাস্টিক বালতি ব্যবহার করা ভালো;
- ট্যাংকে একটি বহনযোগ্য ব্যাটারিচালিত অ্যারেটর (১২ ভোল্টে) স্থাপন করতে হবে।
- ট্যাংকটি ঢেকে দিতে হবে;
- এরপর পোনা পুকুরে/খামারে স্থানান্তর করতে হবে। পোনা পরিবহনের কাজ সকালে বা বিকালের দিকে করা ভালো, কারণ এ সময় তাপমাত্রা বেশ কম থাকে।

পুকুরে পোনা মজুদের হার

চিংড়ি খামারের মাটির উর্বরতা, পানির গুণাগুণ, সম্পূরক খাবার প্রয়োগ ও পানির ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে পুকুরে পোনা মজুদের হার নির্ধারণ করা হয়। চাষ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পোনা মজুদের হার নিচে বর্ণনা করা হলো।

চাষ পদ্ধতি	পোনা মজুদের হার
প্রচলিত চাষ পদ্ধতি	১০০০০-৩০০০০টি
উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতি	৪০০০০-৮০০০০টি
আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি	৯০০০০-১৫০০০০টি

পোনা মজুদ পদ্ধতি

দূর-দূরান্ত থেকে পরিবহনকৃত পোনা সরাসরি খামারে মজুদ করা উচিত নয়। পরিবহনকৃত পোনা সরাসরি মজুদ করলে পোনার ব্যাপক মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে। ফলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এজন্য খামারে পোনা মজুদ করার পূর্বে পরিবহনকৃত পোনা পুকুরের পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পরিবহনের পর স্টাইরোফোম বক্স থেকে পলিথিন ব্যাগে করে নিয়ে পুকুরের পানিতে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে যাতে পলিথিন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা আসে। পলিথিন ব্যাগ ৩০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে রাখার পর ব্যাগের মুখ খুলে থার্মোমিটার দিয়ে ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা মেপে নিতে হবে।

গলদা পোনা খাপ খাওয়ানো এবং অবমুক্তকরণ

পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর পিএল/জুভেনাইল ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করে নিলে এ মৃত্যুহার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা আনয়নই হচ্ছে অভ্যস্তকরণ। নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করে পুকুরে পোনা বা পিএল/জুভেনাইল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ

- পরিবহন পাত্র অন্তত ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খোলার পর আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে দুই পানির তাপমাত্রার সমতায় আনতে হবে
- হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন
  - দুই পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২ সে এর বেশি না হয় উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ, সবল পোনা স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে। লক্ষণীয় যে পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায় পোনা ছাড়তে হবে, কেন্দ্র বা পুকুরের মাঝখানে নয়।

চিত্রঃ গলদা পোনা শোধন, খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তকরণ

গলদা পোনা ছাড়ার সময়

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোনো সময়ে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়া যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়াই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষত নিম্নচাপের দিনে) পুকুর বা ঘেরে মাছের পোনা বা পিএল বা জুভেনাইল ছাড়া উচিত নয়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. গলদা চিংড়ি পোনার ক্যারাপেস অঞ্চলের খোলসে কয়টি কালচে দাগ থাকে?

২. সুস্থ ও সবল গলদা পোনার গাত্র বর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখায় কেন?

৩. খামারের আয়তনের মোট কত ভাগ নার্সারি পুকুর থাকা উচিত?

৪. গলদার নার্সারি পুকুরে পানির গভীরতা কত হওয়া উচিত?

৫. গলদার নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদের হার কত?

৬. বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের প্রধান উৎস কি?

৭. পোনা পরিবহনের কমপক্ষে কত সময় আগে পোনাকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে?

৮. পোনা পরিবহনকালে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির কাছাকাছি রাখা হয়?

৯. পোনা পরিবহনের সময় কত ঘণ্টার বেশি হলে ব্যাগে বরফ ও অক্সিজেন উভয়ই ব্যবহার করা হয়?

১০. পোনা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পানির ট্যাংকে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম কি?

১১. উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদের হার কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

২. সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায়গুলো লেখ।

৩. নার্সারিতে পোনা প্রতিপালনের উপকারিতা কি লেখ।

৪. নার্সারি পুকুরের পানির গুণাবলিসমূহ লেখ।

৫. পোনা প্যাকিং-এর জন্য কি কি জিনিস-পত্রাদি ব্যবহৃত হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গলদার নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির নিয়মাবলি বর্ণনা কর।

২. গলদার পোনা প্যাকিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. পানির ট্যাংকে পোনা পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. গলদা চিংড়ির পুকুরে পোনা মজুদ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদোত্তর ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর পুকুরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের পূর্বশর্ত। পোনা মজুদোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া চিংড়ির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। পোনা মজুদের পর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো হচ্ছে।

১. পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ
২. পানি ব্যবস্থাপনায়
৩. পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ
৪. সার প্রয়োগ হয়,
৫. খাদ্য ব্যবস্থাপনা
৬. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষায়
৭. খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও
৮. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

১. পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ

পুকুরে পোনা মজুদের পর বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে পোনা মারা যেতে পারে। এজন্য পানা ছাড়ার ৬-৮ ঘন্টা পর পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুর্বল পানা পাড়ের কাছাকাছি এলোমেলোভাবে সাঁতার কাটতে দেখা যায়। তাছাড়া পোনা মারা গেছে কিনা তা দেখতে হবে। মৃত পোনা পুকুর পাড়ের খুব কাছাকাছি ভাসতে থাকে। মৃত পোনার পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।

২. পানি ব্যবস্থাপনা

পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা চিংড়ি চাষের সফলতার অন্যতম মূল চাবিকাঠি। সাধারণত পানি ব্যবস্থাপনা তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখার প্রধান কারণ হচ্ছে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার বাড়ানো এবং দৈহিক বৃদ্ধি। পুকুরের পানির ভালো অবস্থা বলতে সাধারণত পানিতে পরিমিত অক্সিজেন ও অত্যন্ত কর্ম বর্জ্যের (Metabolites) পুঞ্জীভূত হওয়াকে বুঝায়। এই বর্জ্যের উৎস হচ্ছে চিংড়ির পায়খানা, অভুক্ত খাদ্য, শেওলা এবং অন্যান্য অণুবীক্ষণিক জীব। চিংড়ি চাষ কালের তৃতীয় মাসে ভুক্ত খাদ্যের প্রায় ৩০% এবং চতুর্থ মাসে বা শেষ প্রান্তিকে প্রায় ৫০% বর্জ্য হিসেবে পুকুরের তলায় জমা হয়। এর ফলে ক্ষতিকর শেওলার উৎপাদন ত্বরান্বিত হয় এবং একটি পর্যায়ে এসব ক্ষতিকর শেওলা মারা গিয়ে পানি দূষিত করে তালে। ফলে চিংড়ির স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই পানির গুণগতমান বজায় রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা। এর ফলে পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় থাকে, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত শেওলা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং নতুন পানির সাথে নতুন পুষ্টিকর পদার্থসমূহ পুকুরে সঞ্চালিত হয়। চিংড়ি পোনা মজুদের পর এক সপ্তাহ। কোন পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রথম মাসে অমাবস্যা, পূর্ণিমার সময় একবার বা দুইবার পানি পরিবর্তন করা ভাল। চিংড়ি চাষের পুরাে সময়ে পানে মজুদের ঘনত্ব, পানির গুণগতমান, লবণাক্ততা, প্যাংকটনের ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পানি পরিবর্তনের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত প্রত্যেকবার পানি পরিবর্তন করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে ৩-৫ দিন অন্তর পানি পরিবর্তন করা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনানুসারে প্রতিদিন ১০% পানি পরিবর্তন করা হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতিদিনই ৩০% পানি Flow through পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়।

পুকুরে চিংড়ির দেহের মোট ওজন অনুসারে প্রতিদিন কি পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা উচিত তার তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

চিংড়ির মোট ওজন/ বর্গমিটার	প্রতিদিন পানি পরিবর্তরেন পরিমাণ (%)
২ গ্রামের কম	০
২-১০ গ্রাম	২
১০-২০ গ্রাম	৩
২০-৪০ গ্রাম	৫
৪০-৬০ গ্রাম	৭
৬০-৮০ গ্রাম	৯
৮০-১০০ গ্রাম	১২
১০০-১২০ গ্রাম	১৫
১২০-১৪০ গ্রাম	১৮
১৪০ গ্রামের বেশি	২০% এর বেশি

প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে ভাটার সময় প্রয়োজনে পুকুরের অর্ধেক পানি বের করে দিয়ে জোয়ারের সময় পানি ঢুকানো হয়। সাধারণত জোয়ার ভাটার ওপর নির্ভর করে মাত্র ৫-৬ দিনে ৫০-১০০% পানি পরিবর্তন করা সম্ভব। আধা নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকমের পাম্প ব্যবহার করা হয় এবং জোয়ারের পানির ওপর কম নির্ভর করা হয়। আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে জোয়ারের সময় স্বাভাবিকভাবে পানি পরিবর্তন করা হয় তবে ভাটার সময় প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পানি দুভাবে পরিবর্তন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রয়োজনমতো কিছুটা পানি বের করে দেয়া হয় এবং পরে সেই পরিমাণ পানি ঢুকানো হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একদিক দিয়ে পানি প্রবেশ এবং অপর দিক দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এভাবে পানি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে Flow through system বলা হয়।

অধিক বৃষ্টিপাতের সময় পানি পরিবর্তন না করে পানি নিষ্কাশন গেটের মুখে ফলবোর্ড স্থাপন করে পুকুরের উপরের স্তরের পানি বের করে দেয়া উত্তম। এতে লবণাক্ততা হ্রাসের ঝুঁকি কমে যায়। সাধারণত পানিতে নিম্ন। বর্ণিত অবস্থাদি পরিলক্ষিত হলে পানি পরিবর্তন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

- সকাল (৬-৭ টা) ও বিকাল (৩-4 টা)- এই দুই সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত পিএইচের পার্থক্য ০.৫ থেকে অধিক বা পিএইচের মান ৮.৫ এর বেশি অথবা ৭.৫ এর কম হলে।
- পানির স্বচ্ছতা ৮০ সে মি এর বেশি অথবা ৩০ সেমি এর কম হলে।
- পানি অত্যধিক ভারী ও গাঢ় হয়ে গেলে।
- পানিতে অজৈব কণার পরিমাণ অধিক প্রতীয়মান হলে।
- পানির উপরিভাগে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী বুদবুদ দেখা গেলে।
- পানিতে আন-আয়োনাইজড অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে।
- এয়ারেটর চালানো অবস্থায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে।

২০২২

৩। পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ

পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রধানত তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, খরতা ও ক্ষারত্ব, পিএইচ, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। এসব প্রয়োজনীয় গুণাগুণ না থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি ও বাঁচার হার কমে যায়।

ক) তাপমাত্রা: তাপমাত্রা সমস্ত প্রাণীর জৈব বিপাক (Metabolism) ক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বাড়ে ঠিক তেমনি তাপমাত্রা কম হলে সমস্ত ক্রিয়া কমে যায়। এই জন্য দেখা যায় ২০° সে. তাপমাত্রার চেয়ে ৩০° সে. তাপমাত্রায় জলজ প্রাণীকুলের অক্সিজেন চাহিদা, খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির হার ইত্যাদি প্রায় দ্বিগুণ দ্রুততার সাথে বেড়ে যায়। বাগদা চিংড়ির উৎপাদনের জন্য ২০-৩০° সে. তাপমাত্রা উত্তম। ২৫° সে. তাপমাত্রার নিচে চিংড়ির বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং ২০° সে. এর নিচে প্রায় থেমে যায়। পানির তাপমাত্রা ১৩° সে. এর নিচে এবং ৩৪° সে. এর উপরে হলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। তাপমাত্রা অত্যধিক কম বা বেশি হলে খাদ্য ও সার প্রয়োগ প্রয়োজন মত কম বা বেশি অথবা বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সনাতন ও হালকা উন্নত পদ্ধতির চাষের পুকুরে পানির গভীরতা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না। ফলে এ সমস্ত খামারে গরমের সময় পানির তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য খামারের ভিতরের পার্শ্বে চারিদিকে বা কোণাকুণি নালা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনমতো পানি পরিবর্তন করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

খ) দ্রবীভূত অক্সিজেন: চিংড়ি চাষের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাগদা চিংড়ির অক্সিজেন চাহিদা বেশি। চিংড়ি চাষের পুকুরে ৫-৭ পিপিএম অক্সিজেন থাকা উত্তম। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নামলে চিংড়ি মারা যেতে শুরু করে এবং ১ পিপিএম এর কম হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ চিংড়ি মারা যাবে। পানিতে অক্সিজেনের দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বায়ুচাপের ওপর। সাধারণত তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়।

পানিতে অক্সিজেনের উৎস দুইটি, যথা- বাতাস ও সালোকসংশ্লেষণ। আর পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি তিনভাবে হয়ে থাকে। যথা- ১. রাত্রিকালে উদ্ভিদের শ্বাস গ্রহণ ২. প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণ এবং ৩. পচনশীল জৈব পদার্থের পচন। অক্সিজেন হ্রাসের কারণে চিংড়ির দৈহিক ক্লেশ, ক্ষুধামন্দা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণ

- পানির উপর সরের মত বুদ্বুদ জমা হয়।
- পুকুরের তলা থেকে বুদ্বুদ আকারে গ্যাস উঠে

সাধারণত মেঘলা দিনে, খুব গরম পড়লে এবং মধ্যরাত থেকে ভোরেবেলা পর্যন্ত পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

পানিতে সবুজ উদ্ভিদ কণার (ফাইটোপ্ল্যাংকটন) উপস্থিতিতে সূর্যালোকের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে থাকে। এই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় ফাইটোপ্ল্যাংকটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। রাতের বেলায় যখন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন এরা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে থাকে। তাই যে সব পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের আধিক্য বেশি থাকে সে সব পুকুরে সাধারণত বিকেল বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোরে বেলায় অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। ফাইটোপ্ল্যাংকটন সমৃদ্ধ পুকুরের পানির উপরিভাগে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে এবং তলদেশে কম থাকে।

অক্সিজেন স্বল্পতার প্রতিকার

নিম্নোক্ত উপায়ে পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়ঃ

১. পানিতে ঢেউ এর সৃষ্টি করে যেমনঃ সাঁতার কাটা, বাঁশ পেটানো ইত্যাদি।

২. পুকুরে নতুন পানি সরবরাহ করে অর্থাৎ পানি পরিবর্তন করে।

৩. কৃত্রিমভাবে বায়ু সঞ্চালন করে। এয়ারেটর বা প্যাডেল হুইল স্থাপন করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। পানিতে স্তর সৃষ্টি রোধ, বর্জ্য বের করা এবং অক্সিজেন মাত্রা বাড়াতে এয়ারেটর অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। পুকুরের চারদিকে ৪ টি এয়ারেটর ব্যবহার করতে বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে এক জায়গায় জমা পড়ে। সবগুলো এয়ারেটর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সবগুলো এয়ারেটর একই দিকে ঘুরে, পাড় থেকে এদেরকে ৫-১০ মিটার দূরে এবং একটি থেকে অন্যটি ৩০-৩৫ মিটার দূরে স্থাপন করতে হবে।

গ) পানির লবণাক্ততাঃ গলদা মিঠা পানির চিংড়ি। মিঠা পানিতে এদের চাষ করা যায়। গলদা চিংড়ি ০ থেকে ০৪ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানিতে চাষ করা যায়। পানির লবণাক্ততা বেশি হলে মিঠা পানি সরবরাহ করে পানির লবণাক্ততা কমাতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার বা স্যালাইনোমিটারের সাহায্যে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায়।

চিত্রঃ স্যালাইনোমিটার

ঘ) অ্যামোনিয়াঃ পুকুরের তলদেশে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ প্রাণীর বিপাকীয় ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় চাষের পুকুরে সাধারণত হঠাৎ ব্যাপক হারে ফাইটোপ্যাংটনের মড়ক ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা পচনের কারণে অনায়নিত অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আয়োনিত (NH_4) ও অনায়নিত (NH_4) অবস্থায় অ্যামোনিয়া পানিতে বিদ্যমান থাকে। অনায়নিত অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পুকুরের পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিগ্রা/লিটার এর কম থাকতে হবে যা চিংড়ির জন্য সহনীয়। এতে চিংড়ি উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.১ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ০.৪৫ পিপিএম এর বেশি হলে বৃদ্ধির হার অর্ধেকে নেমে আসে। সাধারণত পানির পিএইচ বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি থাকা উচিত নয়। অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি পিএইচ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে বিকাল বেলা পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি থাকে এবং ভোরে কম থাকে।

পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব হ্রাস, অত্যধিক সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ এবং পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) নাইট্রাইট (NO_2): নাইট্রাইট হচ্ছে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেটের মধ্যবর্তী যৌগ। অনেক সময় এই যৌগ চিংড়ির ব্যাপক মড়ক ও বৃদ্ধির হার হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ পিপিএম এর নিচে থাকা চিংড়ির জন্য নিরাপদ। চিংড়ির ঘনত্ব হ্রাস ও পানি পরিবর্তন করে, জিওলাইট এবং চরম বিপর্যয়ের সময় ৩.৩ কেজি/শতাংশ/৩০ সেমি পানির গভীরতায় লবণ প্রয়োগ করে নাইট্রাইটের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চ) নাইট্রেট (NO_3): পানিতে নাইট্রেটের মাত্রা ২০ পিপিএম এর নিচে রাখা চিংড়ির জন্য উত্তম। নাইট্রেট চিংড়ির জন্য তেমন একটি বিষাক্ত নয়, বরং শেওলার জন্য একটি পুষ্টিকর উপাদান।

ছ) খরতা ও ক্ষারত্বঃ খরতা ও ক্ষারত্বের মান হ্রাস বৃদ্ধি হলে পানির বাফারিং ক্ষমতা কমে যায় এবং পানির পিএইচ দ্রুত উঠানামা করে। এর হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পুকুরে সার দিলে তা কার্যকর হয় না এবং চিংড়ির খোলস বদলানো বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরতা ও ক্ষারত্বের মান ৪০-২০০ মিগ্রা/লিটার চিংড়ির জন্য ভালো। পুকুরের পানি পরিবর্তন করে এবং চুন বা জিপসাম প্রয়োগ করে পানির খরতা ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

জ) পিএইচ: চিংড়ির জন্য পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ উত্তম। পানির পিএইচ মান ৫ পিপিএম এর কম হলে এবং ৯.৫ পিপিএম এর বেশি হলে চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর। সাধারণত খামারে পানির পিএইচ, ফাইটোপ্ল্যাংকটন, অব্যবহৃত খাদ্যের চর্বি ও ময়লা-আবর্জনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। দিনের বেলায় ফাইটোপ্ল্যাংকটন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করার ফলে বিকাল বেলায় পুকুরের পানিতে পিএইচ বেড়ে যায় এবং রাতের বেলায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার ফলে ভারে বেলা পিএইচ কমে যায়। পিএইচ এর দ্রুত উঠানামা চিংড়ির জন্য মোটেও ভালো নয়। পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক পিএইচ পানির উৎপাদন ক্ষমতা নির্দেশ করে। সাধারণত পোড়া চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। অতি বর্ষণে পানির পিএইচ কমে যাওয়ায় চিংড়ির মৃত্যু হতে পারে। এ অবস্থায় প্রতি শতকে পোড়া চুন ৮০-১০০ গ্রাম বা ডলোমা-ইট ১৬০-২০০গ্রাম ব্যবহার করতে হবে।

চিত্রঃ মাছ ও চিংড়ির ওপর পিএইচ-এর প্রভাব

পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়:

- চিংড়ির দেহ থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বেরিয়ে যায় ফলে চিংড়ি দুর্বল হয়ে মারা যায়।
- চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং খাবারে অরুচিভাব দেখা দেয়।
- পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়।
- পিএইচ ৪.৫-এর কম হলে চিংড়ির পীড়ন হয় এবং মৃত্যুহার বেড়ে যায়।
- কম পিএইচ-এর ফলে চিংড়ির খোলস নরম হয় এবং খোলস বদল করতে পারে না।
- পিএইচ এর মান কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কমবেশি হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা কমে যায়।
- পিএইচ কম হলে চিংড়ির রং কালো হতে পারে, অঙ্গহানি হতে পারে।

পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির উপর নিম্নোক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়:

- চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।
- অভিস্রবণ (Osmoregulation) ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়।

চুন ও জিপসাম প্রয়োগ করে পানির পিএইচ বাড়ানো যায় এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট (১ কেজি/শতাংশে) অথবা তুঁতে (৬-১২ গ্রাম/শতাংশ/৩০ সেমি) প্রয়োগ করে পানির পিএইচ কমানো যায়।

খ) হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S): সাধারণত পচনশীল জৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে পুকুরের তলদেশে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস সৃষ্টির ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং মাটির উপরিভাগে কালো আবরণের সৃষ্টি হয়। পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ০.১-০.২ পিপিএম হলে চিংড়ি শরীরের ভারসাম্য হারায়, খাদ্য গ্রহণে অনীহাভাব দেখায় ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ১ পিপিএম-এর বেশি হলে চিংড়ির মড়ক আরম্ভ হয়।

পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি, সার ও খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা হ্রাস এবং পিএইচ এর মাত্রা বৃদ্ধি করে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পুকুরের পানি পরিবর্তনের মাধ্যমেও হাইড্রোজেন সালফাইডজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

৪. সার প্রয়োগ

উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেয়া হয়। পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদিত হয়। সেক্কি ডিস্কের দৃশ্যমানতা ৩০-৩৫ সেমি এর বেশি হলে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার প্রয়োগের মাত্রা বিভিন্ন পুকুরে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। পুকুরের পানিতে সেক্কি ডিস্কের দৃশ্যমানতার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদে শতাংশ প্রতি ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০-৩০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই মাত্রায় সার প্রয়োগের ৫-৬ দিনের মধ্যে সেক্কি ডিস্কের দৃশ্যমানতা না কমলে উপরাক্তে মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ সার আবার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় পানি পরিবর্তনের পর সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আধানিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির চাষে প্রথম ২ মাস প্রতিবার পানি পরিবর্তনের পর অল্প মাত্রায় ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৫. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির জীবনধারণ, দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া চিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যও চিংড়ি চাষে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। কিছু সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধানিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদ মূলত সম্পূরক খাদ্য বা পিলেটের উপর নির্ভরশীল। চিংড়ি খামারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করলে অব্যবহৃত খাদ্য পচে পানি দূষিত করে ফেলে। এতে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে।

চিংড়ির গড় ওজন ও তাপমাত্রার উপর চিংড়ির খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের হার কমানো উচিত। নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে চিংড়ির সংখ্যা ও গড় ওজন হিসাব করে খাদ্যের মাত্রা স্থির করা উচিত। চিংড়ির গড় ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগের হার নিচে দেয়া হলো:

	চিংড়ির গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের হার (মোট দৈনিক ওজনের%)
নার্সারি পুকুর/ লালন পুকুর	০.২-১.০	১৫-১৩
	১.০-২.০	১৩-১১
	২.০-৩.০	১১-৯
	৩.০-৫.০	৯-৭
	৫.০-১৩.০	৭-৫
	১৩.০-২০.০	৫-৩
	২০.০-৩০.০	৩-২.৫

খাদ্যদানীর মাধ্যমে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং সঠিকভাবে খাদ্যের মাত্রা নির্ণয় করা যায়। বাগদা চিংড়ি দিন-রাত সব সময় খাদ্য খেয়ে থাকে তবে সন্ধ্যা ও রাতে চিংড়ি সবচেয়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। সূর্যালোকের প্রখরতা বাড়ার সাথে সাথে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা আপেক্ষিকভাবে কমে যায়। খাদ্য প্রয়োগের একটি সম্ভাব্য সময়সূচি নিচে দেয়া হলো:

২০২২

সময় (ঘন্টা)	সম্পূর্ণ খাদ্যের %
সকাল ৭টা	২০
বিকাল ৪টা	১০
সন্ধ্যা ৬টা	২৫
রাত্রি ৮টা	২৫
রাত্রি ১০টা	২০

চিত্রঃ খাদ্যদানী

এভাবে প্রতিবার খাদ্য সরবরাহের সময় পুরাতন অবশিষ্ট সকল খাদ্য ফেলে দিয়ে ট্রে পরিষ্কার করতে হবে।

৬. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা

চিংড়ির স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করা দরকার। সাধারণত খেপলা জালের (Cast net) সাহায্যে এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা সংগ্রহের পর চিংড়ির স্বাস্থ্য ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখার দরকার যে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়েছে কি-না। যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে জরুরি ভিত্তিতে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নমুনা সংগ্রহের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে চিংড়ির সংখ্যা ও গড় ওজন হিসাব করে বের করা। কারণ চিংড়ির গড় ওজনের ভিত্তিতেই খামারে খাদ্য প্রয়োগ করা হয়।

৭. খামারে চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সাধারণত অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ, মজুদ ঘনত্ব বেশি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে চিংড়ির শরীরে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। চিংড়ির ঘনত্ব বেশি হলে খাদ্যাভাবও প্রকট হয়। ফলে কিছু কিছু চিংড়ি দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং দুর্বল ছোট চিংড়িগুলো খাদ্য প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এর ফলে চিংড়ি ধীরে ধীরে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া অধিক ঘনত্বের কারণে জলীয় পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপঃ

- পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- নির্ধারিত মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা
- সুষম খাদ্য ব্যবহার

২০২২

- অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ রোধ।

- খামারে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও আহরণ সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুরে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে একান্তভাবেই যদি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে এর ব্যবহারের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখতে হবে।

৮. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ

সঠিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি সরবরাহ ও নির্গমন ব্যবস্থা যাতে ঠিকমত থাকে সেজন্য পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এসব গেটে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা দিলে তা সাথে সাথে অপসারণ করতে হবে। তাছাড়া গেটের পার্শ্বে বা তলা দিয়ে পানি চলাচল করলে তা সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত নেট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং গেটের মুখে স্থাপিত পাটা বা ধাইজ্যা ঠিকমত আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এগুলো ত্রুটিপূর্ণ হলে চিংড়ি খামার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেষ্টনী বাঁধ ও পুকুরের বাঁধ নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। বাঁধে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে। খামারের অবকাঠামোসমূহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

চাষকালীন উদ্ভুত সমস্যা ও তার প্রতিকার

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভালো ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে বেশ কিছু কারিগরি সমস্যা দেখা দিতে পারে যার কারণে ব্যাপক হারে উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরের এরূপ কিছু সাধারণ কারিগরি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

(১) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ

পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুর/ঘেরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ থেকে যেতে পারে। এছাড়াও বর্ষাকালে পানির সাথে বা বাচ্চাদের দ্বারা যে কোনো সময় বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার: পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে

- পুকুরে/ঘেরে বাইরের পানি ঢুকতে না দেয়া
- জাল ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন
- বাচ্চাদের নজরে রাখা
- প্রয়োজনে থাকলে পুকুরের চারদিকে ৩০-৪০ সেমি উঁচু বানা বা মশারী জালের বেড়া দেয়া

(২) পানির উপর ঘন সবুজ স্তর

অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ মান বেড়ে যায়। এ ছাড়া শেওলা মরার পর পুকুরের তলায় জমা হয় এবং পচে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ ও চিংড়ি পানির উপরিতলে খাবি খায় এবং কখনও কখনও ব্যাপক হারে মারা যায়।

প্রতিকার: তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে/ঘেরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সে সাথে পুকুরে/ঘেরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের চারা পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদকণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৩) পানির উপর লাল স্তর

অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লালস্তর পড়তে পারে। ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না। এজন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

প্রতিকার: ধানের খড় বা কলাপাতা প্যাচিয়ে দড়ি বানিয়ে পানির উপর থেকে টেনে তুলে ফেলা যায়।

(৪) অ্যামোনিয়া পুঞ্জীভবন

বিভিন্ন কারণে পুকুরের তলদেশে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চতর পিএইচ এ অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটন বেড়ে গেলে পানির পিএইচ দ্রুত উপরে উঠে আসে। ফলে ব্যাপক সংখ্যায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। চিংড়ির ফুলকায় কালো দাগ পড়লে বুঝতে হবে নাইট্রোজেন বর্জ্য ও অন্যান্য রাসায়নিকের মাত্রা বেশি। অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে রক্ত পরিবহনতন্ত্র দ্রুত আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার: মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা, সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল ও পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ।

(৫) খাবি খাওয়া

অনেক পুকুরেই আগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল-মে মাসে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। সাধারণত ভোর রাতের দিকে মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে এটা ঘটে। অক্সিজেন স্বল্পতা যদি খুব বেশি ও দীর্ঘমেয়াদি হয় তবে মাছ ও চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

প্রতিকার: প্রাথমিক অবস্থায় সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রেখে বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ বা স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে একই পুকুরের পানি ছিটানারে ব্যবস্থা করতে হবে। তবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা চলতে থাকলে বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে বিক্রি করা যেতে পারে।

(৬) রাক্ষুসে প্রাণীর উপদ্রব

সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, উদ সরাসরি খেয়ে ফেলে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

২০২২

প্রতিকারঃ এ সমস্ত প্রাণী নিয়ন্ত্রণে কায়িক মাধ্যমই সবচেয়ে ভালো। সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও উদ দেখার সাথে সাথেই মেরে ফেলতে হবে। উদ নিয়ন্ত্রণে চুন ভর্তি ডিমের খোসা পুকুরের পাড়ে রেখে দিলে উদের উৎপাত কমে যায়। বাঁশের চাই ব্যবহার করে সহজেই কাকড়া মারা যায়। সাধারণভাবে ব্যাঙ যে সমস্ত অঞ্চলে ডিম দেয় যেমন-পানি ও পাড়ের সংযোগ থলের ঘাস দূর করে ফেলতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত পুকুরের আশেপাশে জঙ্গল থাকে সেখানেই এসব প্রাণীর উপদ্রব বেশি হয় বলে চারপাশ আগাছা-জঙ্গল মুক্ত রাখতে হবে। পুকুরের পাড়ে ঘন ফাসের পুরাতন জাল দিয়ে বেড়া দেয়া যেতে পারে।

(৭) অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। প্রায় সব চাষিই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে। ফলে এসব খাদ্যের একটা বড় অংশ তলায় জমা হয়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। এতে মাছ ও চিংড়ি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

প্রতিকারঃ প্রয়োগের পূর্বে খাদ্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগ স্থানের মাটিতে জমে থাকা অতিরিক্ত কাদা অপসারণ করতে হবে।

(৮) ঘোলাত্ব

বৃষ্টি ধোয়া পানিতে পুকুর ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। এর ফলে সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়াও মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রতিকারঃ বৃষ্টি ধোয়া পানির প্রবেশ রোধ করার জন্য সমতল ভূমি থেকে পুকুরের পাড় উঁচু রাখতে হবে। ঘোলাত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি শতাংশ পানিতে ১ কেজি করে পোড়া চুন বা জিপসাম ২ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৯) তলার কালো কাদা

অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাষ করা পুকুরে ঘেরে এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে মাছ ও চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজার মূল্য হ্রাস করে।

প্রতিকারঃ চিংড়ি ছাড়ার পূর্বে তলার অতিরিক্ত কালো (প্যারী) কাদা তুলে ফেলতে হবে। চাষকালীন সময়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দিলে দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

(১০) স্বজাতিভোজিতা

চিংড়ি চাষের এটি একটি বড় সমস্যা। স্বভাবগত কারণে চিংড়ি স্বজাতিভুক প্রাণী। যখন এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এরা ছোট ও দুর্বল আকৃতির চিংড়িগুলোকে ধরে খায়।

প্রতিকারঃ মজুদকালীন সময়ে পুকুরে সমান আকৃতির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পুকুরে খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

(১১) বৃষ্টির পর ভেসে উঠা

বৃষ্টির পর অনেক সময় মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে খাবি খেতে পারে। পানির পিএইচ কমে যাওয়ার ফলে এটা ঘটে থাকে। পিএইচ কমে গেলে ক্ষতিকর হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়া বেড়ে যায়।

প্রতিকারঃ বৃষ্টির পরপরই পানির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিবার ভারী বৃষ্টির পর শতাংশ প্রতি ৭৫-৮০ গ্রাম হারে পোড়া চুন/ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হবে।

(১২) অমাবস্যা/পূর্ণিমায় চিংড়ির পাড়ে চলে আসা

অমাবস্যা/পূর্ণিমার তিথিতে রাতের বেলায় চিংড়ি পাড়ের ওপর চলে আসতে পারে। ফলে শিয়াল বা অন্য কোনো নিশাচর রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকারঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। তবে পুকুরের পানির পরিবেশ ভালো থাকলে এ অবস্থা দেখা যায় না। পাড় ঘেষে মশারীর জাল দিয়ে বেড়া প্রদান করা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. পানি ব্যবস্থাপনায় পানি পরিবর্তনের সময় প্রত্যেক বার কত ভাগ পানি পরিবর্তন করা হয়?
২. নিবিড় পদ্ধতিতে চাষাবাদকালে কোন পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তন করা হয়?
৩. পুকুরের বিভিন্ন স্তরের পানি পরিবর্তনের জন্য স্লুইস গেটের মুখে কি ব্যবহার করা হয়?
৪. পানির স্বচ্ছতা কত সেন্টিমিটারের কম বা বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে?
৫. পুকুরের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির বেশি হলে চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে ?
৬. চিংড়ি চাষের পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উত্তম মাত্রা কত?
৭. ফাইটোপ্ল্যাংকটন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন গ্যাস ত্যাগ করে?
৮. বেশি ফাইটোপ্ল্যাংকটন যুক্ত পুকুরে কোন সময় বেশি অক্সিজেন থাকে?
৯. বাগদা চিংড়ি সর্বোচ্চ কত লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে?
১০. চিংড়ির পুকুরে অ্যামোনিয়ার সহনীয় মাত্রা কত?
১১. চিংড়ির জন্য পানির উত্তম পিএইচ মাত্রা কত?
১২. সেক্কি ডিক রিডিং কত হলে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত?
১৩. চিংড়ির নমুনা সংগ্রহে সাধারণত কোন জাল ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. Flow through system বলতে কী বোঝ লেখ।
২. কোন কোন অবস্থায় পানি পরিবর্তন করা দরকার তা লেখ।
৩. চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে অক্সিজেন ঘাটতির কারণগুলো লেখ।
৪. চিংড়ির পুকুরে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণগুলো লেখ।
৫. পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির উপায়গুলো লেখ।
৬. পুকুরে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো লেখ।
৭. পানির পিএইচ কমে গেলে চিংড়ির উপর কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লেখ।
৮. পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির উপর কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা লেখ।
৯. পুকুরে হাইড্রোজেন সালফাইড নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ লেখ।
১০. চিংড়ি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি কী লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষাবাদে পানির গুণাগুণ আলোচনা কর।
২. চিংড়ি চাষাবাদে অ্যামোনিয়ার গুরুত্ব আলোচনা কর।
৩. পোনা মজুদোত্তর পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. চিংড়ির ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগের হার বর্ণনা কর।
৫. চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগমাত্রা বর্ণনা কর। ২০২২

সপ্তম অধ্যায়

গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। পেশিকলা গঠন ও জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ করে তাকে। আমিষ, চর্বি, শ্বেতসার, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতি চিংড়ির খাদ্যের প্রধান পুষ্টি উপাদান। গলদা চিংড়ির খাদ্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) প্রাকৃতিক খাদ্য ও (২) সম্পূরক খাদ্য। প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশে সাধারণত উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। পুকুর প্রস্তুতকালে এবং পরবর্তীতে খামার ব্যবস্থাপনার সময় জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা হয়। এছাড়া আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতেও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

চিংড়ি স্বভাবে নিশাচর প্রাণী। গলদা চিংড়ি সাধারণত রাতে খাদ্যের সন্ধানে পুকুর পাড়ের দিকে অল্প পানিতে বিচরণ করে এবং দিনের বেলায় গভীরে চলে যায়। এরা চিলেটযুক্ত পা দিয়ে বড় ধরনের দানাদার খাদ্য ধরে গলধকরণ করে থাকে। এরা সর্বভুক প্রাণী। খাদ্য হিসেবে গলদা চিংড়ি প্রধানত জলজ পোকা-মাকড় ও তাদের ডিম, শুক্রকীট বা লার্ভা, অ্যালজি, শামুক, ক্রাস্টাশিয়ান, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকে। প্রায় সকল ধরনের ক্রাস্টাশিয়ান জুপ্ল্যাংকটন ও শামুক গলদা চিংড়ির অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এসব খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকে যা চিংড়ির শারীরিক বৃদ্ধি ও খোলস তৈরির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত চিংড়ি খাদ্যের অভাবে যা পায় তাই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। পুকুরে খাদ্যের স্বল্পতা দেখা গেলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে।

প্রাকৃতিক খাদ্য

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যের ওপর চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুকুরে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যের স্বল্পতা ঘটলে চিংড়ির প্রত্যাশিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। আমরা জানি, জীবমাত্রই জীবনধারণের প্রয়োজনে নানা জৈবিক কার্য সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। আর শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে সৌর শক্তি। সৌরমণ্ড ল থেকে তাপ ও প্রয়োজনীয় গ্যাস (কার্বন) পানিতে দ্রবীভূত নানা পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাথমিকভাবে প্রথমে প্রাণের সৃষ্টি হয়। আর এই উদ্ভূত প্রাণীকেই বলা হয় উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্লাংকটন। এই উদ্ভিদকণার জীবন চক্র সমাপ্তির পরই পানিতে প্রাণী কণার সৃষ্টি হয় এবং এরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ কণার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। প্রাণীকণার বিনাশ প্রক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলো পানিতে মিশে যায়। এ ব্যাপারে পুকুরের মূল মৌলিক উপাদানগুলো একটি জটিল প্রক্রিয়ায় যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় সরল পদার্থরূপে পানিতে ফিরে আসে। আর এরূপেই প্রাকৃতিকভাবে পানির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। পুকুরে এ ধরনের জটিল প্রক্রিয়া পুকুরের জলজ উদ্ভিদকণা, প্রাণীকণা, জীবাণু ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণের ওপর নির্ভরশীল। পুকুরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং উচ্চ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীকূল পাশাপাশি

অবস্থান করে। জীবনধারণ ও প্রয়োজনে এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে জলজ পরিবেশে একটি খাদ্যশৃঙ্খলের (Food chain) সৃষ্টি হয়। এই খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম ধাপে অবস্থান করে উদ্ভিদকণা ও জলজ উদ্ভিদ এবং এরা প্রাথমিকভাবে খাদ্য উৎপাদন করে বলে এদেরকে খাদ্য উৎপাদক (Producer) বলা হয়। খাদ্য শৃঙ্খলের দ্বিতীয় ধাপে অবস্থানকারী প্রাণীকণা, নানা ধরনের চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এদেরকে উৎপাদন শ্রেণী (Consumer) বলা হয়।

প্রাকৃতিক খাদ্য দুই ধরনের, যথা-(১) উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন (Phytoplankton) ও (২) প্রাণী প্ল্যাংকটন (Zooplankton)

১) উদ্ভিদ প্ল্যাংক্টন: গলদা চিংড়ি জীবনের বিভিন্ন দশায় নিম্নোক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

ক) নীলচে সবুজ শেওলা (Blue green algae): Spirulina sp. Oscilletoria sp, Anabaena sp.

Nostoc sp.)

খ) সবুজ শেওলা (Green algae): Chlorella sp; Odogonilum sp; Cladophora sp; Desmis sp; Cosmarium sp; Orgonium sp.

গ) ডায়াটমস (Diatoms): Navicula sp; Cyclotella sp; Chaetoceros sp; Gyrosigme sp; Secletenema sp.

চিত্র: উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন

ঘ) সুতাকার শেওলা (Filamentous algae): যদিও এসব উদ্ভিদ কণা পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয় তথাপি এসব প্রাকৃতিক উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন কৃত্রিম উপায়ে চাষ করে পুকুরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। চিংড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলজ শেওলা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদ প্ল্যাংকটনের মধ্যে ডায়টম জাতীয় শেওলা চিংড়ির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

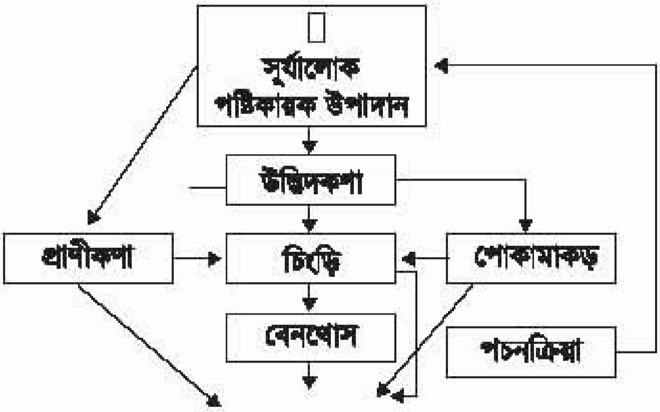

চিংড়ির খাদ্যচক্র

২) প্রাণী প্ল্যাংকটন (Zooplankton): চিংড়ি নিম্নোক্ত প্রাণী প্ল্যাংকটনসমূহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে:

ক) কপিপড (Copepod): Cyclops sp; Diaptomus sp

খ) ক্লাডোসেরা (Cladocera): Daphnia sp; Moina sp, Bosmina sp.

গ) অস্টাকড (Rotifers): Brachionus sp; Reratella sp.

ঘ) অস্টাকড (Ostacod): Cypris sp.

ঙ) নোনা চিংড়ি জাতীয় ও আর্টিমিয়া ও আর্টিমিয়ার লার্ভা দশা

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

সম্পূরক খাদ্য

মাছ ও চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি এবং অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে সব বাড়তি খাবার দেয়া হয় এদেরকে সম্পূরক খাবার বলে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ির খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন— আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদানের কোনোটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকলে মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে শুধু জল প্রাকৃতিক খাদ্যে মাছ ও চিংড়ির সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। মাছ ও চিংড়ির এ সকল চাহিদা পূরণের জন্য বাইরে হতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের খাবার পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার নাড়ি-ভুড়ি ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ ও চিংড়ি পুকুরের পরিবেশ থেকে প্রাণিকণা, উদ্ভিদকণা, তলদেশের পোকামাকড়, শুক্রকীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিনতু আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে এসব প্রাকৃতিক খাদ্য মাছ ও চিংড়ির প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদার যোগান দিতে পারে না। ফলে মাছ ও চিংড়ি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধির হার কমে যায়। যা সার্বিক উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। মাছ ও চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা সৃষ্টির পাশাপাশি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে চিংড়ির স্বজাতিভোজিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূরক খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। পুকুরের পরিবেশে যখন খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন এদের স্বজাতিভোজিতা বৃদ্ধি পায় এবং সবল চিংড়ি দুর্বলগুলোকে ধরে খায়। এর ফলে ব্যাপক হারে চিংড়ি মারা যেতে পারে। পরিমিত পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ির এ ক্ষতিকর স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশের পুকুর-দীঘি ও উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরগুলোতে শতাংশ প্রতি মাছ ও চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন যথাক্রমে ৬ কেজি ও ২-২.৫ কেজি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে এ সমস্ত জলাশয়ে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে খুব সহজেই ৫ গুণের বেশি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হলো:

- অধিক ঘনত্বে মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যায়।
- অল্প সময়ে মাছ ও চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়।
- মাছ ও চিংড়ির মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়।
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- চিংড়ির স্বজাতিভোজিতা রোধ করে
- অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়

খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

আমাদের দেশে চাষিরা সম্পূরক খাবার হিসেবে প্রধানত খৈল ও কুঁড়া ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো ছাড়াও প্রায় সারাদেশেই চাষিদের এমন কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায় যাদের কিছু কিছু আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, এমন কি কিছু কিছু পুকুরের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়ি অধিক উৎপাদন। সে কারণে পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য নির্বাচনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো:

- উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা
- চাষির আর্থিক সংগতি
- উপকরণসমূহের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির পছন্দনীয়তা
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

২০২২

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা

সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকা ও দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাদ্যেও সুষম খাবারের সবগুলো উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু এসব খাদ্য উপাদানের মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। সে কারণে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বলতে সাধারণভাবে আমিষের চাহিদাকে বুঝানো হয়। মাছের খাদ্য তৈরিতে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্রত্যেকটিতে খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন শর্করা, চর্বি ও খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা এদের বয়স ও প্রজাতির উপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উৎপাদন পুকুরে রুই জাতীয় মাছ ও চিংড়ির খাদ্যে আমিষের চাহিদা যথাক্রমে ৩৫-৪০% এবং ৪০-৪৫%। অতএব, সর্বোচ্চ মাত্রার উৎপাদন পেতে হলে মাছ ও চিংড়ি দ্বারা গৃহীত খাদ্যে উল্লিখিত মাত্রার আমিষ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিনতু প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ ও চিংড়ি মোট চাহিদার ৫-১৫% আমিষ পেয়ে থাকে। সেই বিবেচনায় তৈরি খাদ্যে ২৫-৩০% আমিষ থাকলেই খাদ্যকে সুষম হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

খাদ্যের পুষ্টিমান

আমাদের দেশে মাছ অথবা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত খাদ্য উপকরণের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে এদের মধ্যে উচ্চমানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের টেবিলে উল্লেখ করা হলো:

উপাদানের নাম	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ
চালের গুঁড়া	১১.৬৮	৪৪.৫২	১০.৪৫
গমের ভূষি	১৪.৫৭	৬৬.৩৬	৪.৪৩
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২০	৩৪.৯৭	১৩.১৮
ফিসমিল-এ গ্রেড	৫৬.৬১	৩.৭৪	১১.২২
ফিসমিল-বি গ্রেড	৪৪.৭৪	১৬.৮২	৭.৮৭
ব্লাডমিল	৬৩.১৫	১৫.৫৯	০.৫৬
আটা	১৭.১৮	৭৫.৬০	৩.৯০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	-
ক্ষুদিপানা	১৪.০২	৬০.৮৮	১.৯২
কুটিপানা	১৯.২৭	৫০.১৯	৩.৪৯

মাছ বা চিংড়ির খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়ে শুধুমাত্র আমিষের মাত্রা হিসেব করা হয়। সাধারণ ঐকিক নিয়মে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি খাদ্যের পুষ্টিমান সহজেই নিরূপণ করা যায়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো। ধরা যাক ফিসমিল, সরিষার খৈল, গমের ভুষি এবং বাইন্ডার হিসেবে আটা ব্যবহার করে ১ কেজি খাদ্য তৈরি করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অনুপাত হবে ফিসমিল ২৫%, সরিষার খৈল ২৫%, গমের ভুষি ৪০% ও আটা ১০%। তাহলে এ সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করে তৈরি খাদ্যে আমিষের মাত্রা হবে

২০২২

উপকরণ	বিদ্যমান আমিষের পরিমাণ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (গ্রাম)	সরবরাহকৃত আমিষের (%)
ফিসমিল	৫৬.৬১	২৫	২৫০	১৪.১৫
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	২৫	২৫০	৮.১৩
গমের ভূষি	১৪.১৭	৪০	৪০০	৫.১২
আটা	১৭.১৮	১০	১০০	১.৭৮
খনিজ লবণ	-	-	১চা চামচ	-
উপকরণ	মোট	১০০	১০০০	৩০.১৮

অতএব উল্লিখিত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হচ্ছে ৩০.০৮%

খাদ্য তৈরিতে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত:

মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরির জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়। আমাদের । দেশে প্রচলিত খাদ্য উপকরণ যেমন- খৈল, কুঁড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করেই মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে চাষির আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য তৈরিতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা উল্লেখ করা হলো:

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা(%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ফিসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়/ঝিনুকের গুড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুষি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
ভিটামিন প্রিমিক্স	-	১ চা চামচ	-	১ চা চামচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

মিশ্র খাদ্য ছাড়াও পুকুরে যদি গ্রাসকার্প ও সরপুঁটি থাকে তবে নিয়মিত ক্ষুদিপানা, কুটিপানা, নরম ঘাস, বিচি কলার পাতা, পেঁপে পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, নেপিয়ার ঘাস, শীতকালীন শাকসবজি ইত্যাদি দিতে হবে। গ্রাসকার্প প্রতিদিন এর দেহ ওজনের প্রায় ৪০-৪৫% পর্যন্ত সবুজ খাদ্য খেতে পারে। ২০২২

খামারে তৈরি সম্পূরক খাদ্য

চিংড়ি চাষিরা সাধারণত চাউলের কুঁড়া, গমের ভুসি, ফিসমিল, গরু-ছাগলের নাড়িভূড়ি, সরিষার খৈল/তিলের খৈল ইত্যাদি খাদ্য উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে থাকে। তবে চিংড়ি চাষিরা খামারে যে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ চাষিরা খাদ্যের গুণগতমান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। খামারে দেশীয় খাদ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন অনুপাতে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির কয়েকটি নমুনা নিচে দেয়া হলো

উপাদান	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
সয়াবিন খৈল	২০%	-	৫%
মৎস্য চূর্ণ	২০%	৩০%	১০%
চিংড়ি চূর্ণ	২০%	১৫%	২৫%
চাউলের গুড়া	২০%	-	২২%
ময়দা	১৪%	১৫%	-
বার্লি	৫%	৫%	৫%
ভিটামিন মিশ্রণ	১%	-	-
সরিষার খৈল	-	১০%	৫%
চাউলের কুঁড়া	-	২৫%	২৫%
মাছের তৈল	-	-	৩%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

উপরাক্তে নমুনাগুলোর যে কোনো একটি নমুনা অনুসারে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে গলদা চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উপরাক্তে নমুনায় নির্দেশিত হারে পরিমাণমত উৎকৃষ্ট খাদ্য উপাদানসমূহ আলাদা আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে এবং অল্প অল্প করে একটি বড় পাত্রে শুকনা অবস্থায় উপাদানগুলো ভালোভাবে মিশাতে হবে। খাদ্য উপাদানগুলো ভালোভাবে মেশানারে পর অল্প অল্প করে পানি দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো মণ্ড বা পেইস্টে পরিণত করা হয়। তারপর এই মণ্ডকে হাত দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে ভেজা খাদ্য হিসেবে সরাসরি খামারে প্রয়োগ করা যায়। আবার এই খাদ্য মেশিনে পিলেট বানিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে দানাদার খাদ্যও তৈরি করা যায়।

কারখানায় তৈরি খাদ্যের গুণগতমান বিশ্লেষণ

খাদ্যের শ্রেণি	খাদ্যের আকৃতি	আর্দ্রতা (%)	স্থুল আমিষ (%)	স্থুল চর্বি (%)	স্থুলতন্তু (%)	ভষ্ম (%)
নার্সারি	টুকরা	১১	৪০	৩	৬	১৮
স্টার্টার-১	টুকরা	১১	৩৯	৩	৬	১৮
স্টার্টার-২	টুকরা	১১	৩৮	৩	৬	১৮
স্টার্টার-৩	পিলেট	১১	৩৮	৩	৬	১৮
গ্রোয়ার	পিলেট	১১	৩৬	৩.৫	৬	১৮
ফিনিসার	পিলেট	১১	৩৫	৩.৫	৬	১৮

কারখানায় তৈরি খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড, আমিষ, খাদ্যপ্রাণ, । খনিজ পদার্থ ইত্যাদি যোগান দেয় ।

২. কারখানায় তৈরি পিলেটের আকার ও গঠন এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে পিলেট পানিতে ডুবে থাকে এবং চিংড়ি সহজেই খেতে পারে ।

৩. পানিতে এই খাদ্যের স্থায়িত্বকাল অনেক বেশি । এই খাদ্য পানিতে সহজেই গলে যায় না এবং পানিতে প্রায় ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় থাকে । ফলে পুকুরের তলদেশ দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার থাকে ।

৪. চিংড়ির খোলস বদলানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ।

৫. এই খাদ্যে সুগন্ধিযুক্ত উপাদান থাকে যা চিংড়িকে খাদ্য গ্রহণে আকৃষ্ট করে ও চিংড়ির ক্ষুধা বৃদ্ধিতে । সহয়তা করে ।

৬. এই খাদ্যের স্থায়িত্ব কমপক্ষে ৪ মাস । ফলে এই খাদ্যকে একটি উৎপাদন মৌসুম পর্যন্ত সহজেই মজুদ রাখা যায় ।

৭. পুকুরে এই খাদ্যের অপচয় কম হয় ।

৮. এই খাদ্য পানিতে সহজেই গলে যায় না বিধায় পানির গুণাগুণ নষ্ট করে না ।

খাদ্য মজুদ রাখার পদ্ধতি

খাদ্য তৈরির পর খাদ্যের গুণগতমান সর্তকিক্ষণের জন্য সঠিকভাবে মজুদ করা দরকার । খাদ্যের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে গেলে সেই খাদ্য পুকুরে প্রয়োগ করা উচিত নয় । খাদ্যের গুণাগুণ যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে খাদ্যমজুদ করা দরকার ।

১. শুষ্ক, ঠান্ডা ও অবোধ বায়ু চলাচল করতে পারে এমন স্থানে রাখতে হবে ।

২. পাকা বা কাঁচা মেঝের ওপর কাঠ বিছিয়ে তার ওপর খাদ্য রাখতে হবে ।

৩. সরাসরি সূর্যালোকে খাদ্য মজুদ করা ঠিক নয় । ছায়াযুক্ত স্থানে খাদ্য মজুদ করা ভালো ।

৪. খাদ্য তৈরির পর অনধিক ৩ মাসের মধ্যেই খাদ্য ব্যবহার করা উচিত । পুরাতন খাদ্য খামারে ব্যবহার করা সঙ্গত নয় ।

সম্পূরক খাদ্য "পিলেটের" আকার

চিংড়ি কোনো কোনো সময় সরাসরি পিলেট ভক্ষণ করে থাকে আবার কোনো কোনো সময় পিলেট নিয়ে সাঁতার কাটে । তাই পিলেট এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে পিলেট ভক্ষণ করা, বহন করা চিংড়ির জন্য কোনো সমস্যা না হয় । চিংড়ির আকার/ওজনের ভিত্তিতে পিলেটের আকার নিচে দেয়া হলো ।

চিংড়ির ওজন (গ্রাম)	পিলেটের আকার
০-৩	১ মিমি কণা বা ক্রাম্বল
৩-১৫	২ মিলি×৪ মিমি কণা বা ক্রাম্বল
১৫-৪০	২.৫ মিমি×৫ মি মি

২০২২

খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়

চিংড়ির পুকুরে অতি সতর্কতার সাথে খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা বেশি হলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বেশি হয় অন্যদিকে পানি দূষণেরও সম্ভাবনা থাকে। একটি পুকুরে কী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করা হবে তা নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।

প্রতিদিন দেয় খাবারের পরিমাণ= (মোট মজুদকৃত চিংড়ি) × {বেঁচে থাকার হার(%) × প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন × খামারে প্রয়োগের মাত্রা(%)}

উদাহরণস্বরূপ, একটি পুকুরে মোট মজুদকৃত চিংড়ির পরিমাণ = ১০০০০০টি

বেঁচে থাকার হার = ৭০%; প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন = ২০ গ্রাম

খাবার প্রয়োগের মাত্রা= ৬% (মোট চিংড়ির ওজনের)

এক্ষেত্রে প্রতিদিন দেয় খাবারের পরিমাণ = ১০০০০০ × ৭০ গ্রাম × ২০ × ৬/১০০

= ৮৪০০০ গ্রাম

= ৮৪ কেজি

ফিডিং ট্রে পর্যবেক্ষণের পর চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ কমাতে হবে এবং কী কারণে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমলো তা জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবস্থার উন্নতি হলে খাবার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন কারণে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যেতে পারে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- পুকুরে হঠাৎ ফাইটোপ্লাংকটন অধিক মাত্রায় মারা গেলে
- দীর্ঘদিন পুকুরের পানির পরিবর্তন করা না হলে
- পুকুরের পানির পিএইচ মাত্রা কমে গেলে
- পুকুরের তলদেশের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে
- চিংড়ি রোগাক্রান্ত হলে
- চিংড়ি খোলস পাল্টালে
- দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নেমে গেলে
- পানির তাপমাত্রা ৩০° সে. এর উর্ধ্বে বা ২০° এর নিচে নেমে গেলে

চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

ফিডিং ট্রে থেকে বা খেপলা জালের মাধ্যমে পুকুর থেকে চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে পুকুরে চিংড়ির মজুদ নির্ণয় করা যায়। এছাড়া নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে চিংড়ির স্বাস্থ্য, বাঁচার হার ও পুকুরের তলদেশের অবস্থা জানা যায়। ৫ গ্রামের কম ওজনের চিংড়ির নমুনা ফিডিং ট্রে থেকে এবং এর অধিক ওজনের চিংড়ির নমুনা খেপলা জালের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ভালো। খেপলা জালের মাধ্যমে মোট চিংড়ির সংখ্যা ও দৈহিক বৃদ্ধি জানার জন্য পুকুরের বিভিন্ন স্থানে ১০-১৫ বার জাল টেনে চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে চিংড়ির মজুদ নির্ণয় করা যায়।

মোট চিংড়ির সংখ্যা = গড়ে একবারে ধৃত চিংড়ির সংখ্যা/জালের আয়তন (ব. মিটার) × পুকুরের আয়তন (ব. মিটার)

জালের আয়তন= ৩.১৪ × (জালের ব্যাসার্ধ)$_{২}$

দৈহিক বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের জন্য পুকুর থেকে ০-৪০ টি চিংড়ির দৈর্ঘ্য ও ওজন মেপে গড় ওজন বের করতে হবে। পুকুরে দৈনিক কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন তা নিমাক্তে সুত্রের সাহায্যে বের করা যায়। দৈনিক মোট খাদ্যের পরিমাণ = বেঁচে থাকা চিংড়ির সংখ্যা × গড় ওজন × খাদ্য সরবরাহের হার(%)। বাস্তবে বাঁচার হার নির্ণয় করা একটি কঠিন কাজ। তবে পুকুরের সার্বিক অবস্থাদি ঠিক থাকলে পোনা মজুদের ১-২ সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচার হার ৯০% এবং সম্পূরক খাদ্য গ্রহণের সময় বাঁচার হার ৭০% প্রত্যাশা করা যায়। সাধারণত ৭-১০ দিন পর পর চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ও বাঁচার হার নির্ণয় করা হয়। অন্যদিকে প্রতিদিনই চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি হয়। তাই একবার নমুনা সংগ্রহ করে দৈহিক বৃদ্ধি ও বাঁচার হার নির্ণয় করে উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী নমুনা সংগ্রহ পর্যন্ত খাদ্য। সরবরাহ না করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির পরিমাণ হিসেব ধরেই খাদ্য সরবরাহ করা উচিত এবং এতে চিংড়ির উৎপাদনেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

গলদা চিংড়ির খাদ্য ব্যবহার হার

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
০২-০.১	১৫-১৩
১-২	১৩-১১
২-৩	১১-৯
৩-৪	৯-৭
৫-১৩	৭-৫
১৩-২০	৫-৩
২০-৩০	৩-২.৫

এফসিআর

খাদ্য সরবরাহের ফলে তা দৈহিক বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়তা হল তা জানার জন্য নিয়মিত প্রয়োজন এফসিআর (Food Conversion Ratic) নির্ধারণ চিংড়ি চাষের কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে এফসিআর হচ্ছে সে মূহূর্তে পর্যন্ত একটি পুকুরে সরবরাহকৃত সর্বমোট খাদ্য দ্বারা কী পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদিত হলো। কোনো একটি পুকুরে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ২০০ কেজি খাদ্য সরবরাহ করে ১০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হলে সে মুহূর্তে এফসিআর হচ্ছে ১০০:২০০= ১:২ অর্থাৎ ২ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করে ১ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে।

পুকুরে পোনা মজুদের হার, খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ, খাদ্যের গুণাগুণ এবং আহরণকালে চিংড়ির আকারের ওপর সাধারণত এফসিআর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত চিংড়ি চাষের শেষ পর্যায়ে এফসিআর ২ এর বেশি হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। চিংড়ি চাষের প্রথম দিকে সাধারণত চিংড়ি দ্রুত বাড়ে ফলে প্রথম দিকে এফসিআর চাষের শেষের দিকের চেয়ে তুলনামুলকভাবে কম হয়।

খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা

মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার নির্ভর করে মূলত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ের উপর। বড় মাছ ও চিংড়ির চেয়ে ছোট অবস্থায় এদের খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি। সে কারণে উৎপাদন পুকুরে প্রথম দিকে বেশি মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে মাছ ও চিংড়ি বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ হার কমে গেলেও মোট খাদ্যের পরিমাণ তুলনামূলক

২০২২

ভাবে বেড়ে যায়। নিচের সারণিতে উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের নমুনা মাত্রা উল্লেখ করা হলো

- জুভেনাইল মজুদ করা হলে মাছ ও চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৫% (খৈল, কুঁড়া, ফিসমিল জাতীয় খাবার)
- পিএল মজুদ করা হলে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্টার্টার ফিড
- ৪ সপ্তাহ পর থেকে খৈল, কুঁড়া, ফিসমিল জাতীয় খাদ্য
- খাবার মাছ ও চিংড়ির দেহ ওজনের ১০-৫%

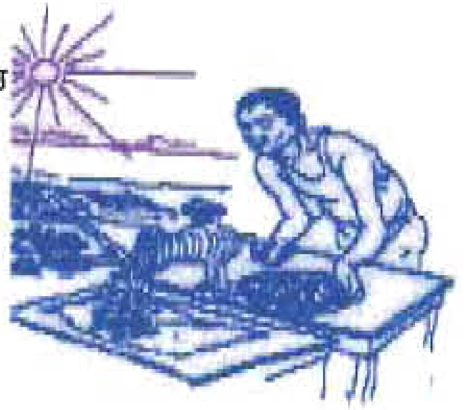

স্টার্টার ফিডের সুপারিশকৃত মাত্রা

১ম সপ্তাহ ২০ গ্রাম/১০০০ পিএল

২য় সপ্তাহ ৪০ গ্রাম/১০০০ পিএল

৩য় সপ্তাহ ৬০ গ্রাম/১০০০ পিএল

৪র্থ সপ্তাহ ৮০ গ্রাম/১০০০ পিএল

সম্পূরক খাদ্য তৈরি

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরি করা যায়। চাষি নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিনসিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো

- খৈল কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপর থেকে ভাসমান তৈলযুক্ত পানি ফেলে দিতে হবে
- চালের কুঁড়া, ভুষি ও ফিসমিল ভালোভাবে চালুনি দ্বারা চেলে নিতে হবে।
- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে।
- সমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমাণমতো পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরি করতে হবে।
- উপকরণগুলো আঁঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাই তৈরি করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। অপরদিকে গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহণ করতে পছন্দ করে। সেজন্যে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দুভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাট কাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট উপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে।

সবুজ খাদ্য প্রয়োগ

গ্রাসকার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশ বা অন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি চৌকোণাকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে দেয়া ভালো। ফ্রেমটি পাড়ের ১-২ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্যে ফ্রেমের সাধারণ মাপ হচ্ছে ১ বর্গমিটার। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো টুকরো করে ফ্রেমের মধ্যে দিতে হয়। খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হবে।

খাদ্যদানী

খাদ্যদানী (ট্রে) তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তা ছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়। এটির আকার ১ বর্গমিটার অথবা ৮০ × ৮০ সেমি হতে পারে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নিচে মশারির কাপড় লাগিয়ে ধর্ম জালের মতো করে তা তৈরি করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সেমি রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬ টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। খাদ্যদানী ব্যবহার করা হলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- মাঝে মাঝে খাদ্যদানী উঠিয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পুনরায় নির্ধারণ করতে হবে।
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. চিংড়ির খাদ্য কয় প্রকার ?
২. পুকুরে সবল চিংড়ির কখন দুর্বল চিংড়িকে আক্রমণ করে ?
৩. ক্ল্যাডোফোরা কোন ধরনের শেওলা ?
৪. কোন ধরনের শেওলা চিংড়ির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ?
৫. ডাফনিয়া,ময়না প্রভৃতি কোন জাতীয় প্রাণীপ্ল্যাংকটন ?
৬. সাইক্লপস, ডায়পটোমাস প্রভৃতি কোন জাতীয় প্রাণীপ্ল্যাংকটন ?
৭. আর্টিমিয়া কত দিন বয়সে পরিপক্বতা লাভ করে ?
৮. কত লবণাক্ততায় আর্টিমিয়া সরাসরি বাচ্চা দেয় ?
৯. চিংড়ি চাষের প্রথম মাসে প্রতিটি ফিডিং ট্রেতে কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাণী প্ল্যাংকটন চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২. সমন্বিতভাবে আর্টিমিয়া উৎপাদনের জন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি লেখ।
৩. সম্পূরক খাদ্য মজুদ রাখার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪. প্রতিদিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সূত্রটি লেখ।
৫. চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ার বিভিন্ন কারণগুলো লেখ।
৬. এফসিআর কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ির খাদ্যচক্রটি লেখ।
২. ডায়াটম নামক শেওলার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত আটিমিয়ার ডিম ও আর্টিমিয়ার সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. কৃত্রিম উপায়ে আর্টিমিয়া উৎপাদনের যে কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. এফসিআর নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২০২২

অষ্টম অধ্যায়

সমন্বিত চিংড়ি চাষ

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমন্বিত চিংড়ি চাষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমন্বিত চিংড়ি চাষ এদেশে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মিঠা পানির গলদা চিংড়ি বাংলাদেশের প্রায় সব বদ্ধ জলাশয়েই রুইজাতীয় মাছের সাথে চাষ করা সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে ধানের সাথে বা ধান চাষের পর ধান ক্ষেতে এককভাবে চিংড়ি চাষ করা যায়। কক্সবাজার অঞ্চলে একই জমিতে পর্যায়ক্রমে লবণ ও লোনা পানির বাগদা চিংড়ি চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সকল মিঠা পানির পুকুরেই বর্তমানে কার্পের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ করা হচ্ছে। পোনার স্বল্পতার কারণেই দেশের সকল পুকুরে এখনও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বা একক চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। গলদা চিংড়ির পোনার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে বাঁধ দেয়া নিচু ধানক্ষেত, অগভীর পুকুর, বাঁওড়ের অগভীর অংশ, রাস্তা ও রেললাইনের পাশের খাল, সেচ খাল, ইত্যাদি মিঠাপানির জলাশয়ে গলদা চিংড়ি কার্প জাতীয় মাছের সাথে চাষ করা যায়।

মিশ্র চাষের সুবিধা

- পুকুরের সকল স্তরের খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয়
- চিংড়ির দাম বেশি বিধায় আনুপাতিক লাভ বেশি
- অগভীর পুকুর এবং মৌসুমী পুকুরেও চিংড়ি লাভজনকভাবে চাষ করা যায়
- প্রয়োজন অনুসারে ধানক্ষেতে খাল কেটে এক মৌসুমে মাছ ও চিংড়ি এবং অন্য মৌসুমে ধান চাষ করা যায়
- ৪-৫ মাসের মধ্যেই চিংড়ি বাজারজাত করা যায়

মিশ্র চাষ পুকুরের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত দুধরনের পুকুরে কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ করা যায়। যথা- (ক) বাৎসরিক পুকুর ও (খ) ঘের। তবে মৌসুমী পুকুরেও মিশ্র চাষ করা সম্ভব।

ক) বাৎসরিক পুকুর

সাধারণত যে কোনো ধরনের বাৎসরিক পুকুর অথবা কম গভীর পুকুরেই গলদা চিংড়ি ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ করা যায়। মিশ্র চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১) পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতাংশ এবং বর্ষাকালে পানির গভীরতা ১.৫-২.০ মিটারের মধ্যে থাকা উচিত

(২) পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পুকুরের পাড়ে যেন বড় গাছপালা না থাকে । সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে

(৩) পুকুর পাড়ের ঢাল ১ ও ২ এবং তলদেশ সমান হতে হবে। পুকুরের তলায় ২০ সেমি এর বেশি পচা কাদা থাকা মিশ্র চাষের জন্য ভালো নয়।

২০২২

(৪) পুকুরের পাড় মূল ভূমি থেকে কমপক্ষে ৩০ সেমি উঁচু থাকা ভালো। এর ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারবে না।

(৫) মিশ্র চাষের জন্য দোআঁশ মাটির পুকুর সবচেয়ে ভালো। এঁটেল মাটির পুকুরের পানি ঘোলা থাকে, ফলে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা অত্যন্ত কম বিধায় চিংড়ি বা মিশ্র চাষের জন্য বেলে মাটির পুকুর ভালো নয়।

(খ) ঘের

ঘের বলতে এমন এক খন্ড জমিকে বুঝায় যার ভেতর খাল কেটে চারদিকে বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালে চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ এবং শীতকালে ধান চাষ করা হয়। মিশ্র চাষের এসব খামারকে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে ঘের বলা হয়।

ঘেরের বৈশিষ্ট্য

(১) ৫০-৬০ শতাংশ আয়তনের আয়তকার পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য ভালো

(২) ঘের ৪টি অংশে বিভক্ত, যথাপাড়, বকচর, খাল ও সমতল ভূমি বা ধানচাষ এলাকা। পুকুরের মোট আয়তনের ২৫-৩০% পাড়, ৫% বকচর, ২৫-৩০% খাল এবং ৩৫-৪৫% সমতল ভূমি বা ধানচাষ এলাকা থাকা উচিত। দোআঁশ বা এঁটেল মাটি ঘেরের জন্য সবচেয়ে ভালো।

(৩) বন্যামুক্ত ও সূর্যালোকিত স্থান ঘেরের জন্য উত্তম।

(৪) এসব ঘেরে সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে চিংড়ি ও কার্পের পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে এবং অক্টোবর/নভেম্বর মাস থেকে চিংড়ি ও মাছ আহরণ করা হয়। চাষকালে ঘেরের ভেতর মোট ১.৫ মিটার পানি থাকা বিশেষ প্রয়োজন তবে ধানক্ষেতের ওপর ০.৫ মিটারের বেশি পানি থাকা উচিত নয়।

(৫) নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে ধানক্ষেত থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর ঘেরে ধান চাষ করা যায়। এসব ঘেরে সাধারণত বোরো ধান আবাদ করা হয়। এই ঘেরের একই জমি থেকে চিংড়ি, মাছ ও ধান এবং পাড়ে শাকসবজি উৎপাদন করা যায়।

মিশ্র চাষে প্রজাতি নির্বাচন

বাংলাদেশে মিঠা পানিতে প্রায় ২৬০টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া আরও ১২টি প্রজাতির বিদেশি মাছ পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। গলদা ও কার্পের মিশ্র চাষে সব মাছই লাভজনক নয়। মিশ্র চাষে কার্পের প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- পুকুরে বসবাসযোগ্য এবং প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে।
- মিশ্র চাষের জন্য নির্বাচত প্রজাতিগুলো দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে
- খাদ্য ও বাসস্থলের ব্যাপারে যেন প্রজাতিগুলো একে অপরের প্রতিযোগী না হয়।
- অরাক্ষুসে স্বভাবের এবং রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হতে হবে।
- বাজারে চাহিদা থাকতে হবে এবং বাজার মূল্য ভালো হতে হবে।
- এসব বিষয় বিবেচনায় মিশ্র চাষে চাষযোগ্য কার্প প্রজাতিগুলো হচ্ছে

  দেশি কার্প: কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউশ/বাটা

  বিদেশি কার্প: সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, বিগহেড কার্প, কার্পিও ও সরপুঁটি।

২০২২

মিশ্র চাষে প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে চিংড়ির সাথে যাতে কোনো মাছ প্রতিযোগিতায় না আসে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিভিন্ন মাছ পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করে এবং বাসস্থান অনুযায়ী মাছের খাদ্যাভ্যাসও বিভিন্ন হয়ে থাকে। মিশ্র চাষের উপযোগী বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস নিচে বর্ণনা করা হলো:

মাছ	প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য	খাদ্যাভ্যাস
কাতলা	প্ল্যাংকটন	উপর ও মধ্যস্তর
সিলভার কার্প	ফাইটোপ্ল্যাংকটন	উপরস্তর
গ্রাসকার্প	জলজ উদ্ভিদ- প্রধাণত	উপরস্তর ও সর্বস্তর
বিগহেড	জুপ্ল্যাংকটন	উপর ও মধ্যস্তর
রুই	জুপ্ল্যাংকটন,পচা জৈব পদার্থ	উপর ও মধ্যস্তর
মৃগেল	জুপ্ল্যাংকটন,পচা জৈব পদার্থ	মধ্যও নিম্নস্তর
	তলদেশের কীট	
কালিবাউশ	জুপ্ল্যাংকটন,পচা জৈব পদার্থ	নিম্নস্তর
	তলদেশের কীট	
মিরর কার্প/কার্পিও	জুপ্ল্যাংকটন,পচা জৈব পদার্থ তলদেশের কীট	নিম্নস্তর
সরপুঁটি	জুপ্ল্যাংকটন ও ফাইটোপ্ল্যাংকটন	মধ্য ও উপরস্তর

আবার বিভিন্ন মাছের তাপমাত্রার সহনশীলতা, অক্সিজেনের চাহিদা এবং প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর অবস্থাও বিভিন্ন। সাধারণত কার্প জাতীয় মাছের বৃদ্ধি ২৮- ৩১° সে. তাপমাত্রায় ভালো হয়। তবে ১১° সে. তাপমাত্রার নিচে মাছ কম খায় এবং ৯° সে. তাপমাত্রার নিচে মাছ খাদ্য গ্রহণ একেবারেই বন্ধ করে দেয়।

বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা নিম্নরূপ

প্রজাতি	তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা (সে.)
কাতলা, রুই, মৃগেল	২০-৩৮° সে.
সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প	২৫-৩৫° সে.
কার্পিও	২০-৩০° সে.

মিশ্র চাষে প্রধান প্রজাতি হচ্ছে গলদা চিংড়ি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রজাতিসমূহ হচ্ছে কাতলা, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প/সরপুঁটি ও রুই। গলদা পুকুরের নিম্নস্তর বা তলদেশের প্রাণী বলে কালিবাউশ, মৃগেল, মিররকার্প, কার্পিও ইত্যাদি পুকুরে না ছাড়াই ভালো। কারণ এসব মাছ চিংড়ির সাথে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে প্রতিযোগী।

মিশ্র চাষে পানির গুণাগুণ

মাছ ও চিংড়ির বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য পানির গুণাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে পানির গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণগুলোর উত্তম মাত্রা নিম্নরূপ-

পানির গুণাগুণ	মাত্রা
পিএইচ	৭-৯
তাপমাত্রা	২৮° - ৩১°সে.
খরতা	৪০-২০০ পিপিএম
ক্যালসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
লৌহ	০.০২ পিপিএম
ঘোলাত্ব	শুন্য
অক্সিজেন	৫-৭ পিপিএম
ফসফরাস	০.১৫ পিপিএম
মোট দ্রবীভূত পদার্থ	৩০০ পিপিএম

মিশ্র চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতি ৩ ধরনের হতে পারে; যথা-

(ক) ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদঃ এই চাষাবাদ পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুর থেকে দূর করা হয় না, মজুদ ঘনত্বের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম মানা হয় না, পানি পরিবর্তন ও অক্সিজেন সরবরাহের কোন ব্যবস্থা থাকে না এবং কোনো সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয় না তবে মাঝে মধ্যে সার প্রয়োগ করা হয়।

(খ) আধানিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদঃ এই পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মধ্যম মানের মজুদ ঘনত্বে পোনা মজুদ, নিয়মিত সার প্রয়োগ, পানি পরিবর্তন ও অক্সিজেন সরব রাহের ব্যবস্থা এবং হাতে তৈরি খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর থেকে প্রয়োজনে মাছ বা চিংড়ি ধরা শুরু করা যায়।

(গ) নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদঃ নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ ও নিয়মিতভাবে উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। পুকুরের পানি নিয়মিতভাবে পরিবর্তন করার ও অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

গলদা চিংড়ি-কার্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

এই মিশ্র চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যথা-

(১) মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

(২) মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

(৩) মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা

(১) মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা: পোনা মজুদের পূর্বে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারলে লাভজনকভাবে মিশ্র চাষ করা সম্ভব

(ক) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ নিয়ন্ত্রণ

রাক্ষুসে মাছ যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, কাকিলা, বাইলা, টাকি, মাগুর ইত্যাদি মাছ মিশ্র চাষের জন্য নির্বাচিত মাছের পোনাকে খেয়ে ফেলে বলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। অবাঞ্ছিত মাছ যেমন, মলা, ঢেলা, চাপিলা, পুঁটি, চান্দা ইত্যাদি মাছ চাষকৃত মাছের খাদ্য নষ্ট করে এবং আবাসস্থল দখল করে ফলে, মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এছাড়া রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত উভয় মাছই পুকুরে রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটায় এবং আবাসস্থলের প্রতিযোগী হিসেবে কাজ করে। পুকুর শুকিয়ে কিংবা পুকুরে বিভিন্ন ধরনের বিষ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করা যায়।

(খ) পুকুর মেরামত ও পরিষ্কার

বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরই বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে যায়। ফলে পুকুরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ প্রবেশ করে। আবার পুকুরের তলা অসমান থাকলে মাছ আহরণ করতে অসুবিধা হয়। পুকুরের উপর বড় গাছের ডালপালা ও পাড়ে বিভিন্ন গাছপালা বা জঞ্জাল থাকলে সূর্যের আলো কম পড়ে, পাতা পচে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা মাছ ও চিংড়ি আক্রান্ত হয়। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ থাকলে বিষাক্ত গ্যাস বিশেষ করে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয় যা মাছ ও চিংড়ির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফলে গ্রীষ্মকালে বিশেষ করে চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে পুকুরে যখন পানি কম থাকে এবং সূর্যের তাপ বেশি থাকে তখন মাছ ও চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। পুকুর শুকানোর পর ভাঙ্গা পাড় ও অসমান তলা মেরামত করতে হবে। পুকুর পাড়ের জঙ্গল ও গাছের ডালপালা কেটে ফেলতে হবে এবং অতিরিক্ত পচা কাদা অবশ্যই তুলে ফেলতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমিকের মূল্য অত্যন্ত কম বলে এসব কাজ কায়িক শ্রমের মাধ্যমে করাই উত্তম। এতে চাষির অর্থের সাশ্রয় হয়।

(গ) নেট স্থাপন ও মেরামত

পুকুরে পানি সরবরাহ ও বহির্গমনের ব্যবস্থা থাকলে উভয় পথে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নেট স্থাপন করতে হবে। এর দ্বারা রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ প্রতিরোধ করা যায়। পানি সরবরাহের পথে দুস্তর বিশিষ্ট নেট ব্যবহার করা হয়। এর প্রথমটির জালের ফাঁস হবে ১.৫ মিমি এবং দ্বিতীয়টি ফাঁস হবে ০.৫ মিমি। বহির্গমন পথে সাধারণত ১.৫ মিমি ছিদ্রযুক্ত একটি নেট ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) চুন প্রয়োগ

মিশ্র চাষের পুকুরে চুন প্রয়োগের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

- মাটি ও পানির পিএইচ ৬ এর ওপর রাখা
- ক্ষারত্বের মাত্রা ২০ মিগ্রা/লিটার এর বেশি রাখা
- বিষাক্ত গ্যাস ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা
- পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহে কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ চুন পাওয়া যায়, যেমন- পাথুরে চুন, পোড়া চুন, কলি চুন ইত্যাদি। পুকুরের তলায় পচা কাদা থাকলে ডলোমাইট ব্যবহার করা ভালো কিনতু ডলোমাইট বাজারে সহজপ্রাপ্য নয়।

সারণি: বিভিন্ন প্রকার চুন

স্থানীয় নাম	ইংরেজি নাম	রাসায়নিক ফর্মুলা
পাথুরে চুন	Limestone	$CaCO_3$
কলি চুন	Slaked lime	$Ca(OH)_2$
পোড়া চুন	Quick lime	CaO
ডলোমাইট	Dolomite	$CaMg(CO_3)_2$
জিপসাম	Gypsum	$CaSO_4\ 2H_20$

চুন প্রয়োগের মাত্রা

মাটির পিএইচ ও চুনের ধরনের ওপর নির্ভর করে চুন প্রয়োগের মাত্রা। এজন্য চুন প্রয়োগের আগে মাটির পিএইচ পরীক্ষা করা দরকার। পোড়া চুনের ক্ষমতা পাথুরে চুনের দ্বিগুণ।

সারণি: পুকুরে চুনের ব্যবহার মাত্রা

পিএইচ মান	পাথুরে চুন	পোড়া চুন
৩-৫	১২ কেজি/শতাংশ	৬ কেজি/শতাংশ
৫-৬	৮ কেজি/শতাংশ	৪ কেজি/শতাংশ
৬-৭	৪ কেজি/শতাংশ	২ কেজি/শতাংশ

প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ চুন একটি বস্তায় নিয়ে ভালোভাবে গুঁড়া করে অথবা মাটির চাড়ি/অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে পানি নিয়ে তার মধ্যে ভালাভাবে গুলে নিতে হবে। তারপর চুন বা চুনগুলা পানি পাড়সহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলদেশে চাষ দেয়ার ২-৩ দিন পর অথবা বিষ প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর পুকুরে চুন ও কলিচুন অত্যন্ত ক্ষারীয় বলে এদের ব্যবহারে পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়। এজন্য শুকনো পুকুরে পোড়া চুন ও কলিচুন ব্যবহার করা ভালো। পানির ক্ষারত্ব ও খরতা ২০ পিপিএম-এর নিচে হলে এবং পিএইচ ৭ এর কম হলে পাথুরে চুন বা ডলোমাইট ব্যবহার করা উচিত।

(ঙ) পুকুরে সার প্রয়োগ

পুকুরে সাধারণত দুই ধরনের সার প্রয়োগ করা হয়, যথা- জৈব ও অজৈব সার। পুকুরের উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য মূলত এই সার ব্যবহার করা হয়।

জৈব সার: জুপ্ল্যাংকটন ও ব্যাকটেরিয়া জৈব সারকে সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এই সার পানিতে অজৈব পুষ্টি মুক্ত করে ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদনে সাহায্য করে। জৈব সার হিসেবে গোবর সার মিশ্র চাষের পুকুরে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। এছাড়া পুকুর প্রস্তুতির সময় হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা যায়।

২০২২

অজৈব সার: পুকুরে অজৈব সার প্রয়োগের ফলে ফাইটোপ্লাংকটন উৎপাদন হয়। জুপ্ল্যাংকটন এই ফাইটোপ্লাংকটনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত অজৈব সার হিসেবে ইউরিয়া চাষের পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসেরা এবং ১২-১০ দিনের মধ্যে কপিপোডের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। পুকুরে পোনা মজুদের সম্ভাব্য সময়সূচি জেনে সার প্রয়োগ করা উচিত। এর ফলে সার প্রয়োগে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং চিংড়ির ভালো উৎপাদন আশা করা যায়।

পুকুর প্রস্তুতকরণের সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

পুকুরের উৎপাদনশীলতার ওপর সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ভর করে। উৎপাদনশীলতার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে যে কোনো একটি জৈব সার ব্যবহার করলেই চলে। অজৈব সার বিশেষ করে ইউরিয়া ও টিএসপি উভয় সারই এক সাথে পুকুরে প্রয়োগ করা হয়।

সারণি: পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে সার প্রয়োগের মাত্রা

সার	**প্রয়োগের মাত্রা কেজি/শতাংশ)**
গোবর অথবা	৫-৭
কম্পোস্ট অথবা	৮-১০
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	৩-৫
ইউরিয়া	০.১০-০.১৫
টিএসপি	০.০৫-০.০৭৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুরের ওপর ভিত্তি করেই সার প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। শুকনো পুকুর ও পানি ভর্তি পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি এক রকম নয়:

(১) শুকনো পুকুর

প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার শুকনো পুকুরের সমস্ত অংশে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনানুসারে এই সারের সাথে ০.৫ কেজি/শতাংশ হারে সরিষার খৈলও মিশিয়ে দেয়া যায়। পানি ভর্তির পর অজৈব সার পানিতে গুলে পুকুরে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়।

(২) পানি ভর্তি পুকুর

পানি ভর্তি পুকুরে সাধারণত তিন ধরনের সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তিন ধরনের সার একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে একটি পাত্রে রাখতে হবে। তারপর এই পাত্রে তিনগুণ পানিতে মিশ্রিত সার ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ১২-১৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর সারের দ্রবণ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

২০২২

পুকুর প্রস্তুতির সময় চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর অথবা পুকুরে পোনা মজুদের ৮-১০ দিন আগে সার প্রয়োগ করতে হয়। মটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় পুকুরে ধৈঞ্চার নাইট্রোজেন মজুদ ক্ষমতা বেশি বলে এর চাষের ফলে পুকুরের মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে এবং প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বেশি হয়। এছাড়া ধৈঞ্চা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে। শুকনো অবস্থায় পুকুরের তলা ও পাড়ে এবং পানি ভর্তি অবস্থায় পুকুরের পাড় ও ঢালে ধৈঞ্চা বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়।

(চ) পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

পোনা মজুদের আগেই পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সাধারণভাবে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণের কাজটি কয়েকভাবে করা যায়। বাদামি সবুজ পানি মিশ্র চাষের জন্য ভালো তবে ঘোলা, ঘনসবুজ তামোট লাল বা স্বচ্ছ পানি মিশ্র চাষের জন্য ভালো নয়। পানির রং ঠিক আছে কিনা তা নিজের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পুকুরের পানির রং ঠিক থাকলে পানিতে পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা নিম্নবর্ণিত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(১) সেক্কি ডিস্ক: লাহোর থালা বা চাকতির মতো দেখতে ২০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট সেক্কি ডিস্কের রং সাদা-কালো। এটি ৩ রঙের সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। থালার গোড়া থেকে এই সুতার প্রথম ২০ সেমি লাল রঙের, তারপরের ১০ সেমি সবুজ রঙের এবং সর্বশেষ হাত ধরার ৮০-১০০ সেমি অংশ পর্যন্ত সাদা রঙের হয়ে থাকে।

ব্যবহার পদ্ধতি

পানিতে সেক্কি ডিস্কের লাল সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর থালার সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরে অতিরিক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। এ অবস্থা পুকুরে পোনা মজুদ করা, সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা ঠিক নয়। পানিতে সেক্কি ডিস্কের সবুজ সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পর থালার সাদা অংশ দেখা না গেলে বুঝতে হবে পুকুরের পানিতে পরিমিত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। এ অবস্থায় পুকুরে পোনা মজুদ করা সবচেয়ে ভালো। এ অবস্থা বজায় রাখার জন্য পুকুরে নিয়মিত সার ও খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে আর সেক্কি ডিস্কের সবুজ সুতা পর্যন্ত ডুবানোর পরও থালার সাদা অংশ দেখা গেলে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। ঘোলা পানিতে সেকি ডিক কার্যকারিতা থাকে না। সকাল ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে সেক্কি ডিস্ক ব্যবহার করা উচিত।

(২) গ্লাস: সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পরিষ্কার কাচের গাসে পুকুর থেকে পানি নিতে হবে। পুকুরের পানি ভর্তি গাসটি সূর্যের আলোতে ধরতে হবে। যদি গাসের মধ্যে ৫-১০ টি প্রাণিকণা চলাফেরা করতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

(৩) হাত: সবুজাভ/লালচে সবুজ পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবানোর পর যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

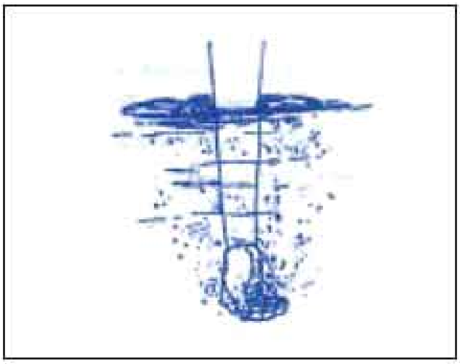

চিত্রঃ পানিতে কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে খাদ্য পরীক্ষা

চিত্রঃ গ্লাসে পানি নিয়ে খাদ্য পরীক্ষা

(ছ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে পোনা মজুদের ১-২ দিন আগে পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পানিতে কোন প্রকার বিষক্রিয়া আছে কিনা তা জানার জন্য পুকুরে একটি হাপা টাঙ্গিয়ে তার মধ্যে ১০-১৫ টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে পোনা মারা না যায়, তবে বুঝতে হবে পানি বিষক্রিয়া মুক্ত এবং এভাবে বালতি বা হাড়িতেও পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করা যায়।

(জ) চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

খোলস পরিবর্তন করে চিংড়ি বড় হয়। খোলস পরিবর্তনের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে বলে এ সময় চিংড়ির আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। পুকুরের তলায় কিছু উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এসব আশ্রয়স্থল চিংড়ি ও মাছকে চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করে থাকে। পুকুরের তলায় উদ্ভিদ না থাকলে আশ্রয়স্থল হিসেবে পুকুরে তাল, নারিকেল বা খেজুর গাছের শুকনো পাতা, বাঁশ, গাছের ডালপালা আশ্রয়স্থলের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চিংড়ির আশ্রয়স্থলের উপকরণ হিসেবে প্লাস্টিকের ভাঙ্গা টুকরা, কঁপা ইট, ভাঙ্গা কলস ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়। এসব উপকরণ পুকুরের তলায় এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন উপকরণের কিছু অংশ পুকুরের তলা থেকে একটু উপরমুখী থাকে। পোনা মজুদের ১ দিন আগে প্রতি ২ শতাংশে একটি করে তাল বা নারিকেল গাছের ডাল স্থাপন করে আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করা যায়।

(২) মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা মূলত ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত। এই কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে পোনার মৃত্যুহার বহুলাংশে কমানো সম্ভব। এর ফলে সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত হয়। পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজগুলো নিচে বর্ণনা করা হল:

(ক) প্রজাতি ও পরিমাণ নির্ধারণ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়:

২০২২

পোনার প্রাপ্যতা

মিশ্র চাষে ৪-৬ ধরনের কার্পের পোনার প্রয়োজন হয়। এসব পোনা একই এলাকায় একই সময়ে পাওয়া নাও যেতে পারে। এজন্য এলাকাগত প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে কার্পের পোনার জাত নির্বাচন করা উচিত। একইভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে এবং যেখানে গলদা চিংড়ির হ্যাচারি আছে সেখানে গলদার পোনা পাওয়া যায় অর্থাৎ পোনার প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করেই মিশ্র চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

পুকুরের উৎপাদনশীলতা

পুকুরের উর্বরা শক্তি বা উৎপাদনশীলতা মাটির গুণাগুণের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে মাটির গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। দোআঁশ মাটির উৎপাদনশীলতা বেলে, এঁটেল ও লাল মাটির চেয়ে অনেক বেশি। ফলে দোআঁশ মাটির পুকুরে অন্যান্য মাটির পুকুরের তুলনায় বেশি পোনা মজুদ করা যায়। সুতরাং মাটি ও পানির গুণাগুণ ভেদে পুকুরে পোনা মজুদের ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে। এজন্য পুকুর তৈরির সময় পুকুরের মাটির প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা একান্তভাবে দরকার।

কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন আকার

বাংলাদেশে সাধারণত গলদা ও কার্প মিশ্র চাষ ১-১.৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পুকুরে করা হয়। ফলে শুষ্ক মৌসুমে এসব মিশ্র চাষের অধিকাংশ পুকুরে পানি অনেক কমে যায়। আবার অনেক পুকুর একেবারেই শুকিয়ে যায়। এই সমস্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় মিশ্র চাষের জন্য প্রকৃতপক্ষে সময় পাওয়া যায় ৫-৮ মাস। এই অল্প সময়ে বড় আকারের পোনা মজুদ করতে হবে। এসব পুকুরে বেশি ঘনত্বে ছোট আকারের পোনা মজুদ করলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎপাদন লাভ করা সম্ভব হবে না।

ব্যবস্থাপনার ধরন

চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। পুকুরে শুধু সার প্রয়োগ করা হলে সেখানে মজুদ ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম হবে। আবার যেসব পুকুরে সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহার করা হবে সেসব পুকুরে পোনার মজুদ ঘনত্ব বেশি হবে।

পোনার আকার ও ঘনত্ব

পুকুরে ১০-১৫ সেমি আকারে কার্প জাতীয় পোনা এবং ৫ সেমি আকারের গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। পুকুরে সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে পোনা মজুদ করা হয়। এ সময় সচরাচর বড় আকারের পোনা পাওয়া যায় না। পুকুরে ৭-১০ সেমি আকারের কার্পের পোনা এবং ৩-৪ সেমি আকারের গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা হলে শতাংশ প্রতি ২২-২৪টি কার্প জাতীয় পোনা এবং ৩২-৩৫টি গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা যায়। বড় আকারের পোনা মজুদ করলে মজুদ ঘনত্ব ছোট আকারের ঘনত্বের চেয়ে ২০-২৫% কম হবে।

২০২২

সারণি: মাছ ও গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ ঘনত্ব (শতাংশ প্রতি)

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪
কাতলা	৪-৫	১০-১১	-	৬-৭
সিলভার কার্প	৯-১০	-	৯-১০	৭-৮
বিগহেড কার্প	-	-	৯-১০	-
গ্রাস কার্প	১-২	১-২	৪-৫	-
রুই	৭-৮	৭-৮	৭-৮	৭-৮
সরপুঁটি	১-২	১-২	-	১-২
গলদা চিংড়ি	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫
মোট	৫৫-৬০টি	৫৫-৬০টি	৫৫-৬০	৫৫-৬০

(খ) পোনা শনাক্তকরণ

কার্পের পোনা আমাদের কাছে অতি পরিচিত। এদের শনাক্তকরণে তেমন কোনো সমস্যা নেই। গলদা চিংড়ির পোনা সকলের কাছে পরিচিত নয়। চাষযাগ্যে নতুন প্রজাতি হিসেবে গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গলদা চিংড়ির পোনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। গলদা চিংড়ির পোনার বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হলো:

অবস্থা	দৈহিক বৈশিষ্ট্য	অবস্থান
লার্ভা (১১তম পর্যায়)	রোস্ট্রামের উপরের দিকে ৩/৪ টি দাঁত থাকে এবং ৫/৭ মিমি লম্বা হয়	আধা লবণাক্ত পানি
ছোট পোস্ট লার্ভা (পিএল)	রোস্ট্রামের ওপর ও নিচে দাঁত থাকে। দেখতে বচ্ছ এবং মাথায় একটি হাল্কা বাদামি রঙের দাগ থাকে	আধা লবণাক্ত পানি এবং মিঠা পানি
বড় পোস্ট লার্ভা	১.৫-২.০ সেমি লম্বা পানোর মাথার অংশ হালকা কমলা রঙের। মাথায় লম্বালম্বি ৬-৮টি কালো দাগ থাকে	মিঠা পানি
কিশোর চিংড়ি (জুভেনাইল)	গলদা চিংড়ির দেহ নীলাভ সবুজছাই রঙের দেহের দ্বিতীয় খণ্ডকের খোলস প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডকের খোলসকে আংশিক ঢেকে রাখে। রোস্ট্রামের ওপরের দিকে ১৩-১৪টি এবং নিচের দিকে ১১-১৩ টি দাঁত থাকে	মিঠা পানি

(গ) ভালো ও খারাপ পোনা শনাক্তকরণ

উৎপাদন নিশ্চিত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে সুস্থ সবল পোনা পুকুরে মজুদ করা। এজন্য ভালো ও খারাপ পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভালো ও খারাপ পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

কার্প

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভালো পোনা	খারাপ পোনা
চলাফেরা	চঞ্চল	স্থির
আঁইশ	ঝকঝকে	ফিকে
বিজল	পিচ্ছিল	খসখসে
শরীরে দাগ	কোনো দাগ নেই	দেহ, পাখনা ও ফুলকায় লাল দাগ

চিংড়ির পিএল

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভালো পোস্ট লার্ভা	খারাপ পোস্ট লার্ভা
• দেহের রং	নীলাভ বাদামি/ছাই	লালচে কমলা
• খোলস	পরিষ্কার	নোংরা
• গোল পাত্রে রেখে	স্রোতের বিপরীতে	পাত্রের মাঝখানে
• স্রোত সৃষ্টি করলে	সন্তরণশীল	জমা হয়ে যায়
• খোলসের দাগ	প্রতিটি খন্ডাংশে আড়াআড়ি দাগ থাকে	দাগগুলো অস্পষ্ট
• খাদ্য	পেট খাদ্য ভর্তি	পেট খালি
• পেশী	লেজের নিকটবর্তী খন্ডাংশে	লেজের পেশি ছাই রঙের
	পেশি ভালো ও পরিষ্কার	

(ঙ) পোনা শোধন

রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পুকুরে মজুদ করার আগে পোনাগুলো জীবাণুমুক্ত করা দরকার। একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পরিমাণ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। প্যাকিং করার আগে উক্ত দ্রবণে পোনাগুলোকে ১ মিনিট গোসল করাতে হবে। পোনাকে গোসল করানোর আগে পাত্রটির মধ্যে একটি ঘন জাল রেখে তার ওপর পোনা ছাড়তে হয়। পোনা পরিবহনের পরেও এ কাজটি করা যেতে পারে। উক্ত দ্রবণে প্রতিবার ৩০০-৫০০ টি করে পোনা প্রায় ৫ বার গোসল করানো যায়।

(ছ) পোনা ছাড়ার সময়

মৃদু ঠান্ডা আবহাওয়ায় অর্থাৎ সকাল বা বিকেল বেলায় পুকুরে পোনা মজুদ করা ভালো। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে, মেঘলা দিনে বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়। চিংড়ির পোনা সাধারণত সন্ধ্যার পর ছাড়া সবচেয়ে নিরাপদ।

২০২৫

(৩) মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে পোনা মজুদের পর বেশ কিছু কাজ করতে হয় যা মিশ্র চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোনা মজুদের পর এই সমস্ত কাজকে ৬টি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ

(খ) সার প্রয়োগ

(গ) সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

(ঘ) বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ

(ঙ) আহরণ

(চ) বাজারজাতকরণ

(ক) পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ

পরিবহন পীড়নের কারণে দুর্বল বা রোগাক্রান্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে। পোনা মারা গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পোনা পানির ওপরে ভেসে উঠে। এসব মৃত পোনা ঢেউ এর ধাক্কায় পাড়ের কাছাকাছি চলে আসে। পুকুরে পোনা মজুদের ৬-৮ ঘণ্টা পর পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এভাবে মৃত পোনার পরিমাণ বের করে সমসংখ্যক পোনা মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) সার প্রয়োগ

পোনা ছাড়ার পর পুকুরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছ ও চিংড়ির ভালো উৎপাদন পাওয়া যায় না। এজন্য ফলন পেতে পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়। পুকুরে দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক কিস্তিতে এই সার প্রয়োগ করা যায়। মিশ্র চাষকালে পুকুরের পানির রং অবশ্যই হালকা সবুজ, লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ রাখতে হবে। আর এই কাজটি নিয়মিত সার প্রয়োগের মাধমেই সম্পন্ন করা হয়। সাধারণভাবে সূর্যালোকিত দিনের দুপুরে পানির রং পর্যবেক্ষণ করা উচিত। মিশ্র চাষের পুকুরে সেক্কি ডিস্কের দৃশ্যমানতা অবশ্যই সবুজ সুতা বা ২৫-৩০ সেমি-এর মধ্যে রাখা উচিত। সেক্কি ডিস্কের দৃশ্যমানতা ৩০ সেমি এর বেশি হলেই পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২

সারণি: মজুদ পরবর্তী দৈনিক সার প্রয়োগের মাত্রা (শতাংশে)

সার	মাত্রা
গোবর অথবা	২০০-২৫০ গ্রাম
কম্পোস্ট অথবা	৩০০-৪০০ গ্রাম
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	১৫০-২০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	৩ গ্রাম

শীতকালে পানির তাপমাত্রা ১১° সে এর নিচে নেমে গেলে পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। কারণ পানির তাপমাত্রা ১১° সে এর নিচে গেলে মাছ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেয়। ফলে এ অবস্থায় সার প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয় না। উপরন্তু অতিরিক্ত প্ল্যাংকটনের মড়কের ফলে পানি দূষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাপমাত্রা বিবেচনায় বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৩০০ দিন সার প্রয়োগ করা যায়। একটি বড় পাত্রে ৩ ধরনের সার ৩ গুণ পানির মধ্যে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর সারের মিশ্রণকে ভালোভাবে পানিতে গুলে নিতে হবে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের সকাল ১০-১১ টার সময় সারের দ্রবণটি পুকুরের সব জায়গায় পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(গ) সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ

পুকুরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ খাতেই চাষির সবচেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া মাছ ও চিংড়ির বর্ধিত উৎপাদন অনেকাংশে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। সম্পূরক খাদ্য মাছ ও চিংড়ির বাঁচার হার, লাভ-লোকসান এবং পানির গুণাগুণের ওপর প্রভাব ফেলে। পুকুরে সাধারণত প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি পূরণ এবং অল্প সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে পুকুরে চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল বা শামুকের মাংস, সরিষার খৈল, গবাদিপশুর রক্ত, কেঁচো, ক্ষুদিপানা অথবা অন্য কোন নরম জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করা যায়।

খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা

পুকুরে মাছ ও চিংড়ির ওজন এবং পানির তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। মাছ ও চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের হার হ্রাস পায়। পুকুরে সাধারণত এদের গড় ওজনের ৩-৫% হারে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২০২২

সারণি: মিশ্র চাষের পুকুরে গলদা চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের হার

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
০.২-১.০	১৫ - ১৩
১ - ২	১৩ - ১১
২ - ৩	১১ - ৯
৩ - ৫	৯ - ৭
৫-১৩	৭ - ৫
১৩-২০	৫ - ৩
২০-৩০	৩ - ২.৫
১-৫	১০
৫-১০	৫
১০-৫০	৪
৫০-৫০০	৩

স্থানীয় বাজারে কম দামে সহজেই পাওয়া যায় এমন উপকরণ দিয়ে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা উচিত। এতে খাদ্য খাতে ব্যয় অনেকটা কমানো যায়। সহজ প্রাপ্য ও স্বল্প মূল্যের দেশি উপকরণ নিম্নহারে ব্যবহার করে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়।

সারণি: খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের হার

উপকরণ	প্রয়োগের হার(%)
চাল/গমের ভুষি	২০%
সরিষার খৈল	৫০%
শামুকের মাংস	৩০%

খাদ্য উপকরণ হিসেবে শামুকের মাংস পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ফিসমিল ব্যবহার করা যায়। উপরোক্ত দেশি উপকরণে তৈরি খাদ্যে প্রায় ২৫-৩০% প্রোটিন থাকে যা মিশ্র চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। শতকরা হারে খাদ্যের ব্যবহারিক হার বা পরিমাণ নির্ধারণ করা চাষিদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ভর খাদ্য প্রয়োগের একটি সাধারণ নমুনা নিচে দেখানো হলো:

২০২২

সারণি: মিশ্র চাষে শতাংশ প্রতি দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ

মাস	গমের ভুষি (গ্রাম)	সরিষার খৈল (গ্রাম)	শামুকের মাংস (গ্রাম)	মোট
১ম	৬	১৫	৯	৩০
২য়	১০	২৫	১৫	৫০
৩য়	১৫	৩৫	২০	৭০
৪র্থ	২০	৪৫	২৫	৯০
৫ম	২০	৫০	৩০	১০০
৬ষ্ঠ	১৫	৩৫	২০	৭০
৭ম	১০	২০	১০	৪০
৮ম	১০	২০	১০	৪০
৯ম	১০	২৫	১৫	৫০

সম্পূরক খাদ্য তৈরি পদ্ধতি

মিশ্র চাষে সম্পূরক খাদ্য নিজের হাতেই তৈরি করা যায়। আবার মিনসিং মেশিনেও খাদ্য তৈরি করা যায়। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কার্প ও গলদা চিংড়ির জন্য খাদ্য তৈরি করা যায়।

কার্পের খাদ্য

চালের কুঁড়া বা গমের ভুষি এবং খৈল ব্যবহার করে কার্পের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়। উপরোক্ত সারণিতে নির্দেশিত খাদ্যের অর্ধেক ব্যবহার করে কার্পের খাদ্য তৈরি করা যায়। পরিমাণমত খৈল দ্বিগুণ পরিমাণ পানিতে একরাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। খৈল একরাত ভিজিয়ে রাখার পর পরদিন সকালে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কুঁড়া/ভুষি ভালোভাবে মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে। এই বলগুলো এমন শক্ত করতে হবে যাতে পানিতে প্রয়োগের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে গলে না যায়। পুকুরে গ্রাস কার্প ও সরপুঁটি থাকলে নিয়মিত ক্ষুদিপানা, ঝিঝি কলার পাতা, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাঁধাকপি ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। এসব সবুজ পাতা কুচিকুচি করে কেটে ব্যবহার করা ভালো। গ্রাস কার্প দৈনিক তার দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৫০% পর্যন্ত খাদ্য খেতে পারে।

গলদা চিংড়ির খাদ্য

চিত্রঃ খাদ্যদানীতে খাদ্য পরীক্ষা

খৈল, কুঁড়া/ভুষির সাথে অতিরিক্ত শামুকের মাংস অথবা গবাদিপশুর রক্ত ব্যবহার করে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়। উপরোক্ত সারণিতে বর্ণিত খৈল ও কুঁড়া/ভুষির অবশিষ্ট অর্ধেক পরিমাণের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শামুকের মাংস মিশাতে হবে। মিশ্রিত কার্পের খাদ্য তৈরি করার মতই খৈল সকাল বেলায় দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখতে হবে। সন্ধ্যা বেলায় এই ভেজা খৈলের সাথে পরিমাণমতো অন্যান্য উপকরণ শামুক/ঝিনুকের মাংস মিশাতে হবে। ভেজা খৈলের সাথে মিশানোর আগে এই শামুক/ঝিনুকের মাংস কুচি কুচি করে কেটে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করে নিতে হবে। এই মিশ্রণ দিয়ে গোলাকার বল তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। মিনসিং মেশিনেও পিলেট আকারের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়। ১০-১২ নং হস্তচালিত মিনসিং মেশিন দিয়ে ঘণ্টায় ৫-১০ কেজি পিলেট আকারের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা সম্ভব। এই খাদ্য রোদে শুকিয়ে ৩-৫ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

চিত্র: ক) খামার এলাকায় খাদ্য তৈরির যন্ত্র, খ. পিলেট মেশিন গ. খাদ্য শুকানো এবং সংরক্ষণ

খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি

সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে এবং পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে তৈরি খাদ্য পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে খাদ্যদানীর মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগ করে খাদ্যের অপচয় কমানো সম্ভব। কার্পের খাদ্য দেয়ার সময় খাদ্যদানী পানির উপরিভাগে ৩০ সেমি নিচে এবং গলদার খাদ্য দেয়ার সময় তা পুকুরের তলায় ৩০ সেমি ওপরে স্থাপন করা ভালো।গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশের তৈরি আয়তকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। ভাসমান ফ্রেমটি পুকুরের পাড় থেকে ১-২ মিটার দূরত্বে পুকুরের অভ্যন্তরে স্থাপন করতে হয়। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো করে কেটে ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহ করতে হয়। এই ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহকৃত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হয়। মিশ্র চাষে কার্পের খাদ্য দিনের বেলায় সকাল ১০-১১ টার মধ্যে এবং চিংড়ির খাদ্য সন্ধ্যা ও রাতে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য সরবরাহ করা উচিত।

(ঘ) মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ

মিশ্র চাষের পুকুরে মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়মিতভাবে মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করা হয়।প্রজাতিভেদে সাধারণত মাছের গড় দৈনিক বৃদ্ধির হার ২-৫ গ্রাম এবং গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ০.৫-১% ।মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করা ভালো। মোট মজুদকৃত মাছ ও চিংড়ির ৮০% বেঁচে থাকার হার ধরে তাকে নমুনার জন্য সংগৃহীত মাছ ও চিংড়ির গড় ওজন দিয়ে গুণ করে মোট গড় ওজন বের করতে হবে। এই গড় ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। এই মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে বছরে প্রতি শতাংশে কমপক্ষে ১২-১৪ কেজি মাছ এবং ২-৩ কেজি চিংড়ি উৎপাদন হওয়ার কথা।এর কম হলে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

(ঙ) আহরণ

একই সময় একই আকারের মাছ ও চিংড়ির পোনা মজুদ করলেও এদের বৃদ্ধি একই রকম হয় না। পোনা মজুদের ৩-৪ মাসের মধ্যে কিছু মাছ ও চিংড়ি অন্যান্যগুলোর চেয়ে বড় হয়ে যায়। যেমন- চিংড়ির পোনা মজুদের ৩-৫ মাসের মধ্যে কিছু চিংড়ির ওজন ৮০-১০০ গ্রামে পৌঁছে যায়। এবং আবার ৪-৬ মাসের মধ্যে কিছু মাছের ওজন ৫০০ গ্রামের উপরে পৌঁছে যেতে পারে এজন্য একসাথে সব মাছ ও চিংড়ি না ধরে বড় আকারের মাছ ও চিংড়িগুলো ধরা লাভজনক।এর ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ ও চিংড়ি পরবর্তীতে দ্রুত

বাড়ার সুযোগ পায়। মিশ্র চাষের ফসল দুভাবে আহরণ করা যায়, যথা-

(১) আংশিক আহরণ

(২) সম্পূর্ণ আহরণ

আংশিক আহরণ

গলদা চিংড়ি আহরণ

মাথাসহ ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের চিংড়ি আহরণ করা লাভজনক। খেপলা জাল, বেড় জাল অথবা বাঁশের চাঁই ব্যবহার করে গলদা চিংড়ির আংশিক আহরণ সম্পন্ন করা যায়।

মাছ আহরণ

কার্প মাছের ওজন ৫০০ গ্রামের উপরে হলে তা বাজারজাত করা লাভজনক। যেসব মাছের ওজন ৫০০ গ্রামের উপরে পৌছাবে সেগুলো ধরে ফেলা ভাল। বড় পোনা ছাড়া হলে গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প ৪-৬ মাসের মধ্যে এ ওজনে পৌছে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আহরিত মাছের সমসংখ্যক একই জাতের বড় পোনা আবার পুকুরে ছাড়তে হবে। কার্পজাতীয় মাছ আহরণের জন্য সাধারণত বেড় জাল ব্যবহার করা হয়।

সম্পূর্ণ আহরণ

পুকুরে পানির স্তর এবং আয়তন খুব নিচে নেমে গেলে অথবা চাষের পরিকল্পিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ আহরণের ব্যবস্থা করা উচিত। পুকুর শুকিয়ে অথবা বেড় জাল টেনে সম্পূর্ণ আহরণ করা যায়। আংশিক আহরণের পরও ২৫-৩০% মাছ পুকুরে থেকে যেতে পারে। পরের বছর এপ্রিল-মে মাসে অবশিষ্ট মাছ সম্পূর্ণরূপে ধরে ফেলা উচিত। এ সময় এদের গড় ওজন প্রায় ১ কেজি হয়ে যায়। সম্পূর্ণ আহরণে সাধারণত বেড় জাল ব্যবহার করা হয়। পুকুর শুকিয়েও এ কাজ করা যায়।

(চ) বাজারজাতকরণ

চিংড়ি আহরণের পরও চিংড়ি বেশ কিছু সময় বেঁচে থাকে। চিংড়ি আহরণের পর বাজারজাত করতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে চৌবাচ্চার পানিতে এদেরকে কয়েকদিন রাখা যায়। এতে চিংড়ির ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না। তবে আহরণের পরপরই এদের বাজারজাত করা উত্তম। চিংড়ির মান বজায় রাখা এবং ভালো বাজার দর পাওয়ার জন্য স্বল্প পরিমাণে চিংড়ি আহরণ করে মাথাসহ চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। চিংড়ি ধরার পরপরই এদের ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং টিউবওয়েলের পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বরফজাত করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হারে পরিবহন দূরত্বের ভিত্তিতে চিংড়ি বরফজাত করতে হবে।

পরিবহন সময়	বরফ: চিংড়ির হার
১২ - ১৮ ঘণ্টা	১:১
১৮ - ২৫ ঘণ্টা	১.৫:১
২৪ - ৪৮ ঘণ্টা	২:১

আহরণের প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে মাছ মারা যায়। টিউবওয়েলের পরিষ্কার পানি দিয়ে মাছগুলো ধুয়ে দ্রুত বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। বাজারজাত করতে দেরি হলে ১:১ হারে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করতে হবে।

ধান ও গলদার চাষ

দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্বাদুপানিতে গলদা চিংড়ি চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কেবল খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা নালা, পুকুর দীঘি নয়, ধানক্ষেতেও এর চাষের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে সমগ্র দেশ জুড়ে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ করেও ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। চিংড়ির জন্য অতিরিক্ত খাবার না দিয়ে ধান ক্ষেতে ৩-৪ মাসে প্রতি হেক্টরে ১০০-২০০ কেজি এবং অতিরিক্ত খাবার দিয়ে ২০০-৩০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশের স্বাদু পানি অঞ্চলের হাওর এলাকা ও অতি নিচু এলাকার বোরো ধানের ক্ষেতে এবং মাঝারি নিচু এলাকার আমন ধান ক্ষেতে একই সঙ্গে ধান ও গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। এছাড়া যেসব ধানি জমিতে ৫-৬ মাস বন্যার পানি থাকে সেখানে বোরো ধানের পর গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। অর্থাৎ একই জমিতে (১) ধানের সাথে চিংড়ি চাষ এবং (২) ধানের পর চিংড়ি চাষ এই দুই পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়।

ধানের সাথে চিংড়ি চাষ

এই পদ্ধতিতে ধান ও চিংড়ি চাষ একই সাথে করা হয়। এখানে ধান আসল ফসল এবং চিংড়ি অতিরিক্ত ফসল হিসেবে বিবেচিত। ধানের সাথে চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে যেসব কাজ করতে হয় সেগুলোকে প্রধানত চারটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা

(ক) জমি প্রস্তুতকরণ।
(খ) মাটি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ
(গ) ধানের চাষ
(ঘ) চিংড়ির চাষ

(ক) জমি প্রস্তুতকরণ

এসব ক্ষেত এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে একই সময়ে একই জমিতে ধান ও চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। চিংড়ির জন্য ক্ষেতে কমবেশি পানি থাকতেই হবে, যেন পানি একেবারে শুকিয়ে গিয়ে চিংড়ি মারা না যায়। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত পানিতে ধান গাছগুলো ডুবে না যায় বা ক্ষেতের অতিরিক্ত পানি জমির আইলের ওপর দিয়ে উপচে বেরিয়ে চলে না যায়। অপর দিকে, খরার সময় ক্ষেতে পানি বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেলেও যেন ক্ষেতের কোনো স্থানে জমা করা পানিতে চিংড়ি আশ্রয় নিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত পানি নির্গমনের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এই নির্গমন পথ দিয়ে চিংড়ি যাতে বের হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সাধারণত ধান ক্ষেতকে চিংড়ি চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য জমি প্রস্তুতির সমগ্র কাজগুলোকে ৫টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

এই কাজগুলো নিম্নরূপ:

(১) ক্ষেতের চার পাশে আইল বা বাঁধ নির্মাণ

(২) ক্ষেতের ভেতরে পরিখা খনন

(৩) ক্ষেতের অভ্যন্তরে গর্ত বা খাল খনন

(৪) পানি প্রবেশ ও নির্গমনের নালা তৈরিকরণ

(৫) নালার মুখে জাল স্থাপন।

(১) আইল বা বাঁধ নির্মাণ

জমির চারপাশের আইল উঁচু ও শক্ত করে বাঁধতে হবে যাতে চিংড়ি বের হয়ে যেতে না পারে। আইলের উচ্চতা কমপক্ষে ৬০ সেমি হতে হবে যাতে জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ধরে রাখা যায়। মাটি এঁটেল ও দোআঁশ হলে আইলের গোড়া প্রশস্ত হবে ৫০ সেমি এবং উপরের দিকে প্রশস্ত হবে ৩০ সেমি। মাটি দোআঁশ বা বেলে দোঁআশ হলে আইলের প্রশস্ততা আরও বেশি হতে হবে।

(২) পরিখা খনন।

আইলের ভেতর জমির সমতা বা ঢাল অনুসারে চারপাশে, দুই পাশে অথবা আড়াআড়িভাবে পরিখা বা নর্দমা খনন করতে হবে। এই নর্দমার প্রস্থ প্রায় ৭৫ সেমি ও গভীরতা প্রায় ৫০ সেমি হলে ভালো হয়। তবে নর্দমার দৈর্ঘ্য জমির অনুপাতে হবে। ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চিংড়ির অবাধ চলাচলের জন্য এই নর্দমার প্রয়োজন। এছাড়া কীটনাশক প্রয়োগের সময় এবং ক্ষেতের পানি কমে গেলে চিংড়ি এই নর্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

(৩) গর্ত বা খাল খনন, পানি প্রবেশ ও নির্গমনের নালা তৈরিকরণ

পরিখাগুলোর সংযোগস্থলে কিংবা জমির নিচু অংশে গর্ত খনন করতে হবে। এই গর্তের গভীরতা ৬০ সেমি হলে ভালো হয়। আইল থেকে কমপক্ষে ১২০ সেমি দূরে পরিখা ও গর্ত খনন করতে হবে। এই পরিখা ও গর্তের আয়তন জমির মোট আয়তনের ০.৫% হলে ভালো হয়। বর্ষার সময় যাতে ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যেতে পারে, সেজন্য আইলের কোনো স্থানে এক বা একাধিক নির্গমন নালা রাখতে হবে। এ কাজে বাঁশের চোঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই নালা বা বাঁশের চোঙ আইলে ৩৫ সেমি উচ্চতায় রাখলে ক্ষেতের অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার পরও প্রয়োজনীয় পানি ক্ষেতে থেকে যাবে।

(৪) তারের জাল বা বাঁশের বানা স্থাপন

নালা বা চোঙের মুখে তারের জাল অথবা বাঁশের বানা লাগিয়ে দিতে হবে যাতে পানির সাথে চিংড়ি বের হয়ে যেতে না পারে।

(খ) মাটি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ

মাটি কর্ষণ

ধান চাষের জমি যেভাবে চাষ করা ঠিক সেভাবে জমিতে চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছামুক্ত করে জমি প্রস্তুত করে নিতে হবে। জমি যতটুকু সম্ভব সমান বা সমতল করতে হবে। যাতে ক্ষেতের সর্বত্র পানির গভীরতা সমান থাকে।

সার প্রয়োগ

ধানের জাতের ওপর নির্ভর করে জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়। যেসব ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ করা হয় সাধারণত সেসব জমিতে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়। স্বাভাবিকভাবে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষের জন্য অনুমোদিত সার প্রয়োগের মাত্রার সাথে চিংড়ি চাষের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ হারে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা হয়।

সারণি: হেক্টরপ্রতি বিভিন্ন সারের পরিমাণ (কেজি)

সারের নাম	অনুমোদিত মাত্রা	১৫% হারে বাড়তি সার	মোট পরিমাণ	প্রয়োগ সময়
ইউরিয়া	১৭৪	২৬	২০০	৩ কিস্তিতে
ট্রিপল সুপার ফসফেট	১৩৩	২০	১৫৩	শেষ চাষ
মিউরেট অব পটাশ	৬৭	১০	৭৭	শেষ চাষ
জিপসাম	১১	১৭	১২৮	শেষ চাষ

ইউরিয়া সার ছাড়া অন্যান্য সার জমির শেষ চাষের সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। জমি শেষ চাষের পর মাটি কাদা করার সময়ে সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিনভাগ করে তিন কিস্তিতে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে ধান রোপণের ১৫, ৩০ ও ৫৫ দিন পর এই সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার উপরি প্রয়োগের পূর্বে ক্ষেতের পানি এমন পরিমাণে কমাতে হবে যাতে উপরি সার প্রয়োগ সময়ে চিংড়ি ও মাছ পরিখা গর্তের পানিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

(গ) ধান চাষ

জাত নির্বাচন।

আধুনিক জাতের, খাটো ও খাড়া এবং সহজে হেলে পড়ে না এমন জাতের ধান চাষ করার জন্য নির্বাচন করা উচিত। এরকম জাতের ধান গাছের ভিতর দিয়ে চিংড়ি সহজেই চলাচল করতে পারে এবং পানিতে সহজেই রোদ পড়তে পারে। ফলে মাছের ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হতে পারে। তবে ধানের জাতটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন তা উৎপাদন মৌসুম উপযোগী হয়। এসব জমিতে চাষের জন্য যেসব জাত উপযুক্ত সেগুলোর মধ্যে বিআর-১১ (মুক্তা), বিআর-৩ (বিপব) ও বিআর-১৪ (গাজী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চারা রোপণ

ক্ষেতে কমপক্ষে এক মাস বয়সের চারা রোপণ করলে ধানের ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ধানের চারা ক্ষেতে সারিবদ্ধ লাইন করে লাগাতে হয়। এক লাইন থেকে অপর লাইনের দূরত্ব প্রায় ১৫ সেমি হয়ে থাকে। এভাবে ৩/৪ টি চারাযুক্ত গোচাগুলো রোপণ করা যায়। তবে চিংড়ি চাষের সুবিধার্থে সারিগুলো জোড়ায় জোড়ায় স্থাপন করা যায়। জোড়া সারির মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় ১৫ সেমি এবং পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোক পড়তে পারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০২২

পরিচর্যা

ধান ক্ষেতের বিভিন্ন পরিচর্যা, যেমন-আগাছা পরিষ্কার, ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগে, পর্যায়ক্রমে জমি শুকানো ও ভিজানো ইত্যাদি কাজগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। সারের উপরি প্রয়োগের সময় যেন পরিখায় ও গর্তে পানি থাকে এবং জমিতে বেশি পানি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(ঘ) চিংড়ি চাষ

প্রজাতি নির্বাচন।

বাংলাদেশে স্বাদু বা মিঠা পানিতে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়, তবে এদের সবগুলোই চাষযোগ্য বা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। ধানক্ষেতে চাষের জন্য এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে যা চাষযে-াগ্য এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয়। এসব বিচারে গলদা চিংড়ি ধান ক্ষেতে চাষের জন্য উপযুক্ত। কারণ দেশে ও বিদেশে গলদা চিংড়ির প্রচুর চাহিদা রয়েছে, এরা দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক তাপমাত্রা সহনশীল। সর্বোপরি দেশের সব জলাশয়ে গলদা চিংড়ি চাষ করা যায় এবং সারা বছর এর পোনা পাওয়া যায়।

ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য প্রকৃতপক্ষে ৩-৪ মাস সময় পাওয়া যায়। কাজেই এই অল্প সময়ে চাষ করে চিংড়ি বাজারজাত করতে হলে অবশ্যই বড় আকারের পোনা ধানক্ষেতে মজুদ করতে হবে। নতুবা চিংড়ি চাষ অলাভজনক হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। ধানক্ষেতে কমপক্ষে ৫ সেমি আকারের পোনা মজুদ করা ভালো। বড় আকারের পোনা মজুদ করলে ৩-৪ মাসের মধ্যে এদের বাজারজাত করা সম্ভব। এ সময়ে এদের গড় ওজন প্রায় ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। জোয়ারভাটা হয় এমন নদনদীতে প্রায় সারা বছরই গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। হাওর এলাকায় নদীগুলোতে জ্যৈষ্ঠ -আষাঢ় মাসে ও আশ্বিন কার্তিক মাসে এই পোনা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক গলদা হ্যাচারি গড়ে ওঠেছে। এসব হ্যাচারি থেকেও গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়।

মজুদের হার নির্ধারণ

ধানক্ষেতে হেক্টর প্রতি ৫ সেমি আকারের ১০ - ১৫ হাজার পোনা মজুদের হার নির্ধারণ করা হয়।

পোনা ছাড়ার নিয়ম

ক্ষেতে ধানের চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর চিংড়ির পোনা মজুদ করা উচিত। চারা রোপণের পর জমিতে চারা লেগে গিয়ে বেশ কিছুটা বেড়েছে এমন পর্যায়ে চিংড়ির পানা মজুদ করতে হবে। ধানের চারা রোপণের পূর্বে চিংড়ির পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। এতে পানার ব্যাপক মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। জমিতে পোনা ছাড়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে সকাল বেলা ও বিকাল বেলা। পোনা পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা এবং ধানক্ষেতের পানির তাপমাত্রার মধ্যে সমতা এনে পোনা মজুদ করতে হবে। কারণ পানির তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনে চিংড়ি পোনার ব্যাপক মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

চিংড়ি পরিচর্যা

কোন বাড়তি খাবার প্রয়োগ না করেও ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ করা যায়। ধান ক্ষেতের শেওলা, পোকামাকড় ও পচনশীল দ্রব্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে অর্থাৎ ধানক্ষেতে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়েও চিংড়ি বড় হতে পারে। তবে কিছু খাবার প্রয়োগ করলে চিংড়ির বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায়। চিংড়ি চাষের শুরু থেকেই ১০ কেজি পরিমাণ চালের কুঁড়া ও গোবর ১৪৩ অনুপাতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর পরিখা ও গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। চিংড়ি ছাড়ার মাস খানেক পর থেকে মোট চিংড়ির আনুমানিক ওজনের ৩ ৫% হারে খৈল ও ভুষি বা কুঁড়া ১৪১ অনুপাতে মিশিয়ে একদিন পর পর পরিখা ও গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্য হিসেবে খৈল ব্যবহারের আগে একরাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর এই ভেজা খৈল, ভুষি বা চালের কুঁড়ার সাথে মিশিয়ে বল আকারে বিকাল বেলায় ক্ষেতের পরিখার ও গর্তের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির পোনা মজুদের পর জমিতে সব সময়েই পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম দিকে ক্ষেতের ওপর ১০-১৫ সেমি গভীর পানি থাকলেই চলে, তবে পানির গভীরতা ধান ও চিংড়ির বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি করতে হবে। শেষের দিকে এই গভীরতা ৩০-৩৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। ধানক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা ও সার প্রয়োগের জন্য পানি কমাতে হলে চিংড়িগুলোকে পরিখা ও গর্তের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পানি আস্তে আস্তে কমালেই চিংড়ি পরিখা ও গর্তের পানির মধ্যে আশ্রয় নিবে। অতিবৃষ্টি কিংবা অন্য কোনো কারণে ক্ষেতের পানি দ্রুত বেড়ে গেলে নির্গমন নালা বা ড্রেন ও চোঙের মধ্য দিয়ে পানি নিষ্কাশন করতে হবে।

চিংড়ি আহরণ

ধান পাকা শুরু হলে ক্ষেতের পানি ধীরে ধীরে কমিয়ে চিংড়িগুলোকে পরিখা ও গর্তে আনতে হবে। তারপর ধান কাটা শেষ করে চিংড়ি ধরতে হবে। হাত জাল, ঝাকি জাল ও বিভিন্ন ধরনের ফাদ দিয়ে চিংড়ি ধরা যায়। কোনো কারণে ধান পাকার আগেই জমির পানি শুকাতে শুরু করলে, ধান কাটার আগেই চিংড়ি ধরা যায়। তবে চিংড়ি বাজারজাত করার উপযোগী না হলে এবং ক্ষেতে রাখার সুযোগ থাকলে, চিংড়ি না ধরে ধান কাটার পরও ক্ষেতে রেখে বড় করা যায়। এরূপ অবস্থায় পাম্প মেশিনের সাহায্যে বা অন্য কোনো উৎস থেকে ক্ষেতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

হাওর এলাকায় বোরো ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষ করলে, বাড়তি খাবার ছাড়াই এর উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ২৮০ কেজি হয়। তবে খাবার প্রয়োগ করে চিংড়ির উৎপাদন ৪০০ কেজি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। আমন ধান ক্ষেতে শুধু প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে হেক্টর প্রতি ১০০-১৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে ধানক্ষেতে বাড়তি খাবার প্রয়োগ করে হেক্টর প্রতি ২০০-৩০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

ধানের পর চিংড়ি চাষ

ধানের পর চিংড়ি চাষ পদ্ধতিকে ধান-চিংড়ির পর্যায়ক্রমিক চাষ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে একই জমিতে ধান ও চিংড়ি পর্যায়ক্রমে চাষ করা হয়। সাধারণত এই চাষ পদ্ধতিতে কোনো জমিতে ধান উৎপাদনের পরে সেখানে চিংড়ি চাষ করা হয়। চিংড়ি উৎপাদনের পর সেখানে আবার ধান চাষ করা হয়। বোরো ধান কাটার পর যেসব এলাকা পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে এমন জায়গায় চিংড়ি চাষ করা যায়। সাধারণত এসব জমি উঁচু আইল কিংবা জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বাংলাদেশের বৃহত্তম ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার নিচু জমিগুলোতে এ পদ্ধতিতে ধান চাষের পর চিংড়ি চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ধানের পর চিংড়ি চাষ পদ্ধতির কিছু কিছু অংশের ধানের সাথে চাষ পদ্ধতির সাথে মিল আছে। তবে যেসব বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে এখানে তা বর্ণনা করা হলো। সম্পূর্ণ কাজগুলোকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা

(ক) জমি প্রস্তুতকরণ

(খ) ধানের চাষ

(গ) চিংড়ি চাষ

(ক) জমি প্রস্তুতকরণ

আইল বা বাঁধ নির্মাণ

চিংড়ি চাষের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে জমির চারপাশে আইল বা উঁচু জমি আছে যা বন্যার পানিতে ডুবে না। জমির চারপাশে আইল বা উঁচু জমি না থাকলে, সেখানে আইল বা বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। জমির আইল ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। চিংড়ি চাষকালে জমিতে প্রচুর পানি থাকে, আবার চিংড়ির সাথে ধান থাকে না বলে এসব জমিতে পরিখা বা গর্ত খনন না করলেও চলে। তবে চিংড়ি আহরণের সুবিধার্থে জমির নিচু স্থানে স্বল্প ব্যয়ে গর্ত তৈরি করা যায়।

নির্গমন নালা তৈরি

বর্ষার অতিরিক্ত পানি জমি থেকে সহজে বের করার জন্য নির্গমন নালা বা ড্রেন খনন করা দরকার। জমির আকার, আয়তন ও পানির গভীরতার ওপর ভিত্তি করে নির্গমন নালার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নির্গমণ নালা এমনভাবে খনন করতে হবে এবং নালার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে যাতে জমিতে পানির গভীরতা ১.২৫ মিটারের বেশি না হয়।

তারের জাল বা বাঁশের বানা স্থাপন

নির্গমন নালাগুলোর মুখে মোটা তারের জাল বা বাঁশের তৈরি শক্ত বানা স্থাপন করতে হবে, যাতে পানি নির্গমনের সময় পানির সাথে চিংড়ি চলে যেতে না পারে।

সার প্রয়োগ

ধানের জন্য অনুমোদিত সারগুলো ধান চাষেই ব্যবহার করতে হবে। চিংড়ি চাষের জন্য অতিরিক্ত ১৫% হারে সার চিংড়ি চাষকালে প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) ধান চাষ

জাত নির্বাচন

চাষের এলাকা অনুযায়ী আধুনিক জাতের বা দেশি জাতের যে কোনো ভালো জাতের ধান আবাদ করা যায়। ২০২২

ধানের মৌসুম

বোরো ধানের স্বাভাবিক সময়ই সাধারণত এই ধান চাষের মৌসুম। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি বা পৌষ-মাঘ মাসে বোরো ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং এপ্রিল-মে বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে ফসল কাটা হয়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

এই পদ্ধতিতে চিংড়ি এককভাবে চাষ করা হয় বলে ধান চাষের জন্য ভিন্নতর কোনো উপায়ে ধানের পরিচর্যা করার প্রয়াজন হয় না। তাই ধানের চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রচলিত উন্নত পদ্ধতিতে করলেই হবে।

ধান কাটা

ধান এমনভাবে কাটতে হবে যাতে ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণে ধান গাছের গোড়া বা নাড়া থেকে যায়। পরবর্তীতে এই নাড়া পচে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়।

(গ) চিংড়ি চাষ

প্রজাতি নির্বাচন

চিংড়ি চাষের জন্য মিঠা পানির গলদা চিংড়ি চাষ করা সবচেয়ে ভালো ও লাভজনক। তবে মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ির সাথে রাজপুঁটি ও রুইজাতীয় মাছের চাষ করা যায়।

চিংড়ির পরিচর্যা

ধান চাষের পর চিংড়ি চাষে কোনো বাড়তি খাদ্য প্রয়োগ না করেও চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। তবে খাবার প্রয়োগের ফলে চিংড়ি ও মাছের দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুততর হয় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি পরিমাণ কুঁড়া ও গোবর ১:৩ অনুপাতে মিশিয়ে খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

চিংড়ি আহরণ

বর্ষা শেষে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমির পানি কমে গেলে চিংড়ি ধরে ফেলতে হবে। তবে পানি এ সময়ের আগে শুকালে চিংড়ি ও মাছ ধরে ফেলাই উত্তম। এই পদ্ধতিতে এককভাবে গলদা চিংড়ি চাষ করলে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৫০০ কেজি এবং মিশ্র চাষে হেক্টরপ্রতি ১৫০-২০০ কেজি চিংড়ি ও ৪০০-৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা যেতে পারে।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ডিসেম্বরের মাঝামঝি থেকে জানুয়ারি মাসের শেষ সময় পর্যন্ত লবণ উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় এ সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারে। সাধারণত বেড়ি বাঁধের মধ্যে চিংড়ি ও লবণ চাষ করা হয়। চিংড়ি ও লবণ চাষের জমিকে প্রথমত ৬-৭টি প্রকোষ্ঠগুলোর নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নেই। তবে সচরাচর প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের আয়তন সমান থাকে। আবার প্রকোষ্ঠগুলোর আয়তন ছোট বা বড়ও হতে পারে। ১-১.৫ ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে প্রকোষ্ঠগুলো ছোট নালা দ্বারা একটির সাথে অন্যটির সংযোগ রক্ষা করা হয়। লবণ চাষের জন্য এই প্রকোষ্ঠগুলোর তলা রোলারের সাহায্যে শক্ত করা হয়।

২০২২

প্রকোষ্ঠগুলোর আইল বা বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে সরবরাহ নালা থেকে জলাধারে লোনা পানি কয়েকদিন রাখা হয়। তারপর জলাধার থেকে লোনা পানি প্রথম প্রকোষ্ঠে ঢুকানো হয়। তারপর এই পানি ১৫-২০ দিন রৌদ্রে বাষ্পীয়করণ করার পর ছোট নালা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে ঢুকানো হয়। এভাবে এই বাষ্পীভূত পানি পর্যায়ক্রমে শেষে বা সপ্তম প্রকোষ্ঠে আনা হয়। এই প্রকোষ্ঠেই লোনা পানি ১-২ সপ্তাহ বাষ্পীভূত পানি পর্যায়ক্রমে শেষ বা সপ্তম প্রকোষ্ঠে আনা হয়। এই প্রকোষ্ঠেই লোনা পানি ১-২ সপ্তাহ বাষ্পীভূত করে লবণ সংগ্রহ করা হয়। এইভাবে প্রথম প্রকোষ্ঠের পানি দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানোর পর আবার নতুন পানি প্রথম প্রকোষ্ঠে ঢুকানো হয় এবং পর্যায়ক্রমে বাষ্পীয়করণের মাধ্যমে এই বাষ্পীভূত পানি প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে এসে শেষ সপ্তম প্রকোষ্ঠ আসে এবং এখান থেকেই চূড়ান্তভাবে লবণ সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. রুই মাছের খাদ্যাভ্যাস কী ?

২. সরপুঁটি মাছের খাদ্যাভ্যাস কী ?

৩. পানির তাপমাত্রা কত হলে মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় ?

৪. রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা কত ?

৫. মিশ্র চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কয় ধরনের হতে পারে ?

৬. গলদা চিংড়ি ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ?

৭. মিশ্র চাষে কোন প্রজাতির চিংড়ি চাষ করা হয় ?

৮. মাটির পিএইচ ৬-৭ হলে প্রতি শতাংশে কী পরিমাণ পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে?

৯. পুকুরে সার প্রয়োগের কয়দিনের মধ্যে ফাইটোপ্ল্যাংকটন জন্মায় ?

১০.মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ির জন্য কখন খাদ্য প্রয়োগ করা হয় ?

১১. একই সাথে ধান ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষের জন্য অতিরিক্ত কত ভাগ সার প্রয়োগ করতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মিশ্র চাষের সুবিধাগুলো লেখ।

২. মিশ্র চাষের প্রজাতি নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

৩. পোনা মজুদের পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার পদ্ধতি লেখ।

৪. ভাল ও খারাপ কা⊠প পোনা শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য লেখ।

৫. ধান ও চিংড়ি এক সাথে চাষের ক্ষেত্রে পোনা মজুদের নিয়মগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ি চাষের ঘেরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২. বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস বর্ণনা কর।

৩. এক সাথে ধান ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. ধানের পর চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২২

ব্যবহারিক

প্রথম পত্র

অনুশীলনী- ১: চিংড়ির শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ির সমগ্র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যেমন

১. শিরাক্ষে (Cephalothorax): চিংড়ির মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। এজন্য চিংড়ির মাথা ও বুককে একত্রে শিরাক্ষে বলা হয়। চিংড়ির শিরাক্ষে অংশে ১৩ জোড়া উপাঙ্গ আছে। মাথার অগ্রভাগে করাতের মত রাস্ট্রেন থাকে।

২. উদর (Abdomen): উদর ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে সরু হয়ে লেজ বা টেলসনের সাথে মিশেছে। চিংড়ির উদর অংশে ৬ জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে।

৩. উপাঙ্গ (Appendages): চিংড়ির দেহে সর্বমোট ১৯ জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে। এর মধ্যে ৫ জোড়া শির অঞ্চলে, ৮ জোড়া বক্ষ অঞ্চলে এবং ৬ জোড়া উদর অঞ্চলে অবস্থিত।

উপকরণ

১.	ট্রে	২.	আতশ কাচ (Magnifying glass)
৩.	কাঁচি	৪.	চিমটা
৫.	স্কালপেল	৬.	নিডল বা সুচ
৭.	তুলি	৮.	স্পেসিমেন জার
৯.	শিশি	১০.	ফরমালিন
১১.	মাইক্রোস্কোপ	১২.	ব্যালান্স (Balance)
১৩.	রিফ্লাক্টোমিটার	১৪.	ডিও মিটার
১৫.	পিএইচ মিটার	১৬ .	সেক্কি ডিক
১৭.	থার্মোমিটার	১৮.	প্ল্যাংকটন গণনাকারী এসআর সেল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা চিংড়ি খামার থেকে মাঝারি। বড় আকারের তাজা চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত চিংড়ি পানি ভর্তি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এস।

৩. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- চাষির নাম, পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানির ও নমুনা। সংগ্রহের তারিখ লিপিবদ্ধ কর।

৪. পরীক্ষাগারে এসে এবার চিংড়ি বালতি থেকে তুলে ট্রেতে রাখ। তারপর ফরসেপ দিয়ে চিংড়ির শরীরের বিভিন্ন এ অংশ যেমন- শিরাক্ষে, উদর, বিভিন্ন উপাঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখ এবং ছবিতে চিহ্নিত অংশগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখ।

৫. এবার ট্রেতে রক্ষিত চিংড়ির ব্যবহারিক খাতায় পেন্সিলের সাহায্যে ছবি আঁক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। তোমার চিহ্নিত ছবির সাথে ছবিতে চিহ্নিত অংশগুলো মিলিয়ে দেখ।

৬. অনুশীলনকৃত কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

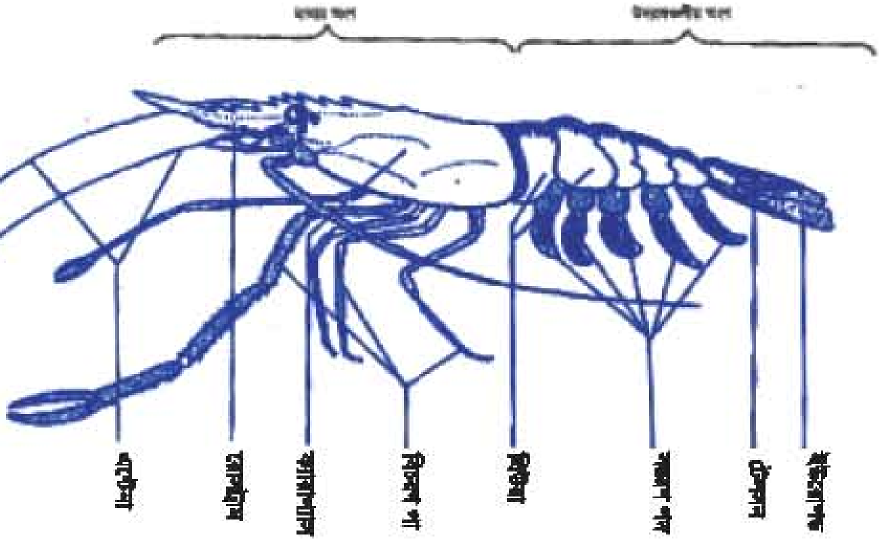

চিত্রঃ চিংড়ির শারীরিক গঠন

অনুশীলনী- ২ঃ বিভিন্ন প্রকার চিংড়ির পরিচিতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে প্রায় ৬৭ টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এসব চিংড়িকে আবাসস্থল অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়, স্বাদু পানির চিংড়ি ও লোনা পানির চিংড়ি।

১. স্বাদু পানির চিংড়ি

বাংলাদেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ে স্বাদু বা মিঠা পানির চিংড়ি পাওয়া যায়। সাধারণত স্বাদু পানির চিংড়ির প্রথম দুই জোড়া বক্ষ উপাঙ্গ চিলেটে রূপান্তরিত হয়। বহিঃকঙ্কালের দ্বিতীয় পিউরা ১ম ও ৩য় পিউরাকে আংশিক আবৃত করে রাখে এবং এদের অ্যানটেনিউল তিনটি ফ্লাজেলা যুক্ত থাকে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ও চাষযোগ্য কতকগুলো মিঠা পানির চিংড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো।

ক) গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii)

বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের জলাশয়ে সারা বছরই এদের পাওয়া যায়। মিঠা পানির চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি সবচেয়ে বড়, এদের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৩২০ মিমি এবং ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ির গায়ের রং হালকা নীল কিংবা হালকা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। এই চিংড়ির ২য় পিউরা ১ম ও ৩য় পিউরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে। মাথার সম্মুখভাগে অবস্থিত রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১১-১৪ টি এবং নিচের অংশে ৮-১৪ টি খাঁজ বা দাঁত থাকে।

চিত্র: গলদা চিংড়ি

১) ছটকা চিংড়ি (Macrobrachium malcolmsonii)

মিঠা পানির এই চিংড়ি মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। এদের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০ মি মি হয়ে থাকে। ছটকা চিংড়ির দেহের পৃষ্ঠদেশ ও অঙ্কদেশ হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। এদের রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯ ১৪ টি এবং নিচের দিকে ৫-৯ টি খাঁজ বা দাঁত থাকে।

চিত্র: ছটকা চিংড়ি

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি
২. ট্রে
৩. বালতি
৪. ফরসেপ
৫. আলপিন
৬. আতশ কাচ (Magnifying glass)
৭. কাচের জার
৮. ফরমালিন
৯. গাম বা আঠা
১০. খাতা
১১. পেন্সিল
১২. রবার

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো বাজার, পুকুর বা খামার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি সংগ্রহ কর। লোনা পানির চিংড়ি উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো বাজার বা চিংড়ি খামার বা উপকূলীয় জলাশয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- চাষির নাম, খামারের আয়তন, অবস্থান, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ কর।

৩. সংগৃহীত চিংড়ি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসতে হবে।

৪. পরীক্ষাগারে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িগুলো আলাদা আলাদাভাবে ট্রেতে রাখ।

৫. ফরসেপ দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িগুলোর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে দেখ।

৬. এবার আলপিন দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে চিংড়িগুলোর রোস্ট্রামের উপরিভাগের ও নিচের অংশের দাঁতগুলো গণনা কর।

৭. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়িগুলো এবার আলাদা আলাদাভাবে কাচের জারে ১০% ফরমালিনে সংরক্ষণ কর।

৮. প্রতিটি কাচের জারের গায়ে পৃথক পৃথকভাবে চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাসসহ সংগ্রহের তারিখ সংবলিত কাগজের লেবেল আঠা দিয়ে আটকিয়ে দাও।

৯. এবার ব্যবহারিক খাতায় বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে লিখ।

অনুশীলনী- ৩: চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রায় ৬৭ টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের কিছু লোনা পানির চিংড়ি এবং কিছু মিঠা পানির চিংড়ি। আবার সবজাতের চিংড়িই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও চাষযোগ্য নয়। লোনা পানির চিংড়ি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নদীসমূহে এবং সাগরে পাওয়া যায়। মিঠা পানির চিংড়ি বাংলাদেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ে পাওয়া যায়।

২. বাজারে সাধারণত সায়েন্টিফিক স্টোর বা ঔষধের ফার্মেসিতে ফরমালিন কিনতে পাওয়া যায়। বাজারে যে ফরমালিন কিনতে পাওয়া যায় তাতে সাধারণত ৪০% ফরমালিন দ্রবণ থাকে। কিন্তু এই ফরমালিনে চিংড়ি সংরক্ষণ করা ঠিক নয়। চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য এই ফরমালিন দ্রবণে পাতন পানি মিশিয়ে ১০% ফরমালিন দ্রবণে পরিণত করতে হবে।

উপকরণ

১. বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি	২. বালতি
৩. ফরসেপ	৪. নিডল
৫. ট্রে	৬. স্পেসিমেন জার
৭. ফরমালিন	৮. পাতন পানি
৯. গাম বা আঠা	১০. ড্রপার
১১. ব্যবহারিক খাতা	১২. পেন্সিল

কাজের ধাপ

১. সম্ভব হলে নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে অথবা উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির লোনা পানির চিংড়ি সংগ্রহ করে আলাদাভাবে রাখ।

২. নিকটস্থ বাজার বা খামার থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি সংগ্রহ কর।

৩. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৪. লোনা পানির চিংড়িগুলো শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পৃথক করে আলাদা আলাদা ট্রেতে রাখ।

৫. মিঠা পানির চিংড়িগুলো শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পৃথক করে আলাদা আলাদা ট্রেতে রাখ।

৬. নিকটস্থ বাজার থেকে ফরমালিন সংগ্রহ কর।

৭. প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাতন পানি মিশিয়ে ১০% ফরমালিন দ্রবণ তৈরি কর।

৮. প্রয়োজনীয় সংখ্যক জারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফরমালিন দ্রবণ লও।

৯. এবার বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি আলাদা আলাদা জারে সংগ্রহ কর।

১০. প্রত্যেকটি জারের গায়ে কাগজ আটকিয়ে তাতে চিংড়ির শ্রেণিবিন্যাস ও সংরক্ষণের তারিখ লেখ।

১১. পরিশেষে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী- ৪: গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

(ক) পরিপাকতন্ত্র: গলদা চিংড়ির পরিপাকতনত্র পরিপাকনালী ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি সমন্বয়ে গঠিত।

পরিপাকনালীঃ এই নালী মুখছিদ্র (Mouth) থেকে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিপাকনালী প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা-

১. অগ্র পরিপাকনালী (Foregut)

২. মধ্য পরিপাকনালী (Mid gut)

৩. পশ্চাৎ পরিপাকনালী (Hind gut)

অগ্র পরিপাকনালী: মুখ ছিদ্র, মুখ গহ্বর (Buccal cavit), গ্রাস নালী (Oesophagus) ও পাকস্থলী সমন্বয়ে অগ্র পরিপাকনালী গঠিত। পাকস্থলী আবার দুটি অংশে বিভক্ত। যথা-কার্ডিয়াক পাকস্থলী ও পাইলোরিক পাকস্থলী।

মধ্য পরিপাকনালী: পাইলোরিক পাকস্থলীর পরবর্তী ভাগ থেকে মধ্য পরিপাকনালী শুরু। এই অংশটি লম্বা সরু সুতার মত যা অনত্র (Intestine) নামে পরিচিত।

পশ্চাৎ পরিপাকনালী: এই অংশটি পরিপাকনালীর সবচেয়ে ছোট অংশ। মলাশয় (Rectum) ও পায়ুছিদ্র (Anus) - এই দুইটি অংশের সমন্বয়ে পচাৎ পরিপাকনালী গঠিত।

২০২২ **হেপাটোপ্যানংক্রিয়াস গ্রন্থি:** শিরোবক্ষের গহ্বরে কমলা রং বিশিষ্ট এই গ্রন্থি অবস্থিত। এটিই চিংড়ির একমাত্র পরিপাক গ্রন্থি।

(গ) প্রজননতন্ত্র: চিংড়ি একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী। পুংজনন অঙ্গ ও স্ত্রীজনন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন চিংড়িতে বিদ্যমান।

পুংজননতন্ত্র: একজোড়া শুক্রাশয় (Testes), একজোড়া শুক্রনালী (Vas defferentia), শুক্রথলি (Seminal vesicle) ও পুং জননছিদ্র (Male genital aperture) সমন্বয়ে গলদা চিংড়ির পুং জননতন্ত্র গঠিত।

স্ত্রীজননতন্ত্র: চিংড়ির স্ত্রী জননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. ডিম্বাশয় (Ovaries)

২. ডিম্বনালী (Oviducts)।

৩. স্ত্রীজনন ছিদ্র (Female genital aperture)।

উপকরণ

১. পুরুষ ও স্ত্রী গলদা চিংড়ি	২. বালতি
৩. ট্রে	৪. কাঁচি
৫. ফরসেপ	৬. নিড়ল বা সুচ
৭. আলপিন	৮. আতশ কাচ
৯. কালপেল	১০. পেনসিল
১১. খাতা	১২. রবার

কাজের ধাপ

(ক) পরিপাকতন্ত্র

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে গলদা চিংড়ি সংগ্রহ কর।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন, চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর। ৩. নমুনা চিংড়ি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো।

৪. বালতি থেকে এবার চিংড়ি তুলে ট্রেতে রাখ।

৫. চিংড়িটিকে এবার পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ট্রেতে আটকিয়ে রাখ।

৬. আতশ কাচের সাহায্যে চিংড়ির মুখ ও পায়ু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৭. খুব সাবধানে শিরাবক্ষ ও উদর উপাঙ্গগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে সরিয়ে ফেল।

৮. কাঁচি দিয়ে পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর টারগাম কাট।

৯. ফরসেপ দিয়ে সাবধানে টারগাম ও নিচের পেশি সরিয়ে ফেল।

১০. এবার হৃৎপি- ও যকৃত কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললে যকৃত অগ্নাশয় গ্রন্থিটি দেখা যাবে।

১১. ফরসেপ ও কালপেল দিয়ে যকৃত অগ্নাশয় গ্রন্থি সরিয়ে নিয়ে গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগু-লা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

১২. পেনসিল দিয়ে পরিপাক তন্ত্র-এর চিত্র খাতায় অঙ্কন ও বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর।

১৩. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

(খ) প্রজননতন্ত্র

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ি সংগ্রহ কর ।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন, চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর ।

৩. নমুনা চিংড়ি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো ।

৪. বালতি থেকে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি তুলে ভিন্ন ভিন্ন ট্রেতে রাখ ।

৫. চিংড়িকে এবার পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ট্রেতে আটকাও ।

৬. এবার চিংড়ির পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর কঁচি ও ফরসেপ দিয়ে টারগাম ও পেশি সরিয়ে ফেল ।

৭. পেশি সরানারে পর সাবধানে তুৎপি-টি সরিয়ে ফেললে যকৃত-অগ্নাশয়ে জননঅঙ্গ দেখা যাবে ।

৮. গলদা চিংড়ির পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো পর্যবেক্ষণ কর ।

৯. পেন্সিল দিয়ে প্রজননতন্ত্রের ছবি আঁক ও জনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত কর ।

১০.অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

অনুশীলনী- ৫: পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাগদা চিংড়ি লোনা পানির চিংড়ি । বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানির জলাশয়সমূহে বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায় এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয় । দশ থেকে পঁচিশ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানি বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযোগী । যদিও বাগদা চিংড়ি ০-৭০ পিপিটি লবণাক্ততাযুক্ত পানিতে বেঁচে থাকতে পারে । পানি লবণাক্ততা দুইটি উপায়ে পরিমাপ করা যায়; যথা, (১) রিফ্রাক্টোমিটার ব্যবহার করে ও (২) হ্যাককীটে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ।

(ক) রিফ্রাক্টোমিটারের সাহায্যে লবণাক্ততা নির্ণয়

উপকরণ

১. ছিপিসহ বোতল	২. বটিং পেপার
৩. রিফ্রাকটোমিটার	৪. ড্রপার
৫. পাতিত পানি	৬. ব্যবহারিক খাতা
৭. পেনসিল	

কাজের ধাপ।

১. যে জলাশয়, পুকুর বা খামারের পানির লবণাক্ততা নির্ণয় করতে হবে সেই পুকুর/খামার থেকে এক বোতল পানি সংগ্রহ কর ।

২. পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন, চাষির নাম, খামারের অবস্থান, পানি সংগ্রহের সময়, তারিখ, পানির গভীরতা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর ।

৩. এবার রিফ্রাকটোমিটারের অগ্রভাগে অবস্থিত কভার স্লাইড উঠিয়ে বটিং পেপার বা টিস্যু পেপার দিয়ে রিফ্রাকটোমিটারের অগ্রভাগ ভালোভাবে পরিষ্কার কর ।

৪. রিফ্রাকটোমিটারের অগ্রভাগে কভার স্লাইডের নিচে ড্রপারের সাহায্যে কয়েক ফোঁটা পাতিত পানি দাও ।

৫. রিফাকটোমিটারের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আই পীসে চোখ লাগিয়ে রিফ্রাকটোমিটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত কেলটি শূন্যে অ্যাডজাস্ট কর ।

২০২২

৬. এবার রিফ্রাকটোমিটারের অগ্রভাগের কভার আইডের নিচে কয়েক ফোঁটা লবণাক্ত পানি দাও।

৭. অতঃপর আই পীসে চোখ লাগিয়ে পানির লবণাক্ততা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. রিফ্রাকটোমিটারের অভ্যন্তরস্থ স্কেল থেকে সরাসরি লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ কর।

৯. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

চিত্রঃ রিফ্রাক্টোমিটার

(খ) হ্যাকসীটের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে পানির লবণাক্ততা নির্ণয়

উপকরণ

১. ডিজিটাল টাইট্রেটর কার্টিজ (২.৫৭ ঘন মারকিউরিক নাইট্রেট)

২. ডাইফিনাইল কার্বাজোন পাউডারের পুরিয়া

৩. সিরিঞ্জ (৩ সিসি)

৪. ২, ৫, ১০, ২০ ও ২৫ মিলি বোতল

৫. ৪৭৩ মিলি ডিমিনারালাইজার বোতল

৬. ডিজিটাল টাইট্রেটর

৭. ডেলিভারি টিউব

৮. বড় ক্লিপারস

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামার থেকে লবণাক্ত পানি সংগ্রহ কর।

২. নমুনা পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানি সংগ্রহের সময়, তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. একটি পরিষ্কার ডেলিভারি টিউবকে মারকিউরিক নাইট্রেট (২.৫৭ ঘন) টাইট্রেশন কার্টিজের সাথে সংযুক্ত কর এবং টাইট্রেটরের চতুর্দিকে কার্টিজ লাগিয়ে দাও।

৪. ডেলিভারি টিউবের নব এবার ঘুরাতে থাক যে পর্যন্ত না টাইট্রেন্ট পড়া শুরু করে। অতঃপর ডেলিভারি। টিউবের শেষপ্রান্ত মুছে ফেল এবং নবকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শূন্যে আন।

৫. ৩ মিলি সিরিঞ্জ দিয়ে সংগৃহীত নমুনা পানি থেকে ২ মিলি নিয়ে বাতেলে রাখ।

৬. ১০ মিলি বোতলটি ডিমিনারালাইজড পানি দিয়ে পূর্ণ কর। ডিমিনারালাইজড বাতেলে ট্যাপের পানি দিয়ে ডিমিনারালাইজড পানি প্রস্তুত করা হয় এবং প্রায় ৩০ সেকেন্ড সময় এটি ঝাঁকানো হয়।

৭. এবার ডাইফিনাইলকার্বাজোন রিএজেন্ট পাউডারের পুরিয়া বাতেলে রাখ এবং ভালোভাবে এটি দ্রবণে মিশাও ।

৮. মারকিউরিক নাইট্রেট দিয়ে নমুনা পানিকে টাইট্রেট করতে থাক যতক্ষণ না দ্রবণের রং হলুদ থেকে । হালকা গালোপী বর্ণের হয় ।

৯. ডিজিটাল কাউন্টার উইন্ডো থেকে প্রাপ্ত রিডিংকে ১০ দিয়ে ভাগ করে নমুনা পানির লবণাক্ততা (পিপিটি- Parts per thousand) নির্ণয় কর ।

১০. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

অনুশীলনী- ৬: পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গলদা চিংড়ির অক্সিজেনের চাহিদা অন্যান্য জলজ প্রাণীর তুলনায় বেশি । চিংড়ি চাষের জন্য সর্বোত্তম অক্সিজেন মাত্রা হচ্ছে ৫-৭ মিগ্রা/লিটার । কোনো পুকুরে সাধারণত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সকালে সবচেয়ে কম এবং বিকালে সবচেয়ে বেশি থাকে । পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দুইটি উপায়ে পরিমাপ করা যায়; যথা,

(১) ডিও মিটারের সাহায্যে ও (২) হ্যাককীটে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ।

(ক) ডিও মিটারের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় ।

উপকরণ ।

(১) ডিও মিটার (২) ব্যবহারিক খাতা (৩) পেনসিল ।

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোন চিংড়ি খামারে গমন কর ।

২. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে ডিও মিটারটির সংবেদনশীল অংশ অল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখ ।

৩. এভাবে পুকুরের কয়েকটি স্থান থেকে ডিও মিটারের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপ কর । এবং অক্সিজেন পরিমাপের সময় লিখে রাখ ।

৪. পেন্সিল দিয়ে ডিও মিটারের রিডিংগুলো সময়সহ লিপিবদ্ধ কর ।

৫. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

(খ) হ্যাককীটের সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় ।

উপকরণ

১. দ্রবীভূত অক্সিজেন - ১ বিকারক পাউডারের পুরিয়া (Dissolved Oxygen 1 reagent| powder Pillow)|

২. দ্রবীভূত অক্সিজেন - ২ বিকারক পাউডারের পুরিয়া (Dissolved Oxygen 2 reagent powder Pillow)

৩. দ্রবীভূত অক্সিজেন - ৩ বিকারক পাউডারের পুরিয়া (Dissolved Oxygen 3 reagent powder Pillow)

৪. ডিজিটাল টাইট্রেটর কার্টিজ (০.০২৫ ঘন সোডিয়াম থায়োসালফেট)
৫. স্টার্চ ইনডিকেটর (১০০ ml, MDB)।
৬. বোতল (৬০ মিলি)
৭. ক্রমাঙ্কিত (Graduated) সিলিন্ডার (১০০ মিলি)
৮. ডিজিটাল টাইট্রেটর (Digital titrator)
৯. ডেলিভারি টিউব
১০. বড় ক্লিপারস
১১. ব্যবহারিক খাতা ও পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গমন কর।

২. ছিপিযুক্ত ৬০ মিলি এর একটি পরিষ্কার বোতেলে পানি সংগ্রহ কর। বোতেলে এমনভাবে পানি সংগ্রহ করতে হবে যেন বোতলটিতে পানির কোনো বুদ্বুদ না ঢুকে।

৩. নমুনা পানি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন, পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানি সংগ্রহের সময় ও তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৪. এরপর বোতলের পানির সাথে একটি দ্রবীভূত অক্সিজেন- ১ ও দ্রবীভূত অক্সিজেন-২ পাউডার মিশ্রিত কর। পাউডার মিশানারে পর খুব সাবধানে বোতলের ছিপি লাগাও যেন বোতেলে বাতাস না ঢুকে।

৫. বোতলের অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি বোতলটিকে কয়েকবার উল্টা ও সোজা করে পাউডারকে ভালোভাবে পানির সাথে মিশ্রিত কর। এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে বাতেলে একটি বাদামি-কমলা তলানি জমবে যা পরিমাপের ফলাফলকে প্রভাবিত করে না।

৬. এবার বোতলটিকে কিছুক্ষণ স্থির রাখ যাতে নিচে তলানি জমতে পারে। এর ফলে বোতলের উপরের অর্ধেক দ্রবণ পরিষ্কার দেখাবে। পুনরায় বোতলটিকে কয়েকবার উল্টা-সোজা করে দ্রবণ মিশাও। এরপর আবার বোতলটিকে স্থির অবস্থায় রাখ যেন বোতলের উপরের অর্ধেক অংশ পরিষ্কার হয়।

৭. এবার ছিপি খুলে বোতলের দ্রবণের সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেন-৩ পাউডারের একটি পুরিয়া মিশ্রিত কর। পুনরায় সাবধানে ছিপি লাগাও যেন বোতেলে বাতাসের বুদবুদ না ঢুকে। এবার কয়েকবার বোতলটিকে পুনরায় উল্টা-সোজা করে দ্রবণের সাথে পাউডার মিশ্রিত কর। যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে তাহলে তলানি দ্রবীভূত হবে এবং দ্রবণ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

৮. ক্রমাঙ্কিত ১০০ মিলি সিলিন্ডারে ৫০ মিলি প্রস্তুতকৃত নমুনা দ্রবণ ঢল।

৯. সোডিয়াম থায়োসালফেট নরমাল (০.০২৫ ঘন) দ্রবণের সাথে একটি পরিষ্কার ডেলিভারি টিউব সংযুক্ত করে এই টাইট্রেটরের চতুর্দিকে টাইট্রেশন কার্টিজ (Cartidge) সংযুক্ত কর।

১০. ডেলিভারি টিউবের নব এবার ঘুরাতে থাক যে পর্যন্ত না টাইট্রেন্ট পড়া শুরু করে। অতঃপর ডেলিভারি টিউবের শেষ প্রাপ্ত মুছে ফেল এবং নবকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে শূন্যে আন।

১১. বোতলের বাকি ১০ মিলি প্রস্তুতকৃত দ্রবণকে সোডিয়াম থায়োসালফেট (০.০২৫ ঘন) টাইট্রেন্ট দ্বারা টাইট্রেট কর যে পর্যন্ত না দ্রবণটি হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

১২. দুই ফেঁটা স্টার্চ ইনডিকেটর দ্রবণ ঢালার পর বোতলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাতে থাক যতক্ষণ না দ্রবণ নীল রং ধারণ করে।

১৩. পুনরায় টাইট্রেশন শুরু কর যতক্ষণ না দ্রবণ ঘন নীল থেকে রং বিহীন হয়।

১৪. ডিজিটাল কাউন্টার উইন্ডো থেকে এবার এর নম্বর সংখ্যা বের করতে হবে এবং এ সংখ্যাকে ৪০ দ্বারা ভাগ করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা (মিগ্রা/লি) বের কর। ২০২৫

অনুশীলনী- ৭: পানির পিএইচপর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পিএইচ হচ্ছে পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রার পরিমাপ যা "০" (খুব অম্লীয়) হতে ১৪ (খুব ক্ষারীয়) পর্যন্ত হয়। পিএইচ-৭ হলো নিরপেক্ষ। পিএইচের মান হাইড্রোজেন আয়নের কার্যকারিতা নির্দেশ করে। চিংড়ি চাষের জন্য পানির আদর্শ পিএইচ হচ্ছে ৭-৯। পানির পিএইচ কমে গেলে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও খাবার রুচি কমে যায়। আর পানির পিএইচ বেড়ে গেলে চিংড়ির ফুলকা ও চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং চিংড়ি খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। পানির পিএইচ দুভাবে নির্ণয় করা যায়। যথা, (ক) পিএইচ মিটারের সাহায্যে এবং (খ) হ্যাককীট ব্যবহার করে।

(ক) পিএইচ মিটারের সাহায্যে পানির পিএইচ নির্ণয়।

উপকরণ

১. পিএইচ মিটার

২. ব্যবহারিক খাতা

৩. পেনসিল ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে প্রবেশ কর।

২. খামারের যে কোনো একটি পুকুরের পানিতে পিএইচ মিটারের সংবেদনশীল অংশ কিছুক্ষণের জন্য ডুবিয়ে রাখ।

৩. পিএইচ মিটারের ডিজিটাল স্কেল থেকে পিএইচ-এর মাত্রা পরিমাপ কর এবং সময়সহ ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

(খ) হ্যাককীটের সাহায্যে পানির পিএইচ নির্ণয়।

উপকরণ

১. ৪ পিএইচ ইনডিকেটর দ্রবণ

২. ১০০ এমএল টেস্ট টিউব

৩. কালার ডিস্ক

৪. কালার ভিউং টিউব

৫. স্টপার

৬. কালার কমপারেটর বক্স

৭. ছিপিযুক্ত কাচের বোতল

৮. ব্যবহারিক খাতা

৯. পেনসিল

কাজের ধাপ

১. নমুনা পানি দিয়ে দুটি টিউবের ৫ এমএল চিহ্ন পর্যন্ত পূর্ণ কর। পূর্বে ব্যবহৃত টিউব থাকলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে যেন এর মাঝে অন্য কোনো দ্রবণ না থাকে।

২. একটি টিউবে ৬ ফোঁটা ৪ পিএইচ ইনডিকেটর দ্রবণ নিয়ে ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্রবণটি নমুনা পানির সাথে মিশাও। এবার উভয় টিউবের সাথে স্টপার সংযুক্ত কর।

২০২২

৩. কালার বক্সের ডান পার্শ্বের ছিদ্রে ইনডিকেটর মিশ্রিত টিউবটি রাখ।

৪. কালার বক্সের বাম পার্শ্বের ছিদ্রে অমিশ্রিত ইনডিকেটর টিউবটি রাখ।

৫. কালার বক্সকে আলোর দিকে যেমন, আকাশ, জানালা অথবা ল্যাম্প এর দিকে ধর এবং সামনের দুইটি ছিদ্র দিয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য করে রং এর চাকতিটি ঘুরিয়ে অনুরূপ রঙের সাথে মিলাও।

৬. কেলের ছিদ্র দিয়ে পিএইচ এর মাত্রা নির্ণয় কর।

৭. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী- ৮: মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চিংড়ি চাষে মাটির পিএইচের গুরুত্ব অপরিসীম। মাটির পিএইচ এর উপর পুকুরের পানির পিএইচ নির্ভরশীল। চিংড়ি চাষের জন্য পুকুরের মাটির পিএইচ ৫-৬.৫ এর মধ্যে থাকা উত্তম।

২. চিংড়ি খামারের জন্য দোআঁশ, বেলে দোআঁশ বা এঁটেল মাটির স্থান নির্বাচন করা দরকার। যে মাটিতে শতকরা ৮৫ ভাগের চেয়ে বেশি বালিকণা থাকে তাকে বেলে মাটি, শতকরা ৭৫ ভাগের কম বালিকণা ও শতকরা ২৫ ভাগের কম কাদাকণা যে মাটিতে থাকে তাকে দোআঁশ মাটি এবং যে মাটিতে শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি কাদাকণা বা পলিকণা থাকে তাকে কাদা মাটি বলে।

৩. কষযুক্ত মাটি বা অ্যাসিড সালফেট সয়েল চিংড়ি চাষের জন্য সমপূর্ণরূপে অনুপযোগী। যে মাটির পিএইচ ৪ অথবা এর কম থাকে তাকে কষযুক্ত মাটি বা অ্যাসিড সালফেট সয়েল বলে। যেসব খামার বা পুকুরে অ্যাসিড সালফেট সয়েল থাকে সেসব খামার/পুকুরের মাটির উপরিভাগে লাল রঙের একটি আস্তরণ দেখা যায়।

(ক) মাটির কণা নির্ণয়

উপকরণ

১. দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এঁটেল মাটি
২. ৪ টি পলিথিন ব্যাগ
৩. কাচ পাত্র
৪. পাতিত পানি
৫. খাতা
৬. পেনসিল

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামারে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে পরীক্ষাগারে নাও।

২. হাতে আধা মুঠো মাটি নিয়ে চাপ দিয়ে গুড়ো করে তাতে পরিমিত পানি মিশাও।

৩. এবার মাটি দলা বানানোর চেষ্টা কর।

- দলা বানানো না গেলে অর্থাৎ মাটিকণা আলগা থেকে গেলে বুঝতে হবে এটা বেলে মাটি।
- রিং বানানো যায় তবে আংটি বানাতে গেলে ভেঙে যায় তবে বুঝতে হবে এটা দোআঁশ মাটি।
- মাটি দিয়ে ভালো রকম আংটি বানানো যায় তাহলে এটা এঁটেল মাটি

৪. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর। ২০২২

(খ) মাটির পিএইচ নির্ণয়

উপকরণ

১. সয়েল পিএইচ মিটার ২. পাতিত পানি

৩. পলিথিন ব্যাগ ৪. কাচ পাত্র

৫. ব্যবহারিক খাতা ৫. পেন্সিল

কাজের ধাপ।

১. নিকটস্থ খামার থেকে অল্প পরিমাণ (প্রায় ১ কেজি) মাটি সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগে করে সংগৃহীত মাটি পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।

২. কাচ পাত্রে এক মুঠো মাটি নিয়ে পাতিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে কাদার মতো কর। এবার সয়েল পিএইচ মিটারের নিম্নভাগের সুচালো অংশটুকু কাদার মধ্যে স্থাপন কর।

৩. এবার সয়েল পিএইচ মিটারের কেল থেকে মাটির পিএইচ এর মাত্রা পর্যবেক্ষণ কর।

৪. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

(গ) অ্যাসিড সালফেট সয়েল চিহ্নিতকরণ

উপকরণ

১. কষযুক্ত মাটি ২. পাতিত পানি

৩. পলিথিন ব্যাগ ৪. সয়েল পিএইচ মিটার

৫. ব্যবহারিক খাতা ৫. পেন্সিল

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো খামার থেকে আধা কেজি পরিমাণ মাটি সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত মাটি পলিথিন ব্যাগে করে পরীক্ষাগারে নাও।

৩. মাটি সংগ্রহের সময় মাটির উপরের স্তরের রং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৪. এক মুঠো সংগৃহীত মাটি একটি কাচ পাত্রে পাতিত পানি দিয়ে ভিজিয়ে কাদার মতো কর।

৫. এবার সয়েল পিএইচ মিটারের সুচালো অগ্রভাগ কাদার মধ্যে স্থাপন কর।

৬. সয়েল পিএইচ মিটারের কেল থেকে মাটির পিএইচ-এর মান পর্যবেক্ষণ কর।

৭. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনা- ৯: পুকুরের তলা শুকানো

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পুকুরের তলদেশ ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোকে এমনভাবে শুকাতে হবে যেন মাটিতে ৫-১০ সেমি ফাটল সৃষ্টি হয়। তবে কষযুক্ত মাটি হলে ফাটল সৃষ্টি না করাই উত্তম। পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ১-২ ইঞ্চির বেশি গর্ত না হয় তবে পুকুরের তলদেশ শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

২. পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী দমন করা যায়। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মাটিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস দূরীভূত হয়।

২০২২

উপকরণ

১. পাম্প মেশিন ২. কোদাল

৩. ব্যবহারিক খাতা ৪. পেন্সিল

কাজের ধাপ।

১. নিকটস্থ কোনো পুকুরে গমন কর ।

২. পুকুরের পাড়ে পাম্প মেশিন এমনভাবে স্থাপন কর যেন মেশিনের সরবরাহ পাইপের (উবষরাবৎু ঢ়রঢ়ব) মুখ পাড় থেকে দূরে অবস্থান করে ।

৩. এবার মেশিন স্টার্ট দিয়ে পুকুরের পানি নিষ্কাশন কর ।

৪. পুকুরের তলদেশের কিছু কিছু নিচু এলাকায় পানি জমে থাকলে কোদাল দিয়ে নালা কেটে পানি মেশিনের সংগ্রহ পাইপের (Suction pipe) গোড়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে । এতে পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে ।

৫. পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা শেষ হলে পাম্প মেশিন বন্ধ করে দাও ।

৬. পুকুরের তলদেশ উত্তমরূপে শুকানোর জন্য ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোকে ফেলে রাখ ।

৭. এরপর পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ১-২ ইঞ্চির বেশি গর্ত না হয় তবে তলদেশ শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে ।

৮. এবার পুকুরের তলদেশ যথাযথভাবে শুকানো হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৯. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

অনুশীলনী- ১০: চিংড়ি ঘেরের রাক্ষুসে মাছ পরিচিতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রাক্ষুসে মাছ চিংড়ি ঘেরের জন্য অশনি সংকেত । রাক্ষুসে মাছ/চিংড়ির পোনা সবচেয়ে বড় শত্রু । অনেক সময় রাক্ষুসে মাছ চিংড়ির উৎপাদনকে দারুণভাবে ব্যাহত করে । সাধারণত রাক্ষুসে মাছ প্রাণীভাজী হয়ে থাকে । এরা ঘেরে চিংড়ির পোনা খেয়ে ফেলে ফলে চিংড়ি চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সাধারণত যে সব মাছ চিংড়ি বা অন্য মাছ খেয়ে ফেলে তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলা হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাক্ষুসে মাছের মুখ বড় এবং পরিপাক নালী ছোট হয়ে থাকে । কারণ খাদ্য শিকলের (Food chain) মাঝামাঝি থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে । অনেক রাক্ষুসে মাছের মুখে ধারালো দাঁত থাকে । আমাদের দেশে চিংড়ি ঘেরে যে সমস্ত রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে ফলি, টেংরা, বোয়াল, ভেটকি, বেলে, শোল, দাতিনা, তেড়ে প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য ।

উপকরণ

১. ঝাকি জাল ২. বালতি

২. ট্রে ৪. কাঁচি

৫. কালপেল ৬. নিডল

৭. আলপিন ৮. ফরসেপ

৯. কাচের জার ১০. ফরমালিন

১১. তুলি ১২. ব্যবহারিক খাতা

১৩. পেনসিল

ফলি মাছ: এই মাছের উভয় পার্শ্ব চাপা, মুখ চোখের মাঝ বরাবর বিস্তৃত এবং মুখের উপরের ও নিচের চোয়াল সমান। উভয় চোয়ালে দাঁত আছে। এদের কণ্ঠেও হুকের মতো বাঁকা দাঁত আছে। পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা অত্যন্ত ছোট এবং এদের লেজ অত্যন্ত ছোট। এই মাছের পরিপাকনালী অত্যন্ত ছোট। এরা স্বভাবে মাংসভোজী।

চিত্র: ফলি মাছ

টেংরো মাছ: এই জাতীয় মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় এবং নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড়। মুখ চোখ বরাবর বিস্তৃত। নিচের চোয়ালের নিচে একজোড়া দাড়ি বা শুড় (Barbel) থাকে যা উদর পাখনা পর্যন্ত পৌঁছায় না এবং উভয় চোয়ালে ভোঁতা দাঁত আছে। লেজের পাখনা দুই ভাগে বিভক্ত তবে উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত বড়। এদের পরিপাকনালী অপেক্ষাকৃত ছোট। বাংলাদেশের উপকূলীয় জলাশয়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

চিত্র: টেংরো মাছ

বোয়াল মাছ: লম্বাকৃতির এই মাছের মাথা অনেকটা অবনত এবং নিচের চোয়ালের নিম্নাংশে দুই জোড়া শুড় থাকে। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। বোয়াল মাছের মুখ চোখের পশ্চাৎ ভাগের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উপরের ও নিচের চোয়ালে দাঁত বিদ্যমান। কাঁটাবিহীন পৃষ্ঠ পাখনা আকারে অত্যন্ত ছোট এবং পায়ু পাখনা (Anal fin) লেজের (Caudal fin) সাথে সংযুক্ত নয়। এরা অত্যন্ত লাভী বা পেটুক (Voracious) প্রকৃতির মাছ এবং শিকারি স্বভাবের জন্য এরা অতি পরিচিত।

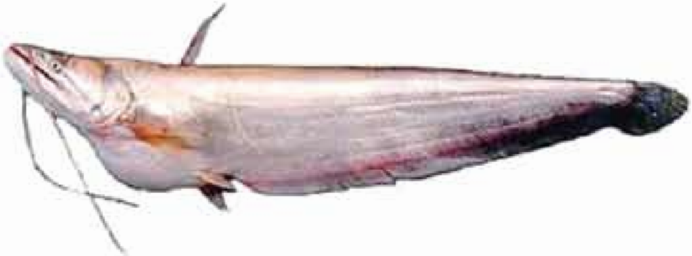

চিত্র: বোয়াল মাছ

ভেটকি মাছঃ লম্বাকৃতির এই মাছের দেহ চ্যাপ্টা। অঙ্কীয় দেশের চেয়ে এদের পৃষ্ঠদেশ বেশি উত্তল। এদের মুখের ফাঁক খুব বড় এবং চোয়াল চোখের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত। উভয় চোয়ালে দাঁত অবস্থিত। এদের চোখ দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। এদের পৃষ্ঠদেশীয় পাখনা ও পায়ু পাখনার তৃতীয় কাঁটা অত্যন্ত লম্বা এবং শক্ত। উদর পাখনা (Pelvic) বক্ষ পাখনার (Pectoral fin) চেয়ে ছোট। লেজ দেখতে অনেকটা গোলাকার। এদের পরিপাক নালী বেশ ছোট এবং স্বভাবে এরা মাংসভোজী (Carnivorous) বা শিকারি। সাগর ও উপকূলীয় জলাশয়ে এদের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময় মিঠা পানিতেও এদের পাওয়া যায়।

চিত্রঃ ভেটকি মাছ

বেলে মাছঃ এই মাছের অগ্রভাগ অনেকটা নলাকার এবং পশ্চাদ্ভাগ কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের নিচের চোয়াল অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং চোয়াল নিচের দিকে চোখের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের ঠোঁট বেশ পুরু বা মোটা এবং লেজ অনেকটা গোলাকার। এদের উভয় চোয়ালে দাঁত আছে এবং চোয়ালের সম্মুখভাগে ছেদন দাঁত অবস্থিত। মিঠা ও লোনা পানির সকল জলাশয়ে অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বত্র এই মাছ পাওয়া যায়।

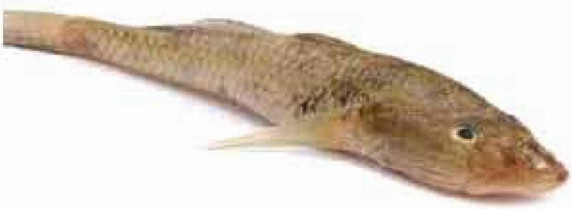

চিত্রঃ বেলে মাছ

শোল মাছঃ এই মাছের অগ্রভাগ প্রায় নলাকার তবে পশ্চাদভাগ কিছুটা চ্যাপ্টা। এদের মুখের ফাক (হাঁবক্ত) অনেক বড় এবং চোয়াল চোখের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের উভয় চোয়ালে দাঁত থাকে। শোল মাছের লেজ গোলাকার। এই জাতীয় মাছ মাংসভোজী এবং এরা বিভিন্ন জীবিত প্রাণী যেমন, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পোকা-মাকড়, কেঁচো এবং ব্যাঙাচি খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। এদের পরিপাকনালী অত্যন্ত ছোট। এরা জলাশয়ের কাদার নিচে বাস করে এবং পানি ছাড়া কাদার মধ্যে এরা কয়েক মাস বেঁচে থাকতে পারে।

চিত্রঃ শোল মাছ

উপকরণ

১. ঝাকি জাল	২. বালতি
৩. ব্যবচ্ছেদ ট্রে	৪. কাঁচি
৫. কালপৈল	৬. নিড়ল
৭. আলপিন	৮. ফরসেপ
৯. কাচের জার	১০. ফরমালিন
১১. তুলি	১২. ব্যবহারিক খাতা
১৩. পেনসিল প্রভৃতি	

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ পুকুর বা খামার থেকে বিভিন্ন জাতের রাক্ষুসে মাছ সংগ্রহ কর।

২. নমুনা মাছ সংগ্রহের বিভিন্ন তথ্য যেমন চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ, প্রতিটি নমুনা মাছের ওজন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ কর।

৩. বালতিতে করে সংগৃহীত নমুনা মাছ পরীক্ষাগারে আন।

৪. বিভিন্ন জাতের মাছ আলাদা আলাদা ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে রাখ।

৫. ফরসেপ ও নিডলের সাহায্যে বিভিন্ন জাতের মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৬. এবার প্রত্যেক জাতের একটি করে মাছকে আলপিন দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ট্রেতে আটকাও।

৭. স্কালপেল ও কাঁচি দিয়ে প্রত্যেক জাতের মাছ ব্যবচ্ছেদ করে পরিপাকনালী পর্যবেক্ষণ কর।

৮. প্রত্যেক জাতের একটি করে নমুনা মাছ কাচের জারে ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ কর।

৯. নমুনা মাছ সংগ্রহের তারিখসহ মাছের নাম কাগজে লিখে তা কাচ জারের গায়ে আঠা দিয়ে আটকাও।

১০. প্রত্যেক জাতের মাছের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

১১. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী- ১১: রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় ও প্রয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ডেরিস নামক এক ধরনের পাহাড়ি গাছের শিকড় থেকে হালকা বাদামি রঙের এই রোটেনন পাউডার উৎপাদন করা হয়। এই পাউডারের বিষক্রিয়ার ফলে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং এই বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ খাওয়ায় কোনো অসুবিধা হয় না। রোটেনন প্রয়োগে চিংড়ির কোনো ক্ষতি হয় না এবং সূর্যকিরণে এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি ঘেরে সাধারণত রাক্ষুসে মাছ দমনের জন্য রোটেনন পাউডার ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ

১. রোটেনন পাউডার	২. দুটি ছোট ড্রাম
৩. বালতি	৪. ছোট মগ
৫. ব্যালেন্স	৬. মাপার ফিতা
৭. মেজারিং পালে	৮. ক্যালকুলেটর
৯. ব্যবহারিক খাতা	১০. পেনসিল

প্রথম পর্যায়: রোটেননের পরিমাণ নির্ণয়

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গিয়ে ফিতা ও মেজারিং পালের সাহায্যে পুকুরের পানির উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং পানির গভীরতা পরিমাপ কর।

২. এবার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পানির গভীরতা গণ করে পরে পানির পরিমাণ বের কর।

৩. প্রতি ঘন মিটার পানিতে ৩ গ্রাম হিসাবে মোট রোটেননের পরিমাণ বের কর।

৪. এবার খাতায় ছক আকারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, আয়তন ও মোট রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর।

উদাহরণ:

মনে কর পুকুরের পানির উপরিভাগের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার, প্রস্থ ৬০ মিটার এবং পানির গভীরতা ১.৫ মিটার।

পুকুরে মোট পানির পরিমাণ = ১০০ × ৬০ × ১.৫ = ৯০০০ ঘনমিটার

মোট রোটেননের পরিমাণ = ৩ গ্রাম × ৯০০০ = ২৭০০০ গ্রাম

= ২৭ কিলাগ্রোম

পুকুরের দৈর্ঘ্য (মিটার)	পুকুরের পস্থ (মিটার)	পানির গভীরতা (মিটার)	আয়তন (ঘনমিটার)	রোটেননের পরিমাণ (কেজি)	মন্তব্য
১০০	৬০	১/৫	৯০০০	২৭	১০০০ গ্রাম = কেজি

৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

দ্বিতীয় পর্যায়: রোটেনন প্রয়োগ পদ্ধতি

কাজের ধাপ

১. মোট নির্ধারিত পরিমাণ পাউডারের ১/৩ ভাগ পাউডার ১ টি ছোট ড্রামে নিয়ে অল্প পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে। নেড়ে মণ্ড তৈরি কর।

২. এবার ম- দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে সেগুলো পুকুরের বিভিন্ন অংশে নিক্ষেপ কর।

৩. অবশিষ্ট ২/৩ ভাগ পাউডার অন্য একটি ড্রামে নিয়ে পানি দিয়ে ভালোভাবে দ্রবণ তৈরি কর।

৪. উক্ত দ্রবণের সাথে আরও অধিক পরিমাণ পানি মিশিয়ে তা মগ দিয়ে পুকুরের সমস্ত পানিতে উত্তমরূপে ছিটিয়ে দাও।

৫. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

অনুশীলনী- ১২: পুকুরে চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয় এবং প্রয়োগ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অনেক রোগজীবাণু প্রতিরোধের জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া পুকুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় চুনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারে বিভিন্ন প্রকার চুন পাওয়া যায়; যেমন,

ক) পাথুরে চুন (Lime stone, CaCO)

খ) কলিচুন (Slaked lime, Ca(OH),)

গ) পোড়া চুন (Quick lime, CaO)

প্রাপ্যতা, মূল্য ও কার্যকারিতা বিবেচনায় পুকুরে সাধারণত পাথুরে চুন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিংড়ি ঘেরে সচরাচর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

উপকরণ

১. ব্যালান্স	২. মেজারিং ফিতা
৩. মেজারিং পালে	৪. চুন
৫. বালতি	৬. ছোট ড্রাম
৭. ছোট মগ	৮. ক্যালকুলেটর
৯. ব্যবহারিক খাতা	১০. পেন্সিল

ক) প্রথম পর্যায়: চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

কাজের ধাপ।

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গিয়ে মেজারিং টেপ ও মেজারিং পালের সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (মিটার) পরিমাপ কর।

২. এবার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে উক্ত গুণফলকে ৪০ দিয়ে ভাগ করে শতাংশে পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর। মনে রাখতে হবে ১ শতাংশ = ৪০ বর্গ মিটার (প্রায়)।

৩. এবার ব্যবহারিক খাতায় ছক আকারে পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তন ও চুনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর।

উদাহরণ: মনে কর একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার ও প্রস্থ ৬০ মিটার।

পুকুরের আয়তন = ১০০ × ৬০ = ৬,০০০ বর্গ মিটার
= ৬,০০০/৪০
= ১৫০ শতাংশ

মোট চুনের পরিমাণ = ১.০ কেজি × ১৫০ = ১৫০ কেজি

পুকুরের দৈর্ঘ্য (মিটার)	পুকুরের পস্থ (মিটার)	আয়তন (শতাংশ)	চুন (কেজি)	মন্তব্য
১০০	৬০	১৫০	১৫০	৪০ বর্গ মিটার = ১শতাংশ এবং ১০০০ গ্রাম= কেজি

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়: পুকুরে চুন প্রয়োগ পদ্ধতি

কাজের ধাপ

১. পরিমাপকৃত চুন টিনের ড্রাম বা বালতি বা মাটির চাড়িতে ভিজিয়ে রাখ। প্লাস্টিকের পাত্রে চুন গুলানো উচিত নয়।

২. চুন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর ড্রামে বেশি পানির সাথে মিশিয়ে তরল কর।

৩. এবার চুনের দ্রবণ মগ দিয়ে সমস্ত পুকুরে ভালোভাবে ছিটিয়ে দাও। বায়ু প্রবাহের বিপরীত দিক থেকে চুন ছিটালে চোখে লাগার সম্ভাবনা থাকে এবং সর্বত্র সমানভাবে চুন প্রয়োগ করা যায় না বিধায় বাতাসের ।অনুকূলে চুন প্রয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. এবার অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

২০২২

অনুশীলনা- ১৩: পুকুরে সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ির খামারে সাধারণত দুই ধরনের সার ব্যবহার করা হয় যথা- জৈব ও অজৈব সার।

ক) জৈব সারঃ গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা।

খ) অজৈব সারঃ ইউরিয়া, টিএসপি।

পুকুর প্রস্তুতকালীন জৈব ও অজৈব সার আলাদা আলাদাভাবে বা উভয় প্রকারের সার একত্রে মিশ্রিত করে প্রয়োগ করা যায়। চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর জৈব ও অজৈব সারের মিশ্রণ নিম্ন হারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মাত্রা
গোবর	৫ কেজি / শতাংশ
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম / শতাংশ
টিএসপি	৫০ গ্রাম / শতাংশ

উপকরণ

১. ইউরিয়া সার
২. টিএসপি সার
৩. বালতি
৪. হাফ ড্রাম
৫. ছোট মগ
৬. মেজারিং টেপ
৭. মেজারিং পালে
৮. ব্যালান্স
৯. ব্যবহারিক খাতা
১০. পেনসিল

ক) সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো খামার বা পুকুরে গিয়ে মেজারিং টেপ ও মেজারিং পালের সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (মিটারে) পরিমাপ কর।

২. এবার পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করে উক্ত গুণফলকে ৪০ দিয়ে ভাগ করে শতাংশে পুকুরের আয়তন নির্ণয় কর ১ শতাংশ = ৪০ বর্গমিটার (প্রায়)।

৩. শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ৫ কেজি গোবর সার হিসেবে মোট ইউরিয়া, টিএসপি ও গোবর সারের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উদাহরণঃ মনে কর পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার ও প্রস্থ ৬০ মিটার।

পুকুরের আয়তন = ১০০ × ৬০ = ৬,০০০ মিটার
= ৬,০০০ বর্গ মিটার/৪০
= ১৫০ শতাংশ

১. মোট ইউরিয়া সারের পরিমাণ = ১০০ গ্রাম × ১৫০
= ১৫০০০ গ্রাম
= ১৫ কেজি

২. মোট টিএসপি সারের পরিমাণ = ৫০ গ্রাম × ১৫০
= ৭৫০০ গ্রাম
= ৭.৫ কেজি

২০২২

৩. মোট গোবর সারের পরিমাণ = ৫ কেজি × ১৫০
= ৭৫০ কেজি

৪. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ) পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কাজের ধাপ

১. পুকুরে সার প্রয়োগের ১ দিন আগে টিএসপি সার বালতি বা হাফ ড্রামে ভিজিয়ে রাখ।

২. সার ব্যবহারের দিন ইউরিয়া ও গোবর সার আলাদা আলাদা ড্রাম বা বালতিতে গুল।

৩. এবার ইউরিয়া, টিএসপি ও গোবর সার একত্রে একটি বড় ড্রামে বেশি পানির সাথে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি কর।

৪. সারের দ্রবণ বালতিতে নিয়ে পুকুরের উপরিভাগে ছোট মগের সাহায্যে সর্বত্র উত্তমরূপে ছিটিয়ে দাও।

৫. অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

সাবধানতা

১. টিএসপি সার সহজে পানিতে গুলে না। তাই ব্যবহারের আগের দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২. চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর সারের মিশ্রণ পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুশীলনী- ১৪: পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিংড়ি ঘেরে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদানের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে যে সব খাদ্য তৈরি হয় তাকে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশে উন্নত সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য দুই ধরনের যথা- ১. উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন (Phytoplankton) ও প্রাণী প্ল্যাংকটন (Zooplankton)।

উপকরণ

১. ছিপিসহ কাচের বোতল	২. প্ল্যাংকটন নেট
৩. ফানেল	৪. ড্রপার
৫. জেট বোতল	৬. পরিশ্রুত পানি
৭. মাইক্রোস্কোপ	৮. স্লাইড কভারসহ গ্লাস
৯. ব্যবহারিক খাতা	১০. পেনসিল ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামারে গমন কর।

২. খামারের কোনো পুকুর থেকে ১০ লিটার পরিমাণ পানি প্ল্যাংকটন নেট দিয়ে হেঁকে সংগৃহীত প্ল্যাংকটন জেট বোতল ও ফানেলের সাহায্যে বাতেলে নিয়ে পানিসহ বোতল পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।

৩. বোতলটি সামান্য একটু ঝাঁকে নিয়ে ড্রপার দিয়ে বোতল থেকে পানি নিয়ে গ্লাস স্লাইডের উপর এক ফোঁটা নমুনা পানি রাখ এবং স্লাইড কভার দিয়ে পানি ঢেকে দাও।

৪. এবার মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্লাংকটন আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. নিচে অঙ্কিত প্রাণী ও উদ্ভিদ প্লাংকটন চিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্লাংকটন শনাক্ত কর।

৬. এবার পর্যবেক্ষণকৃত প্রাণী প্লাংকটন ও উদ্ভিদ প্লাংকটনের ছবিগুলো পেনসিল দিয়ে ব্যবহারিক খাতায় আঁক।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

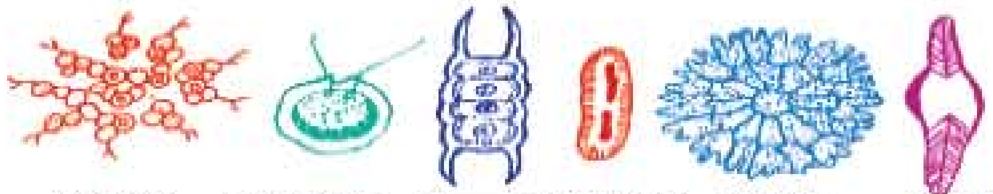

চিত্রঃ উদ্ভিদ প্লাংকটন

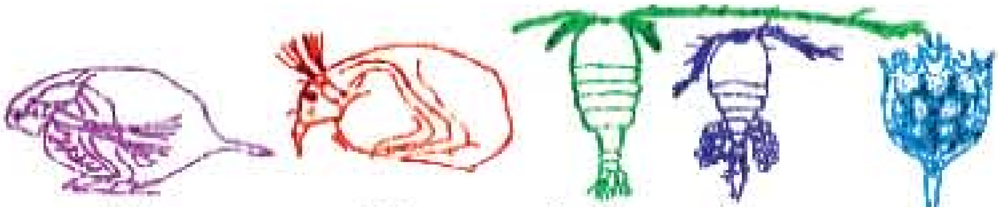

চিত্রঃ প্রাণী প্লাংকটন

অনুশীলনী- ১৫: সেকি ডিস্ক তৈরি ও পানির স্বচ্ছতা পরীক্ষাকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

খামারের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্লাংকটনের পরিমাণের ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। সাধারণত পানির স্বচ্ছতা পরিমাপ করে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পানির স্বচ্ছতা ২৫-৪০ সেমি মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ প্লাংকটন বিদ্যমান আছে। সাধারণত সেকি ডিস্ক দিয়ে পানির স্বচ্ছতা পরীক্ষা করা হয়। সেকি ডিস্ক হচ্ছে কাঠের বা ভারী টিনের তৈরি একটা গোলাকার চাকতি বিশেষ। এই গোলাকার চাকতির উপরিভাগ চারটি সমান অংশে ভাগ করে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাদা ও কালো রং লাগিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই চাকতির কেন্দ্রে সুতা বা একটা শক্ত কাঠের লাঠি স্থাপন করে এই সুতা বা লাঠি সেন্টিমিটারে দাগাঙ্কিত করা হয়। তবে ২৫ সেমি ও ৪০ সেমি এ অবশ্যই স্পষ্টভাবে দাগাঙ্কিত করা হয়।

উপকরণ

১. একটি গোলাকার চাকতি
২. মোটা সুতা
৩. সাদা ও কালো রং
৪. তুলি
৫. স্কেল
৬. অমুছনীয় মার্কিং পেন
৭. ব্যবহারিক খাতা
৮. পেনসিল

ক) প্রথম পর্যায়: সেক্কি ডিস্ক তৈরির পদ্ধতি

কাজের ধাপ।

১. লাহোর বা ভারী টিনের একটি গোলাকার চাকতি সংগ্রহ কর।

২. চাকতিটির উপরিভাগকে স্কেল দিয়ে মেপে সমান চারভাগে বিভক্ত কর।

৩. এবার গোলাকার চাকতির উপরিপৃষ্ঠের চারটি অংশকে তুলির সাহায্যে সাদা ও কালো রং দিয়ে চিহ্নিত কর।

৪. চাকতিটির কেন্দ্র বিন্দুতে একটি ছোট ছিদ্র কর।

৫. কেন্দ্রের এই ছিদ্র দিয়ে একটি মোটা সুতা ঝুলিয়ে দাও।

৬. এবার স্কেল দিয়ে সুতাটিকে সেন্টিমিটারে অমুছনীয় কালি দিয়ে দাগাঙ্কিত কর।

৭. সুতাটির ২৫ সেমি ও ৪০ সেমি এ বিশেষভাবে অমুছনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত কর।

৮. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়: সেক্কি ডিস্কের ব্যবহার পদ্ধতি

১. নিকটস্থ কোনো পুকুর বা খামারে গমন কর।

২. এবার সাবধানে পুকুর পাড় থেকে বা পানিতে নেমে সেক্কি ডিস্কটি আস্তে আস্তে পানিতে ছেড়ে দাও।

৩. সেক্কি ডিস্কটি পানিতে ছেড়ে দেয়ার সময় গোলাকার চাকতিটির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখ।

৪. গোলাকার চাকতিটি পানিতে উঠানামার সময় যখন চাকতির সাদা-কালো রং অস্পষ্টভাবে দেখা যাবে। তখন পানির উপরিতল থেকে সুতার পরিমাপ গ্রহণ কর। পানির উপরিতল থেকে সুতার যে পরিমাপ পাওয়া যাবে সেটাই সেক্কি ডিক রিডিং। এই সেক্কি ডিস্ক রিডিং পানির স্বচ্ছতা নির্দেশ করে।

৫. এবার সেক্কি ডিক রিডিং খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৬. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী- ১৬: প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. গলদা চিংড়ি যদিও মিঠা পানির চিংড়ি তবে ডিম ছাড়ার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের আধা লবণাক্ত পানির জলাশয়ে এরা জীবনের কিছু সময় অতিবাহিত করে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাসমূহে অর্থাৎ সাতক্ষীরা থেকে কক্সবাজার জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় নদীসমূহে গলদার পোনা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত উপকূলীয় নদীসমূহে গলদার পানা পাওয়া যায়। সাধারণত খুবই ঘন ছিদ্রযুক্ত জাল বা মশারী জাল দিয়ে উপকূলীয় নদী থেকে গলদার পোনা সংগ্রহ করা হয়।

২০২৫

২. গলদা চিংড়ির পোনার (১৮-৯০ মিমি) ক্যারাপেসে বা শিরোবক্ষের খোলসে লম্বালম্বি কয়েকটি রেখা দেখা যায়। ছোট পোনার ক্ষেত্রে ১ টি এবং অপেক্ষাকৃত বড় পোনার ক্ষেত্রে ৭-৮ টি লম্বালম্বি রেখা দেখা যায়। এছাড়া গলদা পোনার উদর খন্ডকের সংযোগস্থলে নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ দেখা যায় যা জীবনের অবশিষ্ট সময়েও অবিকৃত থাকে। রোস্ট্রামের উপরে ও নিচে দাঁত থাকে এবং এই অবস্থায় স্বেচ্ছায় সাঁতার কাটতে পারে। পিএল অবস্থায় এদের গায়ের রং সাধারণত স্বচ্ছ দেখায় এবং মাথায় হালকা বাদামি রঙের রঞ্জন কণা দেখা যায়।

উপকরণ

১. টিনের থালা
২. ঝিনুক
৩. সিলভারের পাতিল
৪. গলদার পোনা
৫. মেজারিং ফ্লাক
৬. আতশ কাচ
৭. ড্রপার
৮. পরিশ্রুত পানি
৯. ফরসেপ
১০. গ্লাস স্লাইড
১১. ট্রে
১২. ব্যবহারিক খাতা
১৩. পেনসিল ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো নদীর তীরবর্তী পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে গমন কর।
২. পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের কোনো পোনা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সুস্থ ও সবল পোনা সংগ্রহ কর।
৩. টিনের থালায় পানিসহ কিছু পোনা নিয়ে সেগুলো সুস্থ ও সবল কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৪. এবার বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পোনাগুলো পানিভর্তি মেজারিং ফ্লাকে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।
৫. পরীক্ষাগারে এসে মেজারিং ফ্লাক থেকে কিছু পোনা পানিসহ টিনের থালায় রাখ।
৬. ড্রপারের সাহায্যে ১টি পোনা পানিসহ ট্রেতে রক্ষিত গ্লাস স্লাইডের উপরিতলে রাখ এবং গ্লাস আইডের উপর এক ফোঁটা পরিশ্রুত পানি দাও।
৭. এবার আতশ কাচ দিয়ে পোনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৮. পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।
৯. পেনসিল দিয়ে পানার চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন কর।
১০. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী- ১৭: গলদা খামারের বাঁধ ও খাল নির্মাণ কৌশল পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাঁধ: পুকুরের পানিধারণ ও বন্যা বা জোয়ারের পানি প্রবেশ বন্ধ করাই বাঁধ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। যে এলাকায় পুকুর নির্মাণ করা হবে সেই এলাকার ৫-১৫ বছরের সর্বোচ্চ জোয়ারের উচ্চতা জেনে বাঁধের উচ্চতা নির্ধারণ করা উচিত। বাঁধের মাটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে বাঁধের উচ্চতা কমে যায় বলে বাঁধ নির্মাণের সময় তা প্রয়োজনের চেয়ে ০.৬-০.৭ মিটার অতিরিক্ত উঁচু করা দরকার। বাঁধের ঢাল ভেতরের দিকে ১:১ এবং বাইরের দিকে ১ ও ২ অনুপাতে রাখা যায়।

খাল: যে সব গলদা পুকুর পানি সরবরাহের উৎসের নিকটবর্তী নয়, সে সমস্ত পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য পৃথক নালা নির্মাণ করা উচিত। পুকুরের পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের জন্য খালের তলদেশ পুকুরের তলদেশ থেকে কিছুটা নিচু থাকা প্রয়োজন।

উপকরণ

১. মেজারিং পালে	২. মেজারিং টেপ
৩. ব্যবহারিক খাতা	৪. পেন্সিল ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো গলদা খামারে গমন কর।

২. নির্মাণাধীন পুকুরের বাঁধ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. মেজারিং পালে ও মেজারিং টেপ দিয়ে বাঁধের বাইরের ও ভেতরের দিকের ঢাল পরিমাপ কর এবং এই ঢালের অনুপাত খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

৪. বাঁধের উচ্চতা, চূড়া ইত্যাদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে এগুলো পরিমাপ কর।

৫. বাঁধের মাটি যথাযথভাবে নিবিড়করণ (Compaction) করা হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৬. বাঁধ বৃষ্টির পানিতে যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘাসের চাপড়া লাগানো হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর

৭. এবার সরবরাহ খালের তলদেশের উচ্চতা পুকুরের চেয়ে কিছুটা উঁচু এবং নিষ্কাশন খালের তলদেশের। উচ্চতা পুকুরের তলদেশের চেয়ে কিছুটা নিচু কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৮. খালের তলদেশের প্রশস্ততা ও খালের গভীরতা মেজারিং পালে ও মেজারিং টেপ দিয়ে পরিমাপ কর।

৯. সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল দিয়ে পুকুরের প্রয়োজনমত যথাসময়ে সরবরাহ ও নিষ্কাশন করা সম্ভব কিনা তা পর্যবেক্ষণ কর।

১০. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

প্রথম অধ্যায়

গলদা চিংড়ির আহরণ ও বাজারজাতকরণ

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে আহরণ। সুষ্ঠুভাবে চিংড়ি আহরণের ওপর নির্ভর করে চিংড়ি চাষের সফলতা। চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সফলভাবে চিংড়ি চাষ করে চিংড়ির সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায় না। আহরণের সময় চিংড়িকে অক্ষত রেখে অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি আহরণ করা উচিত। স্বল্প সময়ে আহরণ করলে চিংড়ির গুণগতমান ভালো থাকে এবং ক্রেতার নিকট থেকে ভালো দাম পাওয়া যায়। এজন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

আহরণের সময়

চিংড়ি কখন আহরণ করতে হবে তা সাধারণত চিংড়ির গড় ওজন ও বাজার দরের ওপর নির্ভরশীল। তবে খামার বা পুকুরের পরিবেশগত অবস্থা ঠিক থাকলে গলদা চিংড়ি ৬-৮ মাসের মধ্যেই বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়ে উঠে। চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমার "জো"/" গোন"-এর সময় চিংড়ির আহরণ করা হয়। পুকুরের ৫% এর বেশি চিংড়ির খোলস নরম থাকলে চিংড়ি আহরণ করা ঠিক নয়। খোলস বদলানোর মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়ি আহরণ করা উত্তম। সাধারণত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা কাটালের ২-৩ দিন পর অধিকাংশ চিংড়ির খোলস শক্ত থাকে এবং মরা কাটালের পর সাধারণত অধিকাংশ চিংড়ির খোলস নরম থাকে। তাই ভরা কাটালের সর্বোচ্চ জোয়ারের ২-৩ দিন পরই চিংড়ি আহরণের উত্তম সময় এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ও চিংড়ি ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে পুকুর হতে চিংড়ি ধরাই হচ্ছে আহরণ। লাভজনকভাবে চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য। পুকুর হতে দুভাবে গলদা আহরণ করা যায়। যেমন- (১) আংশিক আহরণ ও (২) সম্পূর্ণ আহরণ। প্রত্যেক পুকুরের একটি নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা থাকে। ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে গেলে সে পুকুরে চিংড়ির উৎপাদন হার কমে আসে। অথচ পুকুরে তখনও সার ও খাদ্য প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হয়। ফলে চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। পুকুরের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি বড় চিংড়িগুলো ধরে ফেলা হয়। তবে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় এবং এতে সার্বিক উৎপাদনও বেশি হয়। সে কারণে সুযোগ থাকলে চিংড়ির আংশিক আহরণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়াও আংশিক আহরণে চুরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং সময় মত বিক্রি করে ভালো বাজারমূল্যও পাওয়া যায়। তবে আংশিক বা সম্পূর্ণ যে কোনো পদ্ধতিতেই আহরণ করা হোক না কেন চিংড়ি আহরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

- চিংড়ির আকার ও ওজন
- চিংড়ির মোট জীবভর
- বাজারমূল্য ঝুঁকি
- পুনঃমজুদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা

২০২২

আকার ও ওজন

স্বভাবগতভাবে চিংড়ি ঝুঁকে চলার কারণে এক সাথে সবার বৃদ্ধি সমান হয় না। তাই অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভের জন্যে বড় চিংড়িগুলোকে আহরণ করে ছোটগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত। এজন্যে যখনই মাছ ও চিংড়ি নিম্নে বর্ণিত ওজন বিশিষ্ট হয় তখনই আহরণ করা উচিত।

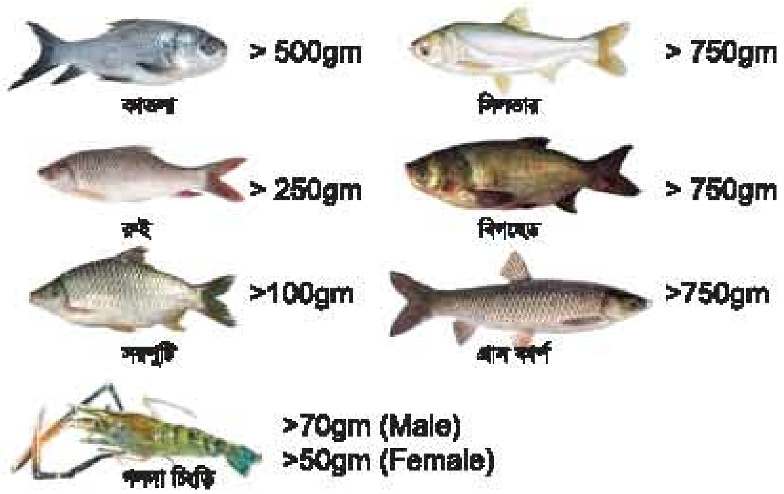

প্রজাতি ভিত্তিক আহরণযোগ্য ওজন

জীবভর

জীবভর হলো পুকুরে মজুদকৃত সমস্ত চিংড়ির মোট ওজন। জীবভর শতাংশ প্রতি ৭.৫ কেজির বেশি রাখা উচিত নয়। এতে পুকুরের পানি মাছ ও চিংড়ি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। তাই যখনই জীবভর প্রতি শতাংশে ৭.৫ কেজির বেশি হবে তখনই বড় চিংড়িগুলো আহরণ করা উচিত।

বাজার দর

যেহেতু মাছ ও চিংড়ি চাষের সাথে আর্থিক লাভের একটি সম্পর্ক রয়েছে, তাই আহরণের সাথে মাছ ও চিংড়ির দামের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজার দর বিভিন্ন এলাকায় ও ঋতুতে কমবেশি হয়ে থাকে। লাভজনক দামের প্রতি খেয়াল রেখেই মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত। এ ছাড়াও চিংড়ি আহরণে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হয়। যেমন- নমুনায়নের সময় যদি দেখা যায় হাঁটার বড় পায়ের চিমটার ওপরের অংশ নীল বা কালো রঙের হয়ে গেছে তাহলে চিংড়ির আর দৈহিক বৃদ্ধি হবে না। ফলে পুকুর থেকে এসব চিংড়ি তুলে ফেলাই লাভজনক। সাধারণত পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে বড় হয়ে থাকে। সে কারণে অধিকাংশ চাষিরাই তাদের পুকুরে পুরুষ চিংড়ির মজুদ রাখতে আগ্রহ দেখায়। এ ক্ষেত্রে নমুনায়ন বা আংশিক আহরণের সময় পরিপক্ব স্ত্রী চিংড়ি তুলে ফেলে পুরুষ চিংড়ি পুনঃমজুদ করা যায়। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির ওজন ৩০-৪০ গ্রাম হলে স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়।

আহরণ পদ্ধতি

মাথাসহ ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের চিংড়ি আহরণ করা লাভজনক। সাধারণত এ ওজনে পৌঁছানোরে পরপরই চিংড়ি আহরণ শুরু করা হয়। চিংড়ি আহরণের জন্য সাধারণত ঝাঁকি বা খেপলা জাল, বেড় জাল অথবা বাঁশের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। তবে চিংড়ি চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই আহরণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ি সাধারণত দুই পদ্ধতিতে আহরণ করা হয়; যথা

১. নির্বাচন পদ্ধতি ও

২. সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি।

১. নির্বাচন পদ্ধতিতে আহরণ

বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতির আলোকে নির্বাচন পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতিতে যেমন পার্থক্য আছে ঠিক তেমনি আহরণ পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে চিংড়ি আহরণের উপায়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

(ক) মিশ্র চাষ পদ্ধতির আহরণ

এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে মাছের ওজন ৫০০ গ্রাম হলে এবং চিংড়ির ওজন ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম (মাথাসহ) হলে এদের ধরে ফেলা উচিত। সাধারণত পোনা মজুদের ৩ মাস পর থেকে জাল টেনে উপরোক্ত ওজনের মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে বাজারজাত করা দরকার। বিশেষ করে বড় চিংড়ি আহরণ করা উচিত। কেননা চিংড়ি স্বভোজি প্রাণী। ফলে বড় ও সবল চিংড়ি সদ্য খোলস পাল্টানো ছোট দুর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মিশ্র চাষের পুকুরে চিংড়ি আহরণের জন্য সাধারণত খেপলা জাল, বেড় জাল ও বাঁশের চাই ব্যবহার করা হয়। তবে বাঁশের চাই ব্যবহার করে চিংড়ি আহরণ করা ভালো। এতে ছোট চিংড়ির আঘাত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) দলগত চাষ বা ব্যাচ কালচার পদ্ধতির আহরণ

এ পদ্ধতিতে একই সময়ে একই বয়সের চিংড়ির পোনা পুকুরে মজুদ করা হয়। ৩-৪ মাস পর চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হলে প্রতি মাসে জাল টেনে বড় চিংড়িগুলো আগেই ধরে ফেলা হয় এবং ৭-৮ মাস পর পুকুরের সম্পূর্ণ পানি বের করে দিয়ে বাকি চিংড়ি আহরণ করা হয়।

(গ) অনবরত চাষ পদ্ধতির আহরণ।

এ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর প্রতি "জো" তে জাল দিয়ে বড় আকারের চিংড়ি আহরণ করা হয় এবং আহরণকৃত চিংড়ির সমপরিমাণ পোনা পুনরায় উক্ত পুকুরে মজুদ করা হয়। পরবর্তীতে অধিকাংশ চিংড়ি বিক্রয়যোগ্য আকারে পরিণত হলে পুকুরের সম্পূর্ণ পানি বের করে বাকি চিংড়ি ধরে ফেলা হয়। সম্প্রসারিত বা উন্নত হালকা সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে এভাবে চিংড়ি আহরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত পোনা মজুদের ৬-৭ মাস পর থেকেই এই পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা শুরু হয়।

২. সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি

সনাতন, উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতি বা আধা-নিবিড় চাষ ইত্যাদি সকল প্রকার চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ফলন আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে চিংড়ির মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে আহরণ সুবিধাজনক।

চিত্রঃ আহরিত চিংড়ি

চিংড়ি আহরণের আগে চাষির নিম্নবর্ণিত প্রস্তুতি ও আহরণকালীন সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত

- উপযুক্ত পরিবহন যানসহ চিংড়ির ক্রেতা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা
- ভোর রাতে চিংড়ি ধরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ধৃত চিংড়ি ভালোভাবে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির সরবরাহ রাখা।
- অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় এবং তারপর দুদিন গলদা চিংড়ি না ধরা, এসময় বেশির ভাগ গলদা চিংড়ির খোলস নরম থাকে।
- ধরার সময় চিংড়ি যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা
- চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা
- মাটি, ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, পাটের চট ইত্যাদির ওপর চিংড়ি না রেখে মসৃণ পাকা প্লাস্টিক সিটের ওপর রাখা

মাছ আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম

পুকুর বা জলাশয়ের আয়তন এবং মাছ আহরণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই আহরণের জাল বা ফাঁদ নির্বাচন করা হয়। গলদা চিংড়ি আহরণে সাধারণত নিম্নবর্ণিত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়ঃ

(১) বেড় জাল

(২) ঝাঁকি জাল

(৩) ট্র্যাপ (ঘুর্নি, দুয়াড় ইত্যাদি)

(৪) পানি নিষ্কাশন

(১) বেড় জাল

যদি পুকুর আয়তনে বড় হয় এবং বেশি পরিমাণে মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেড় জালের ফাঁসের আকার ১/২ ইঞ্চি হওয়া উচিত। জাল উচ্চতায় পানির গভীরতার দ্বিগুণ এবং লম্বায় পুকুরের দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে দেড়গুণ হওয়া উচিত। একই পুকুরে একই দিনে দুবারের বেশি জাল টানা উচিত নয়। এতে মাছ ও চিংড়ির উপর চাপ পড়ে এবং ছোট মাছ ও চিংড়িগুলো আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যেতে পারে। জাল টানার পর যথাশীঘ্র বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে ছোটগুলো ছেড়ে দেয়া উচিত।

চিত্রঃ চিংড়ি আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জাল ও ফাঁদ

(২) ঝাঁকি জাল

যদি স্বল্প পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে ঝাঁকি জালই উত্তম। মাছ ও চিংড়ি ধরার ২০-২৫ মিনিট আগে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থানে ৩-৫টি খাদ্য বল দিলে এদের ধরা সহজ হবে।

(৩) ট্র্যাপ

ঘুনি, দুবাড়ু খোছনা ইত্যাদি পেতে রেখে চিংড়ি আহরণ ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

(৪) পানি নিষ্কাশন

চিংড়ির আহরণের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করে চিংড়ি আহরণ করা হয়।

গলদা চিংড়ির গ্রেডিং

	মাথসহ প্রতি		মাথসহ ছাড়া
গ্রেড	কেজিতে সংখ্যা	গ্রেড	প্রতি ৫০০ গ্রামে সংখ্যা
৫	৫ পর্যন্ত	৫	৫ পর্যন্ত
১০	৬ - ১০	৮	৬ - ৮
২০	১১ - ২০	১২	৯ - ১২
৩০	২১ - ৩০	২০	১৩ - ২০
৫০	৩১ - ৫০	৩০	২১ - ৩০

আহরণোত্তর পরিচর্যা

বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল। সে কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রায়শই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম এবং উৎপাদিত পণ্যের আশানুরূপ দাম পেতে হলে পুকুর থেকে চিংড়ি আহরণের পর বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না। এতে দ্রুত চিংড়ির পচন ধরে এবং চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় চিংড়ির খোলস, ফুলকা, পাকস্থলী ও দেহের অন্যান্য অংশে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। কিনতু চিংড়ি জীবিত থাকা অবস্থায় এর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তবে মারা যাওয়ার পর সাধারণ তাপমাত্রায় ব্যাক্টেরিয়া চিংড়িকে অতি দ্রুত আক্রমণ করে ফলে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় চিংড়ির দেহস্থ প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে চিংড়ির পচন অধিক দ্রুত হয়।

আহরণোত্তর পরিচর্যাকালীন বিবেচ্য বিষয়

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালের নিচে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গা অথবা প্লাস্টিক শিটের ওপর রাখা যাতে চিংড়ির গায়ে কোনো ময়লা, ঘাসের টুকরা ইত্যাদি লাগতে না পারে।
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালোভাবে ধুয়ে শীতল করা
- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ/ঠান্ডা পানির ট্যাংকে সর্বোচ্চ ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখা যাতে করে চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়
- বরফ মিশ্রিত পানি থেকে চিংড়ি তুলে প্লাটফর্ম বা টেবিলের উপর রেখে চিংড়ি বাছাই করা
- নরম খোলসযুক্ত চিংড়ি ও রোগাক্রান্ত চিংড়ি পৃথক করে ফেলা
- সুস্থ সবল চিংড়ি আকার অনুসারে গ্রেড করা

পুনঃমজুদ

বেশি উৎপাদন পেতে হলে পুকুরের মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা চক্র সারাবছর ধরে চালু রাখতে হবে। উৎপাদন চক্র চালু রাখার জন্যে যখনই যে প্রজাতির যতগুলো মাছ বা চিংড়ি আহরণ করা হবে সে প্রজাতির ততটি মাছ ও চিংড়ি এবং ১০-১৫% অতিরিক্ত পোনা বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। সাধারণত ১০% পোনা মাছ বা জুভেনাইল মার যেতে পারে এ বিবেচনায় অতিরিক্ত চারা পোনা বা জুভেনাইল ছাড়তে হবে অর্থাৎ যদি ১০০টি মাছ বা চিংড়ি ধরা হয় তবে ১১০-১১৫ টি চারা পোনা বা জুভেনাইল ছাড়তে হবে। এ মজুদ পদ্ধতিই হলো পুনঃমজুদ। এজন্য মাছ আহরণের পূর্বেই চারা পোনা বা জুভেনাইলের প্রাপ্যতা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন।

চিংড়ি পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয়।

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহন করা
- দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহন না করা।
- সব সময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা।
- পরিবহনে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত ১:১ হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।
- পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
- ২০২২ প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলা পাটি, চট ও কলাপাতা ব্যবহার না করা। এক্ষেত্রে ফুড গ্রেডেড প্লাস্টিকের বাকেট ব্যবহার করতে হবে।

- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি কারখানায় পৌঁছানো
- পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা

চিংড়ি বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবহন বাক্সে বা পাত্রের তলায় একস্তর বরফ দিয়ে তার ওপর একস্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বরফ ও চিংড়ি সাজানারে পরে সবার ওপরে পুরু করে একস্তর বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানারে সময় খেয়াল রাখা উচিত যেন পাত্রে ২ ফুট এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানো না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

বাংলাদেশে সাধারণত বাজারজাতকরণের জন্য ডিপোতে বা অবতরণ কেন্দ্রে চিংড়ি বরফজাতকরণ করে প্যাকিং করা হয়। পরিবহন দূরত্বের ওপর নির্ভর করেই সাধারণত বরফ ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরিবহন সময়ের ওপর নির্ভর করে নিম্নহারে বরফ ব্যবহার করা হয়।

পরিবহন সময়	বরফ ও চিংড়ির অনুপাত
১২-১৮ ঘন্টা	১:১
১৮-২৫ ঘন্টা	১.৫:১
২৪-৪৮ ঘন্টা	২:১

চিংড়ি পরিবহনের সময়ের সাথে তার গুণগতমান অনেকাংশেই বরফ টুকরার আকারের ওপর নির্ভরশীল। পরিবহন সময় অনুযায়ী বরফ টুকরার আকার নিচে দেয়া হলো:

পরিবহন সময়	বরফ টুকরার আকার
১২ ঘন্টা	বরফ গুড়া / বরফ কচি
১২-২৪ ঘন্টা	ছোট / মাঝারি বরফ টুকরা

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবহন পাত্র বা বাক্সের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপরে এক স্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চিংড়ি ও বরফ সাজানারে পরে সবার উপরে পুরু করে এক স্তর বরফ দিয়ে ভেজা চটের ছালা বা হোগলার চাটাই দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানারে সময় খেয়াল রাখা উচিত যেন পাত্রে ৬০ সেমি এর বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানো না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ির দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

বাংলাদেশের বিপণন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ির কোনো সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে চিংড়ি চাষি ও ক্রেতাদের মধ্যে বহু মধ্যবর্তী লোক বিপণনের সাথে জড়িত। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের চিংড়ির মতো একটি মূল্যবান সম্পদ

২০২২

সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে কোনো সঠিক জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময় উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চিংড়ি চাষিরা চিংড়ির ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। চিংড়ি সরাসরি পুকুর থেকে ফড়িয়া বা মধ্যবর্তী লোকদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় চলে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ির মাথা ও খোসা ছাড়ানোসহ অন্যান্য পরিচর্যা করা হয়। এসময় চিংড়ি বিভিন্ন ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এভাবে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না গ্রহণ করায় নিম্নবর্ণিত কারণে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পৌছানারে পূর্বেই চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

১. অসাবধানতাবশত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ি আহরণ করা

২. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আহরণকৃত চিংড়ি সংরক্ষণ করা

৩. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফের ব্যবহার না করা

৪. চিংড়ি ধৌত করার কাজে অপরিষ্কার ও কর্দমাক্ত পানি ব্যবহার করা

৫. খোলা আকাশের নিচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো, খোসা ছাড়ানো প্রভৃতি কার্যাদি সম্পন্ন করা।

৬. পরিবহনকালে অপরিষ্কার নোংরা যানবাহনে বহন করা, পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার না করা এবং বরফ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি সাধারণত কোন সময় আহরণ করা হয় ?

২. কত ওজনের চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য লাভজনক ?

৩. গলদা চিংড়ি কয়টি পদ্ধতিতে আহরণ করা হয় ?

৪. অনবরত চাষ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের কয় মাস পর থেকে সাধারণত চিংড়ি আহরণ করা শুরু হয় ?

৫. আহরণকৃত চিংড়ি বরফ মিশ্রিত পানিতে কত সময় ডুবিয়ে রাখতে হয় ?

৬. চিংড়ির নতুন খোলস শক্ত হতে সাধারণত কত দিন প্রয়োজন হয় ?

৭. পরিবহন সময় ১২-১৮ ঘণ্টা হলে বরফ ও চিংড়ি ব্যবহারের অনুপাত কত হবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ি আহরণে চিংড়ির প্রাকৃতিক স্বভাবগুলো বর্ণনা কর।

২. চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চিংড়ির আহরণোত্তর পরিচর্যা বর্ণনা কর।

৪. বাংলাদেশের চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৫. যেসব কারণে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছার পূর্বেই চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায় তা বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ির আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. গলদ চিংড়ির বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চিংড়ির গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার কৌশল বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছ/চিংড়ির পচন

মাছ/চিংড়ির মৃত্যুর পর যে প্রক্রিয়ায় এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন স্বাভাবিক গঠন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি ঘটে তাকে পচনক্রিয়া বলে। মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পরে মাছ/চিংড়ির পেশি নরম হয়ে যায় এবং মাছ/চিংড়িকে সহজে বাকানো যায়। কিন্তু কিছু সময় পরে মাছ/চিংড়ির পেশি ক্রমে শক্ত হতে শুরু করে এবং কিছু সময়ের মধ্যে শক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাছ/চিংড়ির ফুলকা ও উপাঙ্গসমূহ কিছুটা প্রসারিত হয়। এ সময় পেশিতে আঙুল দিয়ে টিপ দিলে পেশি দেবে যাওয়ার পর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। মাছ/চিংড়ির এ অবস্থা তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে এবং কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। মাছ/চিংড়ির মৃত্যুর পর তার পেশিতে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে দেহ শক্ত হয়ে যাওয়ার পরপরই মাছ/চিংড়ির পচন শুরু হয়। পচন দুভাবে হতে পারে।

(১) রাসায়নিক পচন বা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পচন

(২) ব্যাকটেরিয়াজনিত পচন

(১) রাসায়নিক পচন বা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পচন

এটি দুভাবে হয়ে থাকে। যথা-

(ক) দৈহিক এনজাইমঘটিত পচন

(খ) র‍্যানসিডিটি

(ক) দৈহিক এনজাইমঘটিত পচন

জীবিত অবস্থায় যেসব এনজাইম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে সেগুলো মাছের মৃত্যুর পর প্রোটিন, চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট এর ব্যাপক ভাঙন ঘটায়, ফলে দেহে সাধারণ পচন শুরু হয়। এই পচনকে স্বয়ংক্রিয় পচনও বলে। দৈহিক এনজাইমের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপের মাধ্যমে পেশীকে দুর্বল করে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশে ও বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই এনজাইমের কার্যকারিতায় পেশীর প্রোটিন ধারাবাহিকভাবে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ যেমন- গুয়ানিন, পিউরিন ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এগুলোর আরো ভাঙনের ফলে বিভিন্ন দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থ উৎপন্ন করে এবং মাছকে তিক্ত ও কটু স্বাদযুক্ত করে।

(খ) র‍্যানসিডিটি

চর্বিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে এই ধরনের রাসায়নিক পচন ঘটে। - মাছের চর্বি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এগুলো জারিত হয় ফলে মাছ হালকা খয়েরী বর্ণ ধারণ করে। র‍্যানসিডিটির ফলে অনেক সময় মাছের পেট ফেটে যায় এবং জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হতে থাকে। এই প্রকার পচনের কারণে মাছ/চিংড়ির স্বাদ ও গন্ধ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। মাছ/চিংড়িকে

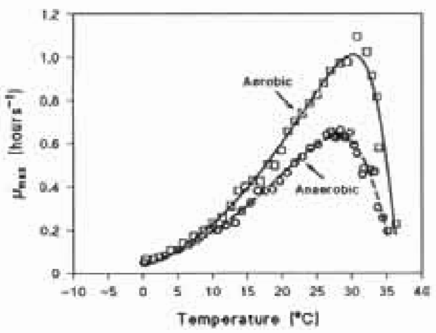

চিত্রঃ মাছের পচনের উপর সময় ও তাপমাত্রা

র‍্যানসিডিটি থেকে রক্ষা করার জন্য জারণ নিরোধক পলিফেনল দ্রবণে সিক্ত করার পরে লবণজাত করা হয়। হিমায়িত করার পূর্বে মাছ/চিংড়ির দেহের ওপর বরফের আস্তরণ করা হয় এবং তা দ্রুত ২০° সে. তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়। বিশুদ্ধ লবণ ব্যবহার করে চর্বিযুক্ত মাছ/চিংড়ির র‍্যানসিডিটি কমানো যায়।

(২) ব্যাকটেরিয়াজনিত পচন

সদ্য আহরিত মাছ/চিংড়ির পেশিতে এবং দেহ রসে সাধারণত কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে না। তবে মাছ/চিংড়ির ফুলকা, অন্ত্র ও ত্বকীয় শ্লেষ্মায় প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্যাকটেরিয়া মাছ পচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এরা মাছ/চিংড়িকে খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে তোলে। জলীয় পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া সহজে বিস্তার লাভ করে। আহরণের সময়ই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় লাভ করে। সুস্থ ও সবল মাছ/চিংড়ি জীবিত অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে দেহে একটি প্রতিবন্ধক কৌশল সৃষ্টি করে রাখে যা মৃত্যুর পর আর কার্যকর থাকে না। ফলে দেহস্থিত এনজাইমের স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রমের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত পেশি ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ উপযোগী হয় এবং তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। মাছ/চিংড়ির দেহে জলীয় ভাগ অনেক বেশি থাকায় ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার লাভে আরও সুবিধা হয়। মাছ/চিংড়ির দেহস্থিত ছাড়াও আহরণোত্তর পরিচর্যাকালে এবং অবতরণ কেন্দ্র হতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া মাছের দেহে প্রবেশ করে। এসব ব্যাকটেরিয়া মাছ/চিংড়ির খুব দ্রুত ও ব্যাপক পচন ঘটাতে সাহায্য করে। নিচে মাছ/চিংড়ির পচনে সহায়ক কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার নাম দেয়া হলো:

১) অ্যারোমোব্যাক্টার
২) সিউডোমোনাস
৩) ফ্লাভো ব্যাকটেরিয়াম
৪) মাইক্রোকক্কাস
৫) ফটো ব্যাকটেরিয়াম
৬) অ্যারোমোনাস
৭) ক্লস্ট্রিডিয়াম
৮) ভিব্রিও ব্যাকটেরিয়াম

পচন রোধের উপায়সমূহ

মাছ/চিংড়ি মানুষের কাছে একটি আকর্ষণীয় খাদ্য। কিন্তু আহরণের পর খুব সহজেই এর খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। আর এ জন্য আহরণের পরপরই পচন রোধের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে মাছ/চিংড়ির পচন দুটি কারণে ত্বরান্বিত হয়, যথা সময় ও তাপমাত্রা।

সময়: মাছ/চিংড়ি আহরণের পর থেকে বাজারজাত বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যবর্তী সময় যত বেশি হবে মাছ/চিংড়ির পচন তত বেশি হবে। সে কারণে মাছ/চিংড়ি আহরণের পরে পরিবহন ও বাজারজাতকরণে যত কম সময় ব্যয় হয় ততই মাছ/চিংড়ি বেশি টাটকা বা তাজা থাকবে।

তাপমাত্রা: মাছ/চিংড়ির পচনে সহায়ক অন্যতম কারণ হলো তাপমাত্রা। তাপমাত্রা ০° সে. থেকে ৫° সে. এ বাড়ালে তাজা মাছ/চিংড়ির পচনের হার স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে জন্য আহরণের পরপর মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা কমানো গেলে সহজে মাছ/চিংড়িকে পচন থেকে রক্ষা করা যায়। এজন্য মাছ/চিংড়িকে

কখনোই সরাসরি রোদে বা কোনো গরম স্থানে রাখা উচিত নয়। সুতরাং মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের মূলনীতি হলো এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার দ্বারা পচন সহায়ক কারণসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। মাছ/চিংড়ির পচন রোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়।

ক) পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা

খ) ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ রহিতকরণ ব্যবস্থা।

গ) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ

(ক) পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো আহরিত মাছ/চিংড়ি যেন পচনশীল অন্যকোনো বস্তুর সংস্পর্শে এসে দূষিত না হয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেন মাছ/চিংড়িকে কলুষিত করতে না পারে। আহরিত মাছ/চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্রে আনার সময় এদের খাদ্যনালী, দেহ গহ্বর ও ফুলকায় প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। এছাড়া শরীরের বাহিরাংশে শ্লেষ্মায়ও প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। উপরনতু নড়াচড়া বা পরিচর্যাকালে ধুলোবালি, কাদা-ময়লা ও অপরিষ্কার পানি বা বরফ ইত্যাদির দ্বারা মাছ/চিংড়ি কুলষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যা মাছ/চিংড়ির পচনকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং মাছ/চিংড়িকে উত্তমরূপে ধৌতকরণের এবং ফুলকা ও অন্ত্র অপসারণের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে মাছ/চিংড়ির পচনকে অনেকটা কমানো যায়।

(খ) ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ রহিতকরণ

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশলে মাছ/চিংড়ির দেহের বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে থামিয়ে দিয়ে মাছ/চিংড়িকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কৌশলসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) নিম্নতাপ ব্যবহারে পচন রোধ

(২) আর্দ্রতা অপসারণের মাধ্যমে পচন রোধ

(৩) সংরক্ষক দ্রব্য ব্যবহার

(১) নিম্নতাপ ব্যবহারে পচন রোধের উপায়ঃ বরফ দিয়ে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা ব্যাহত করা হয়। যেমন- শীতলীকরণ ও হিমায়িতকর-ণ।

(২) আর্দ্রতা অপসারণের মাধ্যমে পচন রোধঃ এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মাছের দেহের পানি অপসারণ বা কমিয়ে ফেলা হয়। এটা প্রাকৃতিকভাবে যেমন- সূর্যালোক বা কৃত্রিম উপায়ে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে করা হয়। মাছ/চিংড়ির শরীরের আর্দ্রতা এমন এক মাত্রায় কমানো হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়া ও এনজাইমের কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন- লবণায়ন, শুষ্ককরণ বা শুটকিকরণ, ধূমায়িতকরণ ও নিরুদিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ/চিংড়ির পচন রোধ করা যায়।

(৩) সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে পচন রোধঃ বিভিন্ন সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে মাছ/চিংড়িকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় বা সংরক্ষিত মাছ/চিংড়ির সংরক্ষণ সময় দীর্ঘায়িত করা যায়। মাছ/চিংড়ির সংরক্ষক হিসেবে ভিনেগার (ডাইলুটেড অ্যাসিটিক অ্যাসিড) ও লবণ ব্যবহার করা হয়। তাজা বা হিমায়িত

মাছ/চিংড়ি সাধারণ তাপমাত্রায় এনে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এ মাছ/চিংড়িকে ৫-১০% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ১০-১৫% লবণের দ্রবণে এক সপ্তাহ বা বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয়। এ অবস্থায় মাছ/চিংড়ির আমিষ জমাট বেঁধে যায়। এসব মাছ/চিংড়ি তখন ১-২% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ২-৪% লবণ দ্রবণে চূড়ান্তভাবে বোতলজাত করা হয়। এভাবে বোতলজাত মাছ/চিংড়িকে ০° সে তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৩ মাস ভালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

(গ) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ

এই পদ্ধতিতে আহরিত মাছ/চিংড়িকে পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে গুণগতমান সম্পন্ন রাখার জন্য উচ্চ তাপমাত্রায় বায়ুরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে টিনজাতকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ড সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রে রাখার দরুন নতুন করে কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের সুযোগ পায় না। এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত মাছ/চিংড়ির স্বাভাবিক মৌলিক স্বাদের কিছুটা পরিবর্তন হলেও গুণাগুণের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

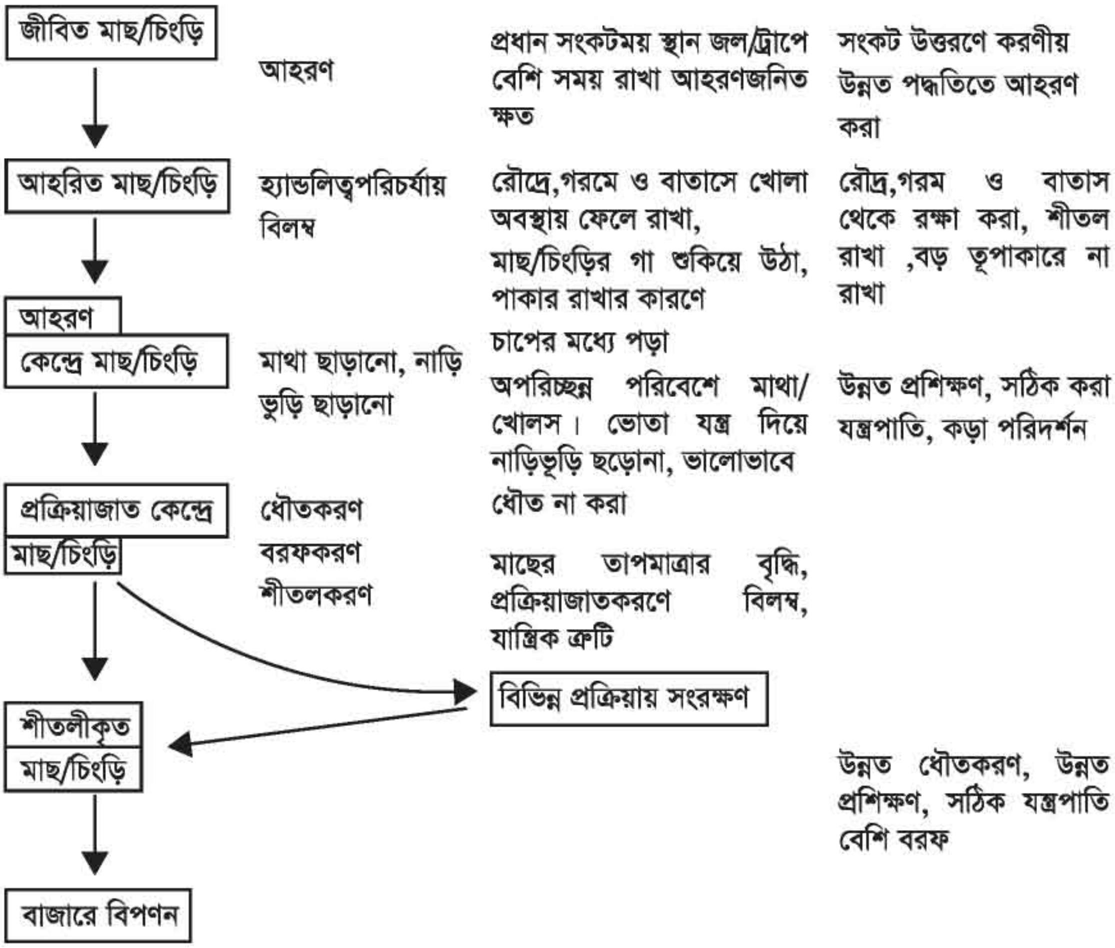

চিত্রঃ মাছ/চিংড়ির আহরণোত্তর সাধারণ পরিচর্যার ফ্লোচার্ট

২০২২

নিম্নতাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ

মাছ/চিংড়ির পচনের জন্য এর তাপমাত্রা, সেহেতু এনজাইম, ব্যাকটেরিয়া ও মাছ/চিংড়ির ভিতরকার জলীয় অংশ বিশেষভাবে দায়ী। প্রক্রিয়াজাত মাছ/চিংড়ি এমন প্রতিকূল অবস্থায় পচে নষ্ট না হয় সেজন্য একে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সুতরাং মাছ/চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ হলো মাছ/চিংড়ি আহরণের পর হতে বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক পরিচর্যার মাধ্যমে একে মানুষের রুচিসম্মত ও খাদ্যমান সম্পন্ন খাদ্য উপকরণ হিসেবে প্রস্তুত করার পদ্ধতি। আর মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ হলো প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির এমন একটি শাখা যেখানে একটি সতেজ মাছ/চিংড়িকে পচনের হাত হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা রহিত করা হয়। তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে মাছ/চিংড়ির শরীরে বিদ্যমান পানি বরফে পরিণত হয় ফলে মাছ/চিংড়ির গুণাগুণ দীর্ঘ দিনের জন্য অক্ষুন্ন থাকে। নিম্নতাপে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো হলো- শীতলকরণ, হিমায়িতকরণ প্রভৃতি। চিংড়ি ও মাছজাত দ্রব্যকে স্বল্প তাপমাত্রায় রেখে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার আসল গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখার পদ্ধতিকে নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ বলা হয়। আহরণের পর সতেজ মাছ/চিংড়িকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করাই হলো নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের মূলনীতি। কোনো দ্রব্য বা মাছ/চিংড়িকে নিম্ন তাপমাত্রায় রাখলে নিম্নবর্ণিত যে কোনো বা সবগুলো ঘটনা ঘটে।

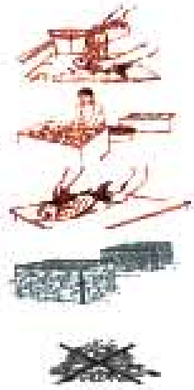

চিত্র: নিম্ন তাপমাত্রায় চিংড়ি সংরক্ষণ

(ক) অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতা হ্রাস: প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ার বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। তাপমাত্রা কমানোর ফলে ব্যাকটেরিয়ার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এতে এদের কর্মতৎপরতাও কমে যায়। তাপমাত্রা যত কম হবে ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতাও তত কম হবে। নিম্ন তাপমাত্রায় সাইক্রোফিলিক ব্যাকটেরিয়ার কর্মতৎপরতাও কমে যায়। এমনকি ৩.৩° সে. তাপমাত্রার নিচে সকল প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। স্বল্প তাপমাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার কর্মক্ষমতা হ্রাসের মূল কারণ হলো-এ অবস্থায় এদের বিপাকীয় কর্মকাণ্ড কমে যায়, তবে তাপমাত্রা ১০° সে. এর নিচে গেলে সকল প্রকার ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্রম বন্ধ হয়।

(খ) এনজাইমের কর্মক্ষমতা হ্রাস: নিম্ন তাপমাত্রায় এনজাইমসমূহের কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং তাপমাত্রা যতই কমে, এনজাইমের কর্মক্ষমতাও ততই কমতে থাকে। দেখা গেছে তাপমাত্রা -১° সে. এর নিচে সকল এনজাইমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) জারণ হ্রাস: মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর চর্বি থাকে। এসব চর্বি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ তাপমাত্রায় এসব ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত হয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাপমাত্রা যতই কমানো হয় জারণ ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াও ততই কমে যায় এবং ১৯৬° সে তাপমাত্রায় জারণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তবে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় জারণ হ্রাসের জন্য নির্দিষ্ট সীমায় তাপমাত্রা হ্রাস করা ছাড়াও মাছ/চিংড়ি যাতে সরাসরি বাতাসের সংস্পর্শে না আসে সেজন্য প্রক্রিয়াজাত মাছের উপর দিয়ে পাতলা বরফের স্তর সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। উপরে বর্ণিত ঘটনাবলির মাধ্যমে মাছ/চিংড়ির মাংসপেশি ও অন্যান্য অংশ বহুদিন পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকে। ফলে এর স্থায়িত্বকাল বা সেলফ লাইফ বেড়ে যায়।

নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের প্রকারভেদ

তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(১) **শীতলীকরণ:** এ প্রক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা ০° সে. এর কাছাকাছি আনা হয় এবং ৭-৮ দিন পর্যন্ত মাছ/চিংড়ির গুণাগুণ ভালো অবস্থায় থাকে।

(২) **হিমায়িতকরণ:** এ প্রক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা -৩০° সে. থেকে -৪০° সে. পর্যন্ত নামানো হয় এবং ৬ থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

শীতলীকরণ

স্বল্প সময়ের জন্য মাছ/চিংড়ির সজীবতা রক্ষার্থে শীতলীকরণ অত্যন্ত সুবিধাজনক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি আনা হয়, তবে হিমাঙ্কের নিচে নয়। এ পদ্ধতি খুব দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণে শীতলীকরণ পদ্ধতি অনুপযোগী। আহরণের পরপরই যদি মাছ/চিংড়িকে অন্তর্বর্তীকালীন সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় যেমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ, অবতরণ কেন্দ্র থেকে বাজারে বা প্রক্রিয়াজাত কারখানায় প্রেরণের প্রয়োজন হয় তবে এ পদ্ধতি অবলম্বনে ভালো ফল পাওয়া যায়। শীতলীকরণের প্রধান লক্ষ্য হলো মাছের তাপমাত্রাকে ০° সে. এর কাছাকাছি নিয়ে আসা।

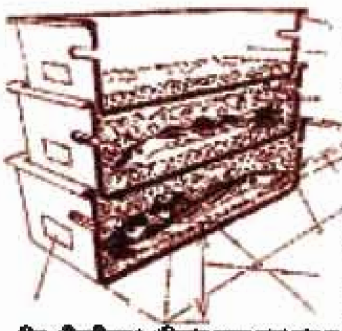

চিত্র: শীতলীকরণ পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণের সুবিধাজনক বাক্স

শীতলীকরণের উপায়সমূহ

(ক) বরফ ব্যবহার করে।

(খ) সংরক্ষক ও বরফ ব্যবহার করে

(গ) হিমায়িত সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করে

ক) বরফ ব্যবহার করে

নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। স্বাদু পানি থেকে উৎপাদিত টুকরো বা গুড়ো বরফ ব্যবহার করে মাছ/চিংড়িকে আচ্ছাদিত করা হয়। ফলে মাছের পচন সাময়িকভাবে রোধ করা যায়। কারণ:

- সঠিকভাবে মাছ/চিংড়ির তাপমাত্রা (০° সে. - ৪° সে.) কমিয়ে আনার ফলে এনজাইম, জারণ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পরিবর্তন কমিয়ে দেয়
- বরফগলা পানি মাছ/চিংড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত করে এবং ব্যাকটেরিয়া, রক্ত, শ্লেষ্মা ইত্যাদি ধৌত করে।

বরফ ব্যবহার করে শীতলীকরণে বরফ ও মাছ/চিংড়ির অনুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনের তাপমাত্রা ও শীতলীকরণের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে বরফ ও মাছ/চিংড়ির অনুপাত নির্ণয় করা হয়। শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১ঃ২ এবং গ্রীষ্মকালে ১:১ ব্যবহার করা হয়।

মাছ/চিংড়িকে বরফ দ্বারা সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের বাক্স ব্যবহার করা হয়। এ বাক্সকে ফিস ক্রেট বলা হয়। প্রথমে বাক্সের তলদেশে ২-২.৫ ইঞ্চি পুরু করে বরফ বিছানো হয়। এরপর কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা করে মাছ সাজানো হয়। এবার আবার এক স্তর বরফের আচ্ছাদন দেয়া হয়। এভাবে বরফ ও মাছ/চিংড়ি পর্যায়ক্রমে সাজানোর পর ওপরে বরফের আচ্ছাদন দিয়ে বাক্স পূর্ণ করা হয়। উপরে বরফ এমনভাবে দিতে হয় যেন সামান্য ফাঁকা থাকে যাতে মাছ/চিংড়িতে অধিক চাপ না পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে বরফ ব্যবহার করে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে মাছ/চিংড়ি সরবরাহের ক্ষেত্রে এরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বেশ সুবিধাজনক। কারণ বরফের দাম কম এবং ররফ সহজে পরিবহন করা যায়। যে কোনো সময় নতুন করে বরফ ব্যবহার করা যায়। সর্বোপরি এটি একটি সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো বরফ খন্ড সুষম না হলে মাছ সাজানোর পর সামান্য চাপে মাছের দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মাছ/চিংড়ির প্রকল্প	দিন	
	উচ্চ গুনাগুন	খাওয়ার উপযোগী
শীত প্রধান এলাকার মাছ/চিংড়ি	২-৩	৬-৯
উচ্চ এলাকার মাছ/চিংড়ি	১-১৫	৪-৬

খ) সংরক্ষক ও বরফ ব্যবহার করে

অনেক সময় সংরক্ষিত মাছের গুণাগুণ ভালো রাখার জন্য ও বরফের গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য বরফের সাথে কিছু ব্যাকটেরিয়ানাশক বা অন্য যে কোনো ধরনের সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলোর নাম নিচে দেয়া হলো:

- সোডিয়াম বেনজোয়েট
- ফিউমারিক অ্যাসিড
- কার্বন ডাই অক্সাইড
- ডাই সোডিয়াম ফসফেট
- বেনজোয়িক অ্যাসিড
- সোডিয়াম নাইট্রাইট
- হাইড্রোজেন পার অক্সাইড

এগুলো ছাড়াও কিছু অ্যান্টিবায়োটিক যেমন- ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন এবং অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ব্যবহৃত হয়।

২০২২

গ) হিমায়িত সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করে

চিত্র: মডিফাইড এ্যাটমোসফেয়ার প্যাকিং করা শীতলীকৃত চিংড়ি

বরফ ব্যবহারের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সামুদ্রিক পানিতে মাছ/চিংড়িকে ডুবিয়ে রেখে শীতলীকরণ করা যায়। সামুদ্রিক ট্রলারে এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। ট্রলারের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক পাত্র বা ট্যাংকে সমুদ্রের পানি যান্ত্রিকভাবে কমপ্রেসর এবং কুলিং পাইপের সাহায্যে বা বরফ মিশ্রিত করে ২০° সে. তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয়। বৃহৎ ফ্রিজিং ট্রলারে আহরিত মাছকে হিমায়িতকরণের পূর্বে এভাবে শীতলীকরণ করা হয়। ফলে মাছের তাপমাত্রা কমে পচন রোধ হয় এবং তরল মাধ্যম হওয়ায় ময়লা রক্ত, বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি সহজে বিদূরিত হয়।

মডিফাইড অ্যাটমোসফেয়ার প্যাকিং: শীতলীকরণের বর্ণিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও মডিফাইড এ্যাটমোসফেয়ার প্যাকিং পদ্ধতি খুচরা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের জন্য সম্প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে তাজা মাছ বা মাছ/চিংড়ি পরিচ্ছন্ন করার পর বিশেষ ধরনের পাতলা প্লাস্টিকের ব্যাগ বা ট্রে'র মধ্যে রাখা হয় যাতে খুচরা ক্রেতাদের জন্য সহজে প্রদর্শন করা যায়। ব্যাগ বা ট্রেগুলোকে বায়ুশূন্য করে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ করা হয় এবং শক্তভাবে মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ০° সে. এর তাপমাত্রা রক্ষা করার ফলে শীতলকৃত দ্রব্যের সংরক্ষণ মেয়াদের চেয়ে অতিরিক্ত আরও ৫০% বেশি সময় পর্যন্ত গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব।

হিমায়িতকরণ

হিমায়িতকরণ পদ্ধতি শীতলীকরণ পদ্ধতি হতে অধিক কার্যকর। মাছ/চিংড়িকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। হিমায়িতকরণ পদ্ধতিতে মাছ/মৎস্যজাত দ্রব্যের দেহের তাপমাত্রা হিমায়ন যন্ত্র ব্যবহার করে ৮° সে. বা তারও কম রাখা হয়। সাধারণত মাছ/চিংড়িকে-৩০° সে. থেকে-৪০° সে. তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়।

মাছ হিমায়িতকরণে তাপমাত্রার প্রভাব

মাছের শরীরে প্রচুর পানি থাকে যা ০° সে. তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয় না। কারণ এ পানির সাথে লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ১° সে. তাপমাত্রায় মাছের দেহের পানি জমতে শুরু করে এবং ৫° সে. তাপমাত্রায় প্রায় ৮০% পানি বরফে পরিণত হয়। এ অবস্থায় অহিমায়িত পানিতে লবণের ঘনত্ব ক্রমে বাড়তে থাকে। ফলে মাছ পূর্ণ হিমায়িত হতে আরও বেশি তাপমাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। -৩০° সে. তাপমাত্রায় ও মাছের ভিতরের ১০% পানি অহিমায়িত থাকে। -৩৫-৪০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। মাছ/চিংড়ি হিমায়িতকরণে তিনটি স্তরে তাপমাত্রা নিচের দিকে নামে। প্রথম স্তরে তাপমাত্রা খুব দ্রুত এবং ভালভাবে ০° সে. বা এর সামান্য নিচ পর্যন্ত নামে। দ্বিতীয় স্তরে তাপমাত্রা ০°-১° সে. পর্যন্ত নামে ঐখানে প্রায় স্থির থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে তাপমাত্রা আরও নিচে নামে এবং অবশিষ্ট অহিমায়িত অংশ হিমায়িত হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হিমায়িতকরণে দ্বিতীয় স্তরে, সবচেয়ে সময় বেশি লাগে এবং ঐ সময়ে তাপমাত্রা সহজে নিচে নামে না বা খুব সমান্য নিচে নামে। এই স্তর বা সময়টাকে হিমায়িতকরণের সংকটকাল বলা হয়। কারণ ভালোভাবে মাছ/চিংড়িকে হিমায়িত করতে হলে এ সময়টা অতি দ্রুত অতিক্রম করতে হবে। তা না হলে হিমায়িত মাছ/চিংড়ির গুণাগুণে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তৃতীয় স্তরে এসে তাপমাত্রা আরও নিচে নামে এবং অবশিষ্ট অহিমায়িত অংশ হিমায়িত হয়।

শীতলীকরণ ও হিমায়িতকরণের মধ্যে পার্থক্য:

শীতলীকরণ	হিমায়িতকরণ
১. শীতলীকরণ হচ্ছে মাছ সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মাছের শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে সে হিমাঙ্কের কাছাকাছি আনা হয় তবে দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয় না।	১. হিমায়তিকরণ হচ্ছে মাছ সংরক্ষণের এমন পদ্ধতি যাতে মাছের দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে ১৮° বা আরো নিচে আনা হয়
২. মাছের দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয় না	২. দেহস্থ পানির অণুগুলো বরফে পরিণত হয়
৩. এটা একটা স্বল্পকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি	৩. অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ পদ্ধতি
৪. সাধারণত বরফ বা শীতল সামুদ্রিক পানি	৪. বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজারের সাহায্যে করা হয় ব্যবহার করা হয়
৫. এক্ষেত্রে অনুমোদিত তাপমাত্রা ০°-৪° সে	৫. অনুমোদিত তাপমাত্রা -৩৫-৪০° সে.
৬. এটা একটা সহজ পদ্ধতি, কম ব্যয় সাপেক্ষ এবং যে কোনো বড় যান্ত্রিক নৌকায় করা সম্ভব	৬. অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি এবং বড় ট্রলার, মাদারশীপ ও প্রসেসিং প্লান্টে করা হয়।

হিমায়ক যন্ত্রের প্রকারভেদ

(ক) এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার

(খ) কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার

(গ) ইমারশন ফ্রিজার

(ঘ) শার্প ফ্রিজার

(ক) এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার

এ প্রকার ফ্রিজারের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের বাষ্প প্রবাহিত করে মাছ বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যকে হিমায়িত করা হয়। এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

(১) অনবরত ফ্রিজার: এ প্রকার ফ্রিজারে হিমায়িতকরণের সময় দ্রব্য বা Product ঘুরতে থাকে। হিমায়কের ভিতর এক পাশ থেকে মাছ বা দ্রব্যাদি ঢোকানো হয় এবং অন্য পাশ দিয়ে হিমায়িত উৎপাদন বের করা হয়।

(২) ব্যাচ ফ্রিজার: ব্যাচ মাছ/চিংড়ি বা দ্রব্য ঢোকানো হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে হিমায়িত করা হয়।

বিভিন্ন ফ্রিজারের মধ্যে এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ এর ব্যবহারে সুবিধাগুলো হচ্ছে:

- এ জাতীয় ফ্রিজার বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হয়
- এ জাতীয় ফ্রিজারে হিমায়িতকরণে কম খরচ করা হয়
- হিমায়তকরণের সময় কম পরিচর্যা করলেই চলে ২০২২

ফ্রিজারের মধ্যে সারি সারি র‍্যাকের সেলফ মাছ দ্বারা ভর্তি করা হয় এবং চারপাশ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত করা হয়। মাছ/চিংড়ি সাজানো র‍্যাককে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় বা স্থির রাখা যায়। উন্নতমানের এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে সাজানো মাছ/চিংড়িকে সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করার জন্য কনভেয়র ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত ফ্রিজারে প্রবাহিত বায়ুর তাপমাত্রা -৩৫-৪০° সে. এর মধ্যে রাখা হয় এবং বায়ু প্রবাহের গতি সাধারণত প্রতি মিনিটে ৫০০ থেকে ১০০০ ফুটের মধ্যে রাখা হয়। এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে হিমায়িতকরণে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা সময় লাগে। প্রতিটি মাছ/চিংড়ি পৃথকভাবে হিমায়িত (Individual Quick Frozen বা IQF) করার জন্য এই ফ্রিজার ব্যবহৃত হয়।

ফ্রিজার বার্ণঃ এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারের মধ্যে ঠান্ডা বাতাসের গতিবেগ ৫০০ এফপিএম নিচে হলে মাছ/চিংড়ির দেহের আশেপাশে জলীয় বাষ্পের চাপ কমে যায়, মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে যেতে থাকে এবং মাছ/চিংড়ির দেহ শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। ফলে মাছ/চিংড়ির বর্ণ ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিমায়িত করার সময় মাছ/চিংড়ির দেহে এরূপ প্রভাবকে ফ্রিজার বার্ন বলে।

গ্লেজিংঃ ফ্রিজার বার্ন ও জারণ থেকে মাছ/চিংড়িকে রক্ষা করার পদ্ধতিকে গেজিং বলে। এ পদ্ধতিতে মাছের দেহের ওপরে বরফের একটি পাতলা আবরণ সৃষ্টি করা হয় যাতে দেহ থেকে সহজে পানি বের হয়ে যেতে না পারে এবং জারণ বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাছ/চিংড়িকে খুবই নিম্ন তাপমাত্রায় খুবই অল্প সময়ের জন্য জলীয় বাষ্পের দ্রবণে ডুবানো হয়। ফলে মাছ/চিংড়ির দেহের ওপরে বরফের একটি আস্তরণ পড়ে।

(খ) কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার

এ ধরনের হিমায়ক যন্ত্রে মাছ/চিংড়িকে সরাসরি হিমায়িত প্লেটের ওপর রেখে হিমায়িত করা হয়। কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার নিম্নলিখিত চার প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) প্লেট

(২) ব্যান্ড

(৩) রোটারি

(৪) ড্রাম

চিত্রঃ কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার

এগুলোর মধ্যে প্লেট ফ্রিজার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ফ্রিজারে মাছ/চিংড়িকে ফাঁপা ধাতুর প্লেটের মধ্যে রাখা হয় যার মধ্যে শীতলীকরণের জন্য রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার তাপ নিরোধক পৃথক কক্ষে (Insulated room) স্থাপিত থাকে যেখানে মাছকে প্যাকেট বা ব্লক সদৃশ আকারে হিমায়িত করা হয়। প্রতিটি মাছ/চিংড়ির ব্লক ৫০-৬০ মিলিমিটার পুরু হয়। ব্লক তৈরির জন্য প্লেটগুলোকে সংযুক্ত পাইপের সাহায্যে ঠান্ডা লবণ পানি (Cald brine), অ্যামোনিয়া বা রেফ্রিজারেন্ট ১২ বা ২২ প্রবাহিত করা হয়। ফলে মেটাল প্লেটের তাপমাত্রা -৩৫- ৪০° সে. হয়ে থাকে। তুলনামূলক দ্রুত হিমায়িতকরণের জন্য কন্টাক্ট প্লেট ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত মাছ/চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট ছোট মাছ ব্লক আকারে এই প্রকার ফ্রিজে হিমায়িত করা হয়।

(খ) ইমারশন ফ্রিজার

এ ক্ষেত্রে মাছকে নিম্ন তাপমাত্রার তরল পদার্থে ডুবানো বা নিমজ্জিত করা হয়। এভাবে সরাসরি ঠান্ডা তরলের মধ্যে রেখে মাছের দেহের তাপমাত্রা কমানোর পদ্ধতি এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ থেকে উৎকৃষ্ট। পানির ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েন্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ইমারশন ফ্রিজারের কোনো আদর্শ নকশা নেই এবং এর বিভিন্ন ব্যবহার বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হয়। সাধারণত ঠান্ডা লবণ পানি অথবা কোন রেফ্রিজারেন্ট বাষ্পকে পাম্প এর সাহায্যে ক্রমাগত মৎস্যজাত দ্রব্যের ওপর প্রবাহিত করা হয় অথবা মৎস্য দ্রব্যকে একমুখী ঠান্ডা দ্রবণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। মাছ ধরার ট্রলারে মাছ/চিংড়ি হিমায়িতকরণে অধুনা লবণ পানির দ্রবণের সাথে ২০% গ্লুকোজ এবং ২০% খাবার লবণ যোগ করে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইমারশন ফ্রিজারে মাছ ধরার ট্রলারে প্যাকেটকৃত নয় (unpacked) এমন মাছের হিমায়িতকরণের জন্য উপযুক্ত।

চিত্র: ইমারশন ফ্রিজিং কার্যক্রম

(ঘ) শার্প ফ্রিজার

শার্প ফ্রিজার একটি পৃথক ইনসুলেটেড বা তাপ নিরোধক ঘর যার তাপমাত্রা -২৫° সে. রাখা হয় । এ ফ্রিজারে বিভিন্ন আকারের কয়েল দ্বারা তৈরি সেলফ থাকে যার ভিতর দিয়ে ঠান্ডা লবণ পানি, অ্যামোনিয়া বা অন্যান্য রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করা হয় । হিমায়িতকরণের সময় মাছ/চিংড়িকে সরাসরি সেলফে বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি প্যানের ওপর রাখা হয় । এ পদ্ধতিতে তাপমাত্রার পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয় । কারণ মৎস্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ উপরিভাগ (surface area) ফ্রিজারের পাইপের সংস্পর্শে থাকতে পারে না এবং ফ্রিজারের ভিতর বায়ু চলাচল সীমিত । এ প্রকার হিমায়ন পদ্ধতি ধীরগতি সম্পন্ন ও পুরাতন বিধায় এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত ।

হিমায়িতকরণের সময়

আধুনিক ফ্রিজারে একটি শীতলকৃত মাছের দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে -৫-৩০° সে. এ নিয়ে আসতে ৪ ঘন্টা বা তারও কম সময় লাগে । কোনো দ্রব্যের গড় তাপমাত্রা -৩০° সে. এ নামিয়ে আনতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে ফ্রিজিং সময় বলে । এ ফ্রিজিং সময় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যেমন

(১) ফ্রিজারের প্রকারভেদের উপর: হিমায়িতকরণে কী ধরনের ফ্রিজার ব্যবহার করা হবে তার ওপর ফ্রিজিং সময় নির্ভর করে । যেমন একই তাপমাত্রায় ব্লাস্ট ফ্রিজারের চেয়ে ইমারশন ফ্রিজারে দ্রব্যের ফ্রিজিং সময় কম লাগে ।

(২) অপারেটিভ তাপমাত্রা: যে তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করা হবে তার ওপর ফ্রিজিং সময় নির্ভর করে । ফ্রিজারের তাপমাত্রা যত কম হবে মাছ তত তাড়াতাড়ি ফ্রোজেন হবে ।

(৩) ব্লাস্ট ফ্রিজারের বায়ুর গতি: বাতাসের গতিবেগ যত বেশি হবে ফ্রিজিং সময় তত কম লাগবে । যেমন -৩৫° সে তাপমাত্রায় বায়ুর গতিবেগ যদি ৫ মিটার প্রতি সেকেন্ডে হয় তবে ফ্রিজিং সময় উল্লেখযাগ্যভাবে কমে যাবে ।

(৪) প্রাথমিক তাপমাত্রা: হিমায়নযোগ্য দ্রব্যের প্রাথমিক তাপমাত্রা বেশি হলে তার ফ্রিজিং সময় বেশি হবে । সে কারণে মাছ হিমায়িতকরণের আগে শীতলীকরণ করা উচিত। শীতলীকরণ ছাড়া দ্রব্যের ফ্রিজিং সময় শীতলীকৃত দ্রব্যের চেয়ে ৪০% বেশি লাগে ।

(৫) দ্রব্যের আকার: দ্রব্যের আকার, আকৃতি বা গঠনের উপর ফ্রিজিং সময় নির্ভর করে । যেমন- কোনো উৎপাদের গুরুত্ব বেশি হলে তাকে ফ্রিজিং করতে সময় বেশি লাগবে । নিয়মিত দ্রব্যের চেয়ে অনিয়মিত দ্রব্যের ফ্রিজিং করার সময় বেশি লাগে ।

(৬) প্লেট ফ্রিজারের সংস্পর্শের মাত্রা: প্লেট ফ্রিজারে প্লেটের সাথে দ্রব্যের সংস্পর্শ যত বেশি হবে তার ফ্রিজিং সময়ও কম লাগবে ।

(৭) প্যাকেজিং-এর অবস্থা: দ্রব্যের পদ্ধতি ও প্যাকিং সামগ্রীর ওপর ফ্রিজিং সময় নির্ভর করে । প্যাকেট যদি বেশি পুরু হয় এবং প্যাকেট তৈরির দ্রব্য যদি তাপ সুপরিবাহী হয় তবে সেক্ষেত্রে ফ্রিজিং সময় বেশি লাগে ।

২০২২

(৮) মাছের প্রকৃতি: যে মাছের দেহে পানির পরিমাণ বেশি থাকে সে মাছ থেকে তাপমাত্রা কম বের হয়। অর্থাৎ তার ফ্রিজিং সময় তুলনামূলকভাবে বেশি। একইভাবে চর্বিযুক্ত মাছের চর্বিহীন মাছের চেয়ে ফ্রিজিং সময় কম। যেমন- রুই মাছের চেয়ে ইলিশ মাছের ফ্রিজিং সময় কম লাগে। কারণ রুই মাছে চর্বির পরিমাণ ২-৩% এবং পানির পরিমাণ বেশি কিন্তু ইলিশ মাছে চর্বির পরিমাণ ১৩% এবং পানির পরিমাণ কম। এছাড়াও আঁইশবিহীন মাছের চেয়ে আঁইশযুক্ত মাছের ফ্রিজিং সময় বেশি লাগে।

হিমায়িত মাছ/চিংড়ির সংরক্ষণ সময়কাল

হিমায়িত মাছ/চিংড়ির সংরক্ষণ সময়কাল মাছটির সংরক্ষণ পূর্ব সময়ে কতটুকু তাজা ছিল তার উপর নির্ভর করে। মৎস্যগ্রহণের উন্নত ব্যবস্থাপনা ও ক্রমাগতের প্রাথমিক সতর্কতা অনুযায়ী হতে থাকে। আহরণের পর মাছ ও চিংড়ি ২ - ৩ দিনের মধ্যে হিমায়িত করা প্রয়োজন। এ সময় পর্যন্ত অবশ্যই মাছ/চিংড়িকে শীতলীকৃত অবস্থায় রাখতে হবে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন প্রকার হিমায়িত মাছ/চিংড়ির সংরক্ষণ সময়কাল দেখানো হলো

হিমায়িত মাছের প্রকার	যে কয় মাস ভালো অবস্থায় থাকবে	
	১৮° সে. তাপমাত্রায়	৩০° সে. তাপমাত্রায়
কম চর্বিযুক্ত মাছ	৪ - ৮	৮ - ২৪
চর্বিযুক্ত মাছ	৩ - ৪	৬ - ১২
মাছ/চিংড়ি	৪ - ৬	৮ - ১২

মাছ/চিংড়ির শুঁটকিকরণ ও নিরুদিকরণ

পচনশীল মৎস্যজাত দ্রব্য হতে পানি অপসারণ করে ফেললে পচনে ব্যাকটেরিয়া ও এনজাইমঘটিত পচন বন্ধ হয়ে যায় পক্ষান্তরে এর পুষ্টিগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। মাছ/চিংড়ির দেহ থেকে পানি কমানো বা অপসারণ প্রাকৃতিকভাবে যেমন- সূর্যালোকে, কৃত্রিম বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে করা যায়। সকল ক্ষেত্রেই মাছ/চিংড়ির দেহ থেকে পানি অপসারিত হয় বলে ওজন কমে যায় কিন্তু গুণগত মান ঠিকই বজায় থাকে। এ সকল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের খরচ কম হয় এবং সহজে বাজারজাত করা যায়।

শুঁটকিকরণ।

শুঁটকিকরণ পদ্ধতিতে তাজা মাছ থেকে পানি শুকিয়ে ফেলে এমন পর্যায়ে নেয়া হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়া ও অধিকাংশ দেহস্থ এনজাইমের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। শুঁটকিকরণ প্রাকৃতিকভাবে যেমন রোদে শুকিয়ে বা কৃত্রিম উপায়ে তাপ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মাছের দেহে সাধারণত ১৫-২০% এর বেশি পানি থাকে না। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উপায়ে শুঁটকিকরণ দু'ভাবে করা হয়

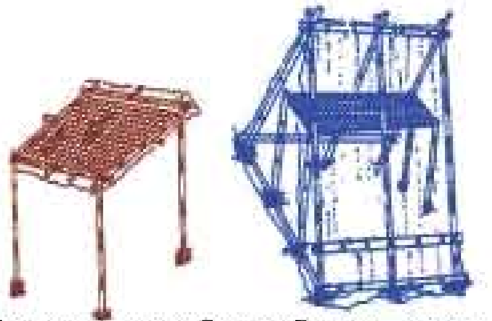

চিত্র: মাছ শুকানোর মাচা চিত্র: বাঁশের তৈরি মাছ শুকানোর মাচা

(ক) মাছকে রোদে শুকিয়ে শুঁটকিকরণ

(খ) বিশেষ পদ্ধতিতে শুঁটকিকরণ

(ক) চিংড়ি/মাছকে রোদে শুকিয়ে শুটকিরণ

বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে (অক্টোবর-মার্চ) রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় মাছ শুকানো হয়ে থাকে। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম এবং সূর্যালোকের স্থায়িত্বের কারণে শুটকিকরণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কমবেশি একই প্রক্রিয়ায় মাছ শুকানো হয়ে থাকে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অধিক হারে মাছ শুকানো হয়ে থাকে। মাছের আকারের ওপর ভিত্তি করে রোদে শুটকিকরণ দু'ভাবে করা হয়:

(১) ছোট মাছের শুটকিকরণ

(২) বড় মাছের শুটকিকরণ

(১) ছোট মাছের শুটকিকরণ পদ্ধতি

ছোট মাছ বলতে এখানে পুঁটি, মোলা, ঢেলা, চান্দা, কাঁচকি প্রভৃতি মাছকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো খুব বেশি পরিমাণে শুকানো হয়। এসব মাছের ক্ষেত্রে আঁইশ বা নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলা হয় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঙুল দিয়ে টিপে নাড়িভুড়ি বের করা হয়। ছোট মাছের পুরুত্ব কম হওয়ায় রোদ্রের তাপে অতি সহজেই শুকানো যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকে শুরু করে চৈত্র-বৈশাখ পর্যন্ত ছোট মাছ বেশি ধরা পড়ে। জেলেরা এসব মাছকে চটের ওপর বিছিয়ে দেয়। ৫-৬ দিনের মধ্যে রোদ্রে এসব ছোট মাছ শুকিয়ে যায়। তবে কাচকি মাছ শুকাতে ৩ দিনের বেশি সময় লাগে না। এসব শুটকি তৈরি করার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয় না।

ছোট মাছের শুটকিকরণে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ

ক) মাছের গায়ে প্রচুর ময়লা কাদা থাকে এগুলো ভালোভাবে ধৌত করা। যথাসম্ভব মাছের আঁইশ, নাড়িভূঁড়ি পরিষ্কার করা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করার ফলে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমে যায় এবং পচন কম হয়।

খ) ব্যবহৃত চাটাই বা পলিথিন পরিষ্কার রাখা। বাতাসের ধুলিকণা ও আবর্জনা যাতে মাছে না পড়ে সেজন্য মাছের ওপর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তেমন বাতাস না থাকলে পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মাছ জাল দিয়ে ঢেকে দেয়া।

গ) পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুবিধার জন্য বাঁশের মাচার ওপর মাছ শুকাতে দেয়া। এভাবে মাছ দ্রুত শুকাবে এবং পচন কম হবে। এছাড়া মাছ উলট-পালট করে দিতে পারলে মাছ সমভাবে শুকাতে পারে।

(ঘ) মাছ শুকাতে ৪-৫ দিন লেগে যায়। বর্ণিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ না করলে এ সময়ের মধ্যে মাছে বিভিন্ন পোকা, মাছি প্রভৃতি ডিম পাড়তে পারে। এসব ডিম থেকে লার্ভা উৎপন্ন হয় যা শুটকির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়। এসব লার্ভা বেঁচে থাকার জন্য মাছ থেকে খাবার গ্রহণ করে। ফলে শুটকি মাছে প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায় এবং গুণগত মান হ্রাস পায়। এজন্য প্রখর রোদে যথাসম্ভব পাতলা করে দিয়ে মাছ শুকানো দরকার।

(২) বড় মাছের শুঁটকিকরণ

সাধারণত চর্বিবিহীন মাছকে শুঁটকিকরণ করা হয়। যেমন বড় মাছকে আমাদের দেশে শুঁটকিকরণ করা হয় তারমধ্যে শোল, গজার, বোয়াল, চাঁপিলা, ছুরি, রূপচাঁদা, পোয়া, লইট্যা, কোরাল, সাপা, বড় লোনা প্রভৃতি অন্যতম। খুব অল্প পরিমাণে কইজাতীয় মাছ শুঁটকি করা হয়।

শুঁটকিকরণের ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক) মাছের পাখনা, আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দেয়া হয়। কইজাতীয় মাছের মাথা কেটে বাদ দেয়া হয়। সাধারণত মাছকে ধোয়া হয় না। যদিও মাছকে ভালোভাবে ধৌত করা উচিত।

খ) মাছকে মাথার দিক থেকে লেজের দিকে মাঝখানের কাঁটা বরাবর লম্বালম্বি কেটে ফেলা হয়। কিন্তু লেজের কাছে সামান্য লাগিয়ে রাখা হয় যাতে মাছকে ঝুলাতে সুবিধা হয়। এভাবে খণ্ড বা ফালি করা মাছকে ফিলেট বলে।

গ) প্রতিটি ফিলেটকে আবার মাছ বরাবর লম্বালম্বিভাবে আরও ৩-৪ টি ফাড়া দেয়া হয় যাতে সহজে শুকাতে পারে।

ঘ) এভাবে কাটা মাছকে মাটিইয়ের ওপর বা মাদার চাটাই ওপর অথবা বাঁশের মাচার ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়। এভাবে রাখার সময় পাখি, চিল ও ময়লার হাত থেকে রক্ষার জন্য অনেক সময় পলিথিন দিয়ে মাছকে ঢেকে দেয়া হয়।

ঙ) এভাবে মেলে দেয়ার প্রথম ৩-৪ দিনেই মাছের অধিকাংশ পানি শুকিয়ে যায়। এরপর মাছগুলোকে ওখানেই শুকানো অথবা বাঁশে বাঁধা রশিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মাছের পুরুত্ব, রোদ্রের তীব্রতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে মাছ ভালোভাবে শুকাতে ৭ থেকে ১০ দিন সময় লেগে যেতে পারে।

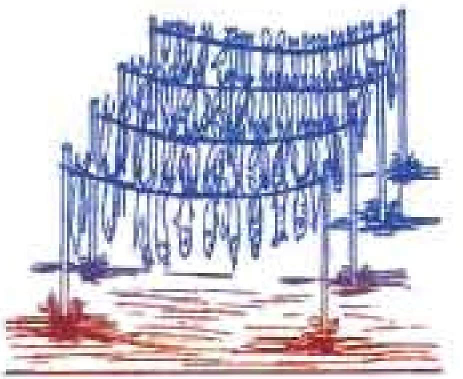

চিত্র: সনাতন পদ্ধতিতে মাছের শুঁটকিকরণ

চ) মাছের শুকানোর মাত্রা জেলেরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ণয় করে থাকে। তবে ওজনের দিক থেকে তাজা মাছের ওজনের ২০-২২% পরিমাণ শুঁটকি হয়ে থাকে। তবে মাছের জলীয় অংশের পরিমাণ ১৫-১৬% বা তার কম হলে মাছের শুকানো শেষ হয়।

বড় মাছের শুঁটকিকরণে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ

ক) শুঁটকিকরণের জন্য মাছ তাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ফিলেট করে শুকানোর জন্য রাইগরমর্টিস অবস্থায় ফিলেট করা উচিত। রাইগরপূর্ব অবস্থায় ফিলেট করার কারণে শুকানোর সময় পেশি কুঁচকে যেতে এবং ফাটল দেখা দিতে পারে।

খ) মাছের মাথা কাটা, আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি ফেলার পর উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। মাছ ফালি করার সময় ফাঁটি অংশে যত বেশি চওড়া করা যায় তত দ্রুত শুকাবে। সেজন্য বড় মাছকে পাতলা করে ফালি করা উচিত।

গ) রোদে মাছ পাতলা করে মেলে দেয়া বা দড়িতে ঝুলানো যাতে সকল স্থানে রোদ লাগে। মাঝে মাঝে উলট-পালট করে দিলে মাছ শুকানো ত্বরান্বিত হয়।

ঘ) মাছ শুকাবার জন্য মাচা তৈরি করা সুবিধাজনক। এক মিটার উঁচু মাচার নিচ দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে ফলে মাছ তাড়াতাড়ি শুকায়। এছাড়া ভূমি থেকে ক্ষতি করতে পারে এমন পশু ও পোকামাকড় থেকে শুটকি নিরাপদ থাকে। মাচার ওপর পলিথিনের তাবু দিয়ে ঢেকে দিলে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায়। সম্ভব হলে ভালো কোনো মডেলের সোলার টেন্ট ড্রায়ার ব্যবহার করা যায়।

ঙ) শুটকিকরণের জন্য প্রস্তুত মাছকে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিলে শুকানো ত্বরান্বিত হয়। আবার ১০% লবণ দ্রবণে ১৫-২০ মিনিট ডুবায়ে রাখলে শুটকির রং ও গঠন সুন্দর হয় এবং সংরক্ষণকালে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কম হয়।

চ) কড়া রোদে ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাছকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক কড়া রোদের ফলে মাছের রোদের পার্শ সিদ্ধমত হয়ে (Partial cooking) যায়।

ছ) রাতের বেলা বাতাসের আর্দ্রতা ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচানোরে জন্য শুটকি মাছকে রাতে ঘরে তুলে ফেলা উচিত।

জ) কম চর্বিযুক্ত (১-২%) মাছকে শুটকিকরণ করা উচিত। বেশি চর্বিযুক্ত মাছের শুটকি খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় এবং বাতাসের সংস্পর্শে সহজে জারিত হয়ে দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে।

চিত্রঃ সোলার টেন্ট ড্রায়ার

সোলার টেন্ট ড্রায়ার মাছ শুকানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। গতানুগতি পদ্ধতিতে শুটকিকরণের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা যায়। সোলার টেন্ট ড্রায়ার প্রবেশপথ বাঁশের খুঁটি ও পলিথিন শীট দিয়ে তৈরি করা যায়। কোণাকুণিভাবে আটকানো বাঁশের ফ্রেম মাটিতে স্থাপন করে দু'পাশ এবং সামনে পরিষ্কার পলিথিন শিট দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। মেঝে ও পিছনের পাশে কালো রঙের মোটা কাগজ দিয়ে আবৃত করে দেয়া হয় যাতে করে বিকিরিত সৌরশক্তি সহজেই শোষিত হতে পারে। তাবু বা টেন্টের ভিতরে মাছ ঝুলাবার জন্য অনুভূমিকভাবে বাঁশের ফ্রেম বসানো থাকে। এসব ফ্রেমে হুকের সাহায্যে মাছ শুকানোর জন্য ঝুলানো যায়। সোলার টেন্ট ড্রায়ারে দু'পাশে এবং সামনের পরিষ্কার পলিথিন শিট ভেদ করে সৌরশক্তি আপতিত হয় যা পিছনের এবং ভূমির কালো মোটা কাগজে শোষিত হয়ে টেন্টের ভিতর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। ভূমি বরাবরে তৈরি ছিদ্র দ্বারা বাতাস প্রবেশ করে এবং ওপরের দিকের ছিদ্র দ্বারা বেরিয়ে যায়। রৌদ্রের সময় টেন্টের ভেতর তাপমাত্রা ৫০-৫৫° সে. পর্যন্ত হয়। ড্রায়ারের ভূমি বরাবর ছিদ্র দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে এবং গরম হয়ে মাছের চারপাশ দিয়ে উপরের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। এভাবে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মাছ শুটকিতে পরিণত হয়। তাসমানিয়াতে মাছ শুকানোর জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তাসমানিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় সোলার টেন্ট ড্রায়ার এর ভূমিতে বালু দেয়া হয় যাতে টেন্টের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

চিংড়ি শুটকিকরণ

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর ছোটজাতের চিংড়ি শুকানো হয়। সাধারণত মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে উপকূলীয় আধা-লবণাক্ত জলাশয়ের ঘেরসমূহে প্রচুর হরিণা চিংড়ি ও গুড়া চিংড়ি ধরা পড়ে। রপ্তানিযোগ্য বড় মাছ/চিংড়ি চড়া দামে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু ছোটজাতের চিংড়ি হিমায়িতকরণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ লাভজনক না হওয়ায় এগুলোর দাম খুব কম থাকে। পচনশীল এসব চিংড়িকে জেলেরা নিজেরাই বালুচরে বা চাটাইয়ে ফেলে রৌদ্রে শুকায়। এসব চিংড়ির বিরাট একটা অংশ আবার তাপ দ্বারা শুকানো হয়। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ে তাপ দ্বারা চিংড়ি শুকানো হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে এসব চিংড়ি শুকানোর ঘরকে রঙ ঘর বলা হয়। রং ঘরে বড় আকারের মাটির চুলার ওপর মাচার ওপর চিংড়ি বিছিয়ে দেয়া হয়। নিচে কাঠের আগুন দিয়ে তাপের ব্যবস্থা করা হয়। রং ঘরে দিন-রাত সবসময় চিংড়ি শুকানো হয়। এভাবে শুকানো চিংড়ি পলিথিনের বস্তায় ভরে গুদামজাত করা হয়।

শুটকিকরণের সুবিধাসমূহ

আমাদের দেশে শীতকালে শুটকি করা হয়। এ সময় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত বেশি মাছ ধরা পড়ে যে, সব মাছ। বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। দ্রুত পরিবহন ও যোগাযাগ ব্যবস্থার অভাবে বেশির ভাগ মাছ অত্যন্ত কম দামে বিক্রি করতে হয় নতুবা পচে নষ্ট হয়ে যায়। তাই মৎস্য আহরণকারী জেলেদের নিকট সূর্যালোক ও বাতাসের সাহায্যে মাছ শুটকিকরণ খুবই জনপ্রিয় ও লাভজনক। নিচে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুটকিকরণের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

(১) শুটকিকরণের মাধ্যমে মাছ/চিংড়িকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা দেয়। মাছ/চিংড়ি শুকানোর ফলে ব্যাকটেরিয়াজনিত ও এনজাইমজনিত পচন বন্ধ হয়ে যায়।

(২) মৎস্যজীবীদের দরিদ্রতার কারণে আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মতস্যজীবীদের জন্য অন্য কোনো পন্থায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ সম্ভব নয় বিধায় এ পদ্ধতিতে মাছ শুটকি করে মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

(৩) বাজারে যখন তাজা মাছ/চিংড়ির অভাব দেখা দেয় তখন ভোক্তারা মাছ/চিংড়ির বিকল্প হিসেবে শুটকি ক্রয় করতে পারে

(৪) শুটকিকরণ মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ, সস্তা ও জনপ্রিয় পদ্ধতি

(৫) পচনশীল মৎস্যজাত দ্রব্যের ন্যায় শুটকি পরিবহনে তাপ কুপরিবাহী যান বা বাক্স প্রয়োজন হয় না বিধায় এর পরিবহন তুলনামূলকভাবে সহজ

(৬) বাংলাদেশে অধিক হারে মাছ/চিংড়ি আহরণের সময় (নভেম্বর-মার্চ) সূর্যালোক ও আবহাওয়া শুটকিকরণের অনুকূল থাকে বিধায় এ পদ্ধতি সহজে লাভজনকভাবে কাজে লাগানো যায়

নিরুদিকরণ

মাছ/চিংড়িকে কৃত্রিম উপায়ে শুটকিকরণের পদ্ধতিকে নিরুদিকরণ বলা হয় । এ পদ্ধতিতে উন্নত মৎস্যজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় । যার গন্ধ, বর্ণ, গঠন এব পুষ্টিমানের দিক থেকে শুটকিকৃত পণ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । নিরুদিকরণে কৃত্রিম উপায়ে তাপমাত্রার উপস্থিতিতে মাছের শরীর থেকে পানি অপসারণ করা হয় । অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে কোনো খাদ্যদ্রব্য থেকে কৃত্রিম উপায়ে বাষ্পীকরণ অথবা উর্ধ্বপাতনের সাহায্যে প্রায় সমস্ত পানি অপসারণের মাধ্যমে পচনকে কমিয়ে দেয় তাকে নিরুদিকরণ বলে ।

নিরুদিকরণের উদ্দেশ্য

নিরুদিকরণের উদ্দেশ্য হলো এমন একটি মৎস্যজাত পণ্য তৈরি করা যা কমবেশি মাছের বৈশিষ্ট্য বহন করে । সঠিকভাবে নিরুদিকরণকৃত মাছ ব্যবহারের সময় আগের গুণাগুণ ফিরে আসে তখন একে তাজা মাছ বা শুটকি না করা মাছ থেকে পৃথক করা যায় না এবং মাছের গন্ধ একেবারে তাজা মাছ/চিংড়ির অনুরূপ থাকে । নিরুদিকরণের সাহায্যে প্রচলিত পণ্যের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি পণ্য উৎপন্ন হয় যা উন্নতমানের এবং গঠন, প্রকৃতি, গন্ধ ও স্বাদের দিক থেকে প্রায় তাজা মাছ/চিংড়ির মত ।

শুটকিরণ ও নিরুদিকরণের পার্থক্য

শুটকিকরণ	নিরদিকরণ
১.শুটকিকরণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মাছ থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে পানি বা জলীয় অংশ হ্রাস করানো হয়	১. নিরুদিকরণ বলতে নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম উপায়ে শুটকিরণের যে কোনো পদ্ধতিকে বুঝায়
২.শুটকিকরণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সম্পন্ন করা হয় না, প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়	২. নিরুদিকরণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়
৩. প্রচলিত শুটকিকরণে স্বাস্থ্যকর অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না । ফলে বিভিন্ন কীটপতঙ্গের সংক্রমণ ঘটে	৩. এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়
৪.শুটকিকরণে মাছের পুষ্টিমান কমে যায়	৪. নিরুদিকরণে মাছের পুষ্টিগুণ তেমন কমে না

নিরুদিকরণের প্রকারভেদ

সূর্যালোকের সাহায্যে শুটকিকরণের সময় খারাপ আবহাওয়া থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর্দ্রতা খুব ধীরে ধীরে কমে । এ অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পানি কমে যাওয়ার পূর্বেই মাছ/চিংড়ি পচন দেখা দেয় । ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান কমে যায় । নিরুদিকরণে যান্ত্রিক ড্রায়ার ব্যবহারের ফলে মাছের শুটকিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় । মাছ/চিংড়িকে নিরুদিকরণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক ড্রায়ার ব্যবহার করা হয় । তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলো গুরুত্বপূর্ণ

(১) ক্যাবিনেট কম্পার্টমেন্ট ড্রায়ার

(২) টানেল ড্রায়ার

(৩) উষ্ণ বায়ু ট্রে ড্রায়ার

(৪) ভ্যাকুয়াম ড্রায়ার

২০২২

এখানে শুধু প্রথম দুই প্রকারের ড্রায়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) ক্যাবিনেট ড্রায়ার

বড় আকৃতির মাছের নিরুদিকরণের জন্য ক্যাবিনেট ড্রায়ার ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ড্রায়ার বৃহৎ শুষ্কীকরণ যন্ত্র যেখানে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস সঞ্চালন করা হয়। এই ড্রায়ারে একটি বড় ধরনের কক্ষ থাকে, যেখানে প্রবাহমান বাতাস ঘূর্ণায়মান থাকে। এ কক্ষে মাছ সংবলিত ট্রে বহন করার জন্য অনেকগুলো হোল্ডিং ট্রাঙ্ক থাকে। চুল্লি থেকে গরম বাতাস সরাসরি শুষ্কীকরণ কক্ষে একটি পাইপের সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়। শুষ্কীকরণ শুরু হলে ট্রেগুলো বহির্গমন পথের দিকে চলতে থাকে। শুষ্কীকরণের পর শুকনো মাছ সম্বলিত ট্রাঙ্ক বহির্গমন পথ দিয়ে বের হয়। এ ধরনের ড্রায়ার আস্ত মাছ শুকানোর জন্য উপযোগী। মাছের পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে মাছ নিরুদিকরণ করতে ২.৫-৪ ঘণ্টা সময় লাগে।

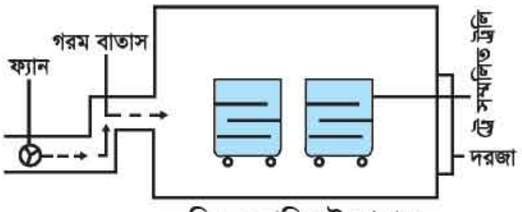

চিত্রঃ ক্যাবিনেট ড্রায়ার

(২) টানেল ড্রায়ার

মাছ শুষ্কীকরণ বা নিরুদিকরণের জন্য যেসব ড্রায়ার ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে টানেল ড্রায়ার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এ ধরনের ড্রায়ার সাধারণত ছোট মাছ নিরুদিকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। টানেল ড্রায়ারে মাছের দেহ হতে পানি বাষ্পাকারে বের করার জন্য গরম বাতাস ব্যবহার করা হয়। টানেলের ভিতর সারিবদ্ধ র‍্যাকে মাছ সাজানো থাকে এবং মাছের ওপর দিয়ে গরম বাতাস চালিত করা হয়। মাছের ওপর প্রবাহিত বাতাসের গতি প্রতি মিনিটে ২০০-৩০০ ফুট রাখা হয়। এর বেশি বা কম গতিতে মাছ শুকাতে বেশি সময় লাগে। প্রবাহিত বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫-৫৫% হলে শুষ্কীকরণ সর্বাধিক হয়। সাধারণভাবে ব্যবহৃত টানেল ড্রায়ারের টানেলের দৈর্ঘ্য ৮৫ ফুট, উচ্চতা ৬ ফুট ও ধারণক্ষমতা ৪ টন হয়ে থাকে। টানেলের দৈর্ঘ্য বরাবর উভয়পার্শ্বে ৬৪টি করে ট্রাক থাকে যেখানে মাছ ট্রেতে সাজানো থাকে। এ ধরনের ড্রায়ারে ১০ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন মোটরের ফ্যান এবং হিটারে ২ গ্যালন প্রতি ঘণ্টায় জ্বালানি ব্যবহার করলে নিরুদিকরণ সম্পন্ন করতে এক লটের জন্য প্রায় ৪ দিন সময় লাগে।

ধূমায়িতকরণ

শুটকিকরণ ও নিরুদিকরণের মতো ধূমায়িতকরণও মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে উত্তপ্ত বায়ু ও ধোঁয়ার সাহায্যে কাঁচা মাছকে শুকানো হয়। অনেক সময় যেসব কাঁচা মাছ/চিংড়ি কিছুটা পচনের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় না সেগুলো ধূমায়িতকরণের ফলে ধুমার তীব্র গন্ধ ও লবণের ক্রিয়ায় ঐ সমস্ত ত্রুটিসমূহ আর ধরা যায় না। ধূমাতাপ প্রয়োগের ফলে মাছের পচা গন্ধসৃষ্টিকারী যৌগসমূহ আর থাকে না। সাধারণত চর্বিহীন বা কম চর্বিযুক্ত মাছ থেকে একটু বেশি চর্বিযুক্ত মাছ ধূমায়িতকরণের জন্য ভালো। আমাদের দেশে ধূমায়িতকরণের সাহায্যে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ বর্তমানে প্রায় চালু নেই। তবে এ পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ অনেক এলাকার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশে সাধারণত ধূমায়িতকরণ প্রক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ি শুটকি করা হয় না।

মাছ/চিংড়ি সাধারণ তাপমাত্রায় এনে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এ মাছ/চিংড়িকে ৫-১০% অ্যাসি-টিক অ্যাসিড ও ১০-১৫% লবণের দ্রবণে এক সপ্তাহ বা বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয়। এ অবস্থায় মাছ/চিংড়ির আমিষ জমাট বেঁধে যায়। এসব মাছ/চিংড়ি ১-২% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ২-৪% লবণ দ্রবণে চুড়ান্তভাবে বোতলজাত করা হয়। এভাবে বোতলজাত মাছ/চিংড়িকে ০° সে. তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৩ মাস ভালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

প্যাকেটজাতকরণ ও কৌটাজাতকরণ

মাছ বা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যের আসল গুণাগুণ ধরে রাখা এবং কোনোরূপ কলুষিতকরণ (Contamination) ও সংক্রমণ (Infection) হতে রক্ষা করার জন্য কোনো দ্রব্যাদি দ্বারা মাছ বা খাদ্য দ্রব্যকে মোড়ানো বা কৌটাজাত করার পদ্ধতিকে প্যাকেটজাতকরণ (Packaging) পদ্ধতি বলা হয়। বিভিন্ন উপায়ে পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাত করার পর মাছ ও মৎস্য জাত দ্রব্যকে সংরক্ষণ, নিরাপদ ও সহজ পরিবহন এবং পরবর্তীতে কোনোরূপ কলুষিত বা সংক্রেমিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্যাকেটজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্যাকেটজাতকরণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা মাছ বা অন্য কোন দ্রব্যের প্রকৃত গুণাগুণ ঠিক রাখা এবং সংক্রমণ এবং কলুষিতকরণ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মোড়ক দ্বারা আবৃত করা হয়। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় প্যাকেটজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্যাকেটজাতকরণের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ। প্যাকেট পণ্যের:

(১) ধারক হিসেবে কাজ করে

(২) বিভিন্নভাবে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে

(৩) উপযোগ সৃষ্টি করে এবং

(৪) ভোক্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

প্যাকেজিং দ্রব্য নির্বাচনে পণ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী প্যাকেটের গাঠনিক উপাদান নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকৃতির পণ্যদ্রব্যের জন্য বিভিন্ন উপাদান সংবলিত প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। যেমন- তাজা মাছ রাখার জন্য নির্মিত প্যাকেটের উপাদান এবং মৎস্য তৈল প্যাকিং এর জন্য প্যাকেটের উপাদান এক রকম হবে না। নিচে প্যাকিং সামগ্রী নির্বাচনে পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো।

(১) গঠন (Form): প্যাকেটযোগ্য পণ্যের গঠনের ওপর নির্ভর করে প্যাকেজিং দ্রব্য নির্বাচন করা হয়। মাছ/চিংড়ির ব্লক, শুটকি মাছ, মাছের তৈল বা ফিসমিল এগুলো প্রতিটির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই এদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত আলাদা ধরনের প্যাকেট হবে।

(২) আকার ও আকৃতি (Shape and size): উৎপন্ন দ্রব্যের আকার ও আকৃতির ওপর প্যাকেট তৈরির উপাদান নির্ভর করে। পণ্য যদি বড় আকৃতির হয় তবে প্যাকেজিং দ্রব্য মজবুত উপাদানের তৈরি হয়। আবার পণ্য ছোট হলে ছোট ছোট ভাগ করে (in group) অপেক্ষাকৃত নরম প্যাকেজিং দ্রব্য দ্বারা প্যাকিং করা হয়। সুচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট পণ্য যেমন- মাছের কাঁটা, হাড়, মাছ/চিংড়ি ও কাঁকড়ার পা প্রভৃতির জন্য প্যাকিং দ্রব্য মজবুত ও সহজে ছিদ্র হয় না এমন উপাদানের তৈরি হতে হয়।

(৩) দৃঢ়তা বা শক্তি (Strength): পণ্যদ্রব্যের সাথে প্যাকেটের শক্তির বিপরীত সম্পর্ক থাকে। পণ্য যদি খুব শক্ত হয় তখন খুব শক্ত প্যাকেট না হলেও চলে। যেমন- হিমায়িত মাছের ব্লককে পলিথিন দিয়ে মুড়ে দিলেই চলে।

(৪) তরল পদার্থের প্রতি সংবেদনশীলতা (Fluid Sensitivity): মাছ উচ্চ আর্দ্রতার মধ্যে রাখা দরকার তা না হলে মাছ থেকে পানি বের হয়ে মাছ শুকিয়ে যায়। আবার শুকনো দ্রব্য যেমন- ফিসমিলকে যদি অধিক আর্দ্রতায় রাখা হয় তাহলে প্রোটিন ডিন্যাচারড হতে পারে আবার গঠনেও পরিবর্তন আসতে পারে। তদ্রপ ফিস প্রোটিন কনসেন্ট্রেট (FPC) পানিগ্রাহী (hydroscopic) প্রকৃতির তাই পরিবেশের আর্দ্রতা যেন প্রভাব ফেলতে না পারে সেভাবে প্যাকেটজাত করা হয়।

(৫) রাসায়নিক সংবেদনশীলতা (Chemical Sensitivity): প্যাকেজিং দ্রব্যের উপাদানসমূহ রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়া দরকার। অম্ল ও ক্ষারধর্মী পণ্যের সাথে প্যাকিং দ্রব্যের বিক্রিয়া ঘটে গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। মাছের কৌটাজাতকরণের সময় প্যাকিং মোড়ক বা ক্যানের সাথে মাছের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

(৬) তাপমাত্রার সংবেদনশীলতা (Temperature Sensitivity): প্যাকিং দ্রব্য এমন উপাদান দিয়ে তৈরি হতে হবে যাতে প্রক্রিয়াজাত বা গুদামজাতের সময় তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য কোনো পরিবর্তন না ঘটে। হিমায়নে দ্রব্যকে ৪০° সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। সুতরাং হিমায়িত মাছের মাড়ক অবশ্যই ৪০° সে. তাপমাত্রা সহনশীল হতে হবে। পক্ষান্তরে গরম করে প্রক্রিয়াজাত করা হয় এমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্যাকিং দ্রব্য উচ্চতাপ সহনশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৭) আলোক সহনশীলতা (Light Sensitivity): প্যাকেজিং দ্রব্য স্বচ্ছ হলে পণ্যের ভিতর আলো প্রবেশ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য আলোক সংবেদনশীল হয়ে থাকে এবং আলোর উপস্থিতি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

(৮) তৈল চুইয়ে পড়া (Oil Sepage): যেসব পণ্যের মধ্যে তৈল দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয় ঐ সব পণ্যের প্যাকিং দ্রব্য এমন হতে হবে যাতে তৈল লিক না করে। তৈল লিক করলে পণ্যটি বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং প্যাকেট তৈলাক্ত বা greasy হয়ে যায়। অনেক সময় এ কারণে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পণ্য সংক্রামিত হতে পারে।

(৯) ক্ষয়রোধক ক্ষমতা (Corrosiveness): প্যাকিং এর সামগ্রী এমন হতে হবে যাতে ধারণকৃত পণ্যের সাথে বিক্রিয়া করে প্যাকেটের কোনো প্রকার ক্ষয় না হয়। যেমন- সামুদ্রিক মাছে সালফারযুক্ত এমাইনো অ্যাসিড বেশি থাকে, যা টিনজাতীয় ক্যানে লিকার ছাড়া প্যাকিং এবং প্রক্রিয়াজাত করলে সালফারের সাথে টিনের বিক্রিয়া ঘটে পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

(১০) দাহ্যতা (Flamability): প্যাকিং সামগ্রী সহজে দহনযোগ্য হলে ভালো হয় না। গরম অবস্থায় প্যাকিং করার সময় অনেক ক্ষেত্রে আগুন জ্বলে যেতে পারে। সে কারণে দহনযোগ্য দ্রব্য দ্বারা প্যাকিং করলে গরম অবস্থায় পরিবহন বা হ্যান্ডলিংয়ের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজিং দ্রব্যাদি

প্যাকেটজাতকরণের উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের লক্ষ্যে এবং পণ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় রেখে নিম্নবর্ণিত দ্রব্যসমূহকে প্যাকেজিং-এর কাজে ব্যবহার করা যায়:

১. সিরামিক (Ceramic)
২. কাচ (Glass)
৩. ধাতু (Metal)
৪. কাগজ (Paper)
৫. প্লাস্টিক (Plastic)
৬. কাঠ (Wood)

কৌটাজাতকরণ

কোনো পচনশীল খাদ্যদ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য নিরাপদ পাত্রে আবদ্ধ অবস্থায় উচ্চতাপ প্রয়োগে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে কৌটাজাতকরণ বলে। বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্তকরণ বলতে ততটুকু জীবাণুমুক্ত করা বোঝায় যার ফলে সকল রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। কৌটাজাতকরণ মূলত প্যাকেজিং এর একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের গুণগতমান সংরক্ষণ তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে ২ হতে ১০ বৎসর পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখা যায়। কৌটাজাতকরণের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

(১) উচ্চতাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সকল ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা এবং তাদের এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়া।

(২) মাছ বা খাদ্যের দেহস্থিত এনজাইমকে ডিনেচারড বা অপ্রকৃতস্থ করার মাধ্যমে রাসায়নিক। বিক্রিয়াঘটিত পচন রোধ করা

(৩) অবায়বীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে জারণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে রোধ করা।

কৌটা (Can)

কৌটা বিভিন্ন আকার, আকৃতির ও বিভিন্ন উপাদানের হয়ে থাকে। তবে প্রক্রিয়াজাতযোগ্য মৎস্য বা খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৌটা নির্বাচন করা হয়। সাধারণত কাচ, অ্যালুমিনিয়াম ও টিনের পাত্র মৎস্যজাত পণ্য কৌটাজাতকরণে ব্যবহৃত হয়। এদের প্রত্যেকটির কিছু কিছু ব্যবহারিক সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। তবে টিনের পাত্রই মাছ কৌটাজাতকরণে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন উপাদানের কৌটার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহঃ

কৌটার উপাদান	সুবিধা	অসুবিধা
কাচ	● স্বচ্ছ বলে বাইরে থেকে পণ্য দেখা যায় ● নিষ্ক্রিয় বলে দ্রব্যের সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না ● সময়ের ব্যবধানে কাচ নষ্ট হয় না ● ওজনে হালকা হওয়াতে পরিবহন সহজ	● কাচ খুবই ভঙ্গুর ● ভঙ্গুর বলে পরিবহনে অসুবিধা ● তাপের সঞ্চালন ধীরগতি সম্পন্ন ● দাম বেশি
অ্যালুমিনিয়াম	● সহজে খোলা যায় ● রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না ● স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়	● তুলনামূলকভাবে কম টেকসই ● উচ্চতাপ প্রয়োগ করা যায় না
টিন	● হালকা ও শক্ত ● উচ্চ তাপ প্রয়োগ করা যায়	● রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে খাদ্য কালো রং ধারণ করে

ছবিঃ বিভিন্ন প্রকার কৌটাজাত মাছ

কৌটাজাত প্রক্রিয়া

কৌটাজাত মাছ/চিংড়ির গুণগত মান এর কাঁচামাল কাঁচা মাছ/চিংড়ির বৈশিষ্ট্য এবং ক্যানিং পূর্ব পরিচর্যার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সবধরনের মাছ/চিংড়িকে কৌটাজাত করা সুবিধাজনক হয় না। যেসব প্রজাতির মাছের পেশীর গঠন উচ্চ তাপমাত্রায় ঠিক থাকে শুধুমাত্র সেসব মাছকেই কৌটাজাত করা হয়। বেশি চর্বিযুক্ত বা একেবারে কম চর্বিযুক্ত মাছ কৌটাজাত করা হয় না। সাধারণত যেসব মাছের চর্বি ৭-১৫% এর মধ্যে সেগুলো কৌটাজাতকরণের জন্য উত্তম। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র সামুদ্রিক মাছেরই কৌটাজাত করা হয়ে থাকে। টুনা, ম্যাকারেল, পিলচার্ড, সার্ডিন, স্যামন,স্প্রাট প্রভৃতি প্রজাতির মাছ/চিংড়িকে সচরাচর কৌটাজাত করতে দেখা যায়। ক্যানিং পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা হয়

(১) ড্রেসিং (Dressing): বেশির ভাগ ছোট মাছের ক্ষেত্রে ড্রেসিং শুধুমাত্র পাখনা, আঁইশ, মাথা ও নাড়িভুড়ি ফেলে দেয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বড় আকারের মাছ যেমন-টুনা, স্যামন, এদের ক্ষেত্রে আঁইশ, মাথা ও নাড়িভুড়ি ফেলার পর মেরুদন্ড কাটা ফেলে দেয়া হয়। এভাবে মাছকে বড় বড় টুকরো বা চাঙ্ক (Chunk) তৈরি করা হয়। মাছের টুকরো কৌটার আকার বা গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী ছোট বড় করা হয়। ড্রেসিং এর মাছ/চিংড়িকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দ্বারা ধৌত করা হয়।

ক. কৌটায় সুন্দরভাবে সাজানো মাছ

খ. এলোমেলো মাছ

(২) প্রি-কুকিং (Pre-Cooking): কৌটাজাত প্রক্রিয়ায় প্রি-কুকিং হলো মাছের পেশি একটু নরম বা ঢিলা করা যাতে মাছের চামড়া, কাটা পৃথক করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় মাছ থেকে কিছু পরিমাণ পানি ও তৈল অপসারণ করা হয়। মাছের প্রজাতি অনুযায়ী প্রি-কুকিং এর পদ্ধতি, তাপমাত্রা ও সময়কাল নির্ধারণ করা হয়। এ সময় মাছ/চিংড়ির খোলস ও ভেইন এবং অন্য মাছের লাল বা বাদামি পেশি (Blood meat) ফেলে দেয়া হয়। প্রি-কুকিং পর্যায়ে মাছ থেকে সঠিক পরিমাণে পানি অপসারণ এবং পেশিস্থ সকল আমিষের জমাট বাঁধা নিশ্চিত করা হয়। টুনা, হেরিং, স্প্রাট ও কোনো কোনো সার্ডিনকে বাষ্প প্রবাহিত করে প্রি-কুকিং করা হয়। আবার অন্য প্রকার সার্ডিনকে উদ্ভিজ্জ তেলে ভাজা হয়। ধূমায়িতকরণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় স্প্রাট মাছকে প্রি-কুকিং করা হয়ে থাকে। তবে লবণ দ্রবণে অল্প তাপে সিদ্ধ করা প্রি-কুকিং এর সাধারণ পদ্ধতি।

(৩) কৌটা পূর্ণকরণ (Filling the can): কৌটার মাছ ভরার কাজটি হাত দিয়ে বা যান্ত্রিকভাবে করা যায়। তবে হাত দিয়ে পূর্ণ করলে ক্যানের ভিতরে ফাঁকা স্থান থেকে যেতে পারে। ফলে সেখানে বাতাসের উপস্থিতিতে জারণ ঘটতে পারে। এছাড়া ফাঁকা স্থান থাকলে উচ্চতাপ প্রয়োগের সময় কৌটা ফেটে যেতে পারে। কৌটা পূর্ণকরণের সময় মাছের বা টুকরার সংখ্যা ও নিট ওজনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কৌটার ভেতরে পরিপাটি করে মাছ সাজানো হয় যাতে ক্রেতা পছন্দ করে। ক্যান পূর্ণ করার সময় ক্যানের উপরের দিকে কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। একে ক্যান হেড স্পেস (Can head space) বলা হয়। পরবর্তীতে উচ্চতাপ প্রয়োগের সময় ক্যানের আবদ্ধ মুখ যাতে ফেটে না যায় সেজন্য ফাঁকা স্থান রাখা হয়।

(৪) মসলা বা এডিটিভ্স (Adition of additives): উৎপন্ন দ্রব্যের স্বাদ, গন্ধ, রং ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কৌটার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার এডিটিভ্স ব্যবহার করা হয়। এসব এডিটিভসের মধ্যে লবণ, মসলা, টমেটো সস, সবজি, তৈল ইত্যাদি অন্যতম। এসব এডিটিভ্সের ব্যবহার মাত্রা ও গুণাগুণ খুব সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(৫) বায়ুশূন্যকরণ ও মুখবন্ধকরণ (Exhausting & Sealing): মাছভর্তি ক্যানকে মুখ বন্ধ করার পূর্বে এর ভেতর থেকে বাতাস সম্পূর্ণভাবে বের করে নেয়া হয়। বায়ুশূন্য করার ফলে কৌটা স্ফীত হওয়া, জারণ হওয়া বা কৌটার ভেতরের অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে পারে না। বায়ুশূন্যকরণ ও মুখবন্ধকরণ স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। তবে সম্পূর্ণ কাজটি খুব সতর্কতার সাথে সম্পাদন করা হয়।

(৬) ধৌতকরণ (Washing): কৌটা পূর্ণ করার সময় বা অন্যভাবে কৌটার গায়ে কোনো পদার্থ লেগে থাকতে পারে যা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যেতে পরে। তাই কৌটাসমূহ বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ধৌত করা হয়।

(৭) তাপ প্রয়োগে বা রন্ধন (Retorting & Cooking): কৌটাজাত মৎস্যদ্রব্যকে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করার জন্য তাপ প্রয়োগ করা হয়। কৌটার আকার, আকৃতি ও পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী তাপমাত্রা ও তাপ প্রয়োগের সময়কাল নির্ভর করে। ক্যানিং-এর জন্য উপযোগী বিভিন্ন ধরনের রিটর্ট যন্ত্র পাওয়া যায়। এক সাথে অনেক সংখ্যক কৌটা (২০০-৩০০) রিটর্টিং চেম্বারে রেখে স্টিম চালনা করা হয়। সাধারণত ১২১° সে. তাপমাত্রায় ৫০-৭০ মিনিট পর্যন্ত স্টিম সহযোগে তাপ প্রয়োগ করা হয়।

(৮) ঠান্ডাকরণ (Cooling): উচ্চতাপ প্রয়োগের ফলে গরম কৌটা দ্রুত ঠান্ডা করার প্রয়োজন হয়। দ্রুত ঠান্ডা করলে মাছ অতিরিক্ত রন্ধন (over processing) হয়ে যেতে পারে। ফলে পণ্যের গঠন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য 'প্রেসার কুলিং' পদ্ধতি সংবলিত রিটর্টের সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া কনভেয়ারের মাধ্যমে ঠান্ডা পানিতে চালনা করেও ক্যান ঠান্ডা করা যায়। ঠান্ডাকরণেও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা হয়। ক্লোরিনেটেড পানি ব্যবহার করে সংক্রমণের আশঙ্কা এড়ানো যায়।

(৯) লেবেল লাগানো (Labelling): ঠান্ডা করার পর কৌটার লেবেল লাগানো হয়। পণ্যের বর্ণনা সম্বলিত লেবেল লাগানোর সময় প্যাকেজিং এর নিয়ম অনুসারে যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়। বিভিন্ন কোডের মাধ্যমে কৌটার গায়ে ব্যাচ নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখসহ কতিপয় প্রয়োজনীয় তথ্য এম্বোস (Emboss) করা ভালো। এতে করে উৎপন্ন দ্রব্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে ব্যাচ অনুযায়ী শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনে বাজার থেকে প্রত্যাহার করা সহজ হয়।

(১০) মজুদকরণ (Stocking): কৌটাজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের সাথে সাথে বা তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা বা শিপিং করা হয় না। সাধারণত ১-২ মাস মজুদ করার পর কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষার পর বাজারে ছাড়া হয়। ক্যান প্রস্তুত সম্পন্ন হলে নিম্নতাপে মজুদ করা হয়। সাধারণত কৌটাজাত মৎস্যদ্রব্য কক্ষ তাপমাত্রায় ৩-৪ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বাণিজ্যিক কৌটাজাতকরণের সময় উপরের অধিকাংশ ধাপই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের মান নিবিড় পরিদর্শন পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কৌটাজাতকরণের ত্রুটি (Defect)

টিনের কৌটার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে পণ্যের ভেতর নানা প্রকার ত্রুটি দেখা দেয়। মাছের আমিষে বিদ্যমান সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড কৌটার আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়রন সালফাইড বা টিন সালফাইড উৎপন্ন করে। ফলে কৌটার ভেতর ক্ষয় হয়ে যেতে পারে বা কৌটা স্ফীত হয়ে যেতে পারে এবং খাদ্য বস্তু কাল রং ধারণ করতে পারে। এছাড়া টিন প্লেট হতে ধাতব সংক্রমণে খাদ্য বস্তু স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এসব ত্রুটি এড়াতে টিন ক্যানকে জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে একটি সংরক্ষক প্রলেপ দেয়া হয়। এই প্রলেপকে লেকার (Lacquer) বলা হয়। লেকার প্রলেপের ফলে বর্ণিত ত্রুটিসমূহের অধিকাংশ দুর হয়ে যায়। অবশিষ্ট ত্রুটি দূর করার জন্য মাছ ও ক্যানের মাঝখানে পাতলা পার্চমেন্ট কাগজ দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়। মাছ/চিংড়ির বেলায় কৌটায় সামান্য সাইট্রিক অ্যাসিড বা ফসফরিক অ্যাসিড যোগ করে এ জাতীয় ত্রুটি দূর করা যায়।

অন্যান্য মৎস্যজাত দ্রব্য ফিসমিল

মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় কিছু কিছু মাছ বা মাছের উচ্ছিষ্টাংশ (Fish offal) ফেলে দেয়া হয় বা নষ্ট করে ফেলা হয়। মাছ/চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক গভীর সমুদ্রে মাছ/চিংড়ি আহরণের সময় মাছ/চিংড়ি ছাড়া জালে আসা অন্য মাছকে সাগরে ফেলে দেয়া হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মাছ/চিংড়ির মাথা ও খোলস নদীতে ফেলে দেয়া হয়। সামুদ্রিক আহরণে এমন অনেক মাছ থাকে যা মানুষ খেতে চায় না; যেমন ললিগো, সেপিয়া, জেলিফিস প্রভৃতি। নিচে উচ্ছিষ্ট মাছ ও মাছের বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ফিসমিল তৈরি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

ফিসমিল হলো মাছ বা মাছের উচ্ছিষ্টাংশ থেকে অধিকাংশ পানি ও তৈল বের করার পর প্রস্তুতকৃত এক প্রকার গুড়া যা উচ্চমাত্রায় প্রোটিনসমৃদ্ধ বিধায় পশু ও মৎস্য খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো ধরনের মাছ বা শেলফিস থেকে ফিসমিল প্রস্তুত করা যায়। অনেক দেশেই আস্ত মাছ (whole fish) থেকে ফিসমিল তৈরি করা হয়। তবে ট্রাস ফিস ও মাছের উচ্ছিষ্টাংশ দিয়েও ফিসমিল তৈরি করা হয়। ট্রাস ফিস ঐ সমস্ত মাছ যেগুলো আকারে ছোট ও দামে সস্তা। তাই বড় মাছ বা দামি মাছ রেখে এগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। এতে পুষ্টি সমৃদ্ধ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অপচয় হয় এবং ঐসব মাছ পচে পানি দূষিত হতে পারে। সুতরাং তুচ্ছ মনে করে ঐসব মাছ ফেলে না দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বিকল্প ব্যবহার করা যায়।

ফিসমিলের গঠন: বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের মাছ বা কাঁচামাল থেকে ফিসমিল তৈরি করা হয়। সে কারণে এর গঠনও বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে ফিসমিলে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ কমবেশি মাত্রায় অবশ্যই থাকে।

(১) প্রোটিন
(২) তৈল বা ফ্যাট
(৩) পানি
(৪) ছাই
(৫) ক্রড ফাইবার
(৬) ভিটামিন

২০২২

(১) প্রোটিন: উন্নতমানের ফিসমিলে প্রোটিনের পরিমাণ ৬০-৬৫% হয়ে থাকে। তবে এর মাত্রা ৫০-৭০% পর্যন্ত হলেই উন্নত মানসম্পন্ন বিবেচনা করা হয়। ফিসমিলের প্রোটিনে সকল প্রকার অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে।

(২) তৈল: ফিসমিলে তৈলের পরিমাণ ৫-১০% এর মধ্যে রাখা হয়। মাছের মধ্যে বিদ্যমান চর্বি ফিসমিল। তৈরির সময় বের করে নেয়া হয়। ফিসমিলে চর্বি বা তৈলের পরিমাণ ৫% এর নিচে হলে বেশি গুড়া হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত তৈলের কারণে জারিত হয়ে ফিসমিল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আদর্শ মান হিসেবে ফিসমিলে ৮% তৈল থাকা ভালো।

(৩) পানি (Moisture): ফিসমিলে পানির পরিমাণ ৬-১০% পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে ৮% এর বেশি থাকা ঠিক নয়। পানি বেশি থাকলে সহজেই ফিসমিলের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(৪) ছাই (Ash): ফিসমিলে প্রোটিনের পরিমাণের সাথে ছাই এর বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ বেশি প্রোটিন হলে ছাই কম হবে। আর বেশি ছাই হলে কম পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যাবে। সাধারণ মাত্রা হিসেবে ফিসমিলে ১২ থেকে ৩৩% পর্যন্ত ছাই থাকতে পারে। তবে ১৮% ছাই ভালো ফিসমিলে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৫) ক্রুড ফাইবার (Crude fibre): ফিসমিলে ১-২% এর বেশি ক্রুড ফাইবার থাকে না। ক্রুড ফাইবার আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

(৬) ভিটামিন: ফিসমিলে অতি অল্প পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। উল্লেখযোগ্য ভিটামিনসমূহের মধ্যে রাইবোফ্লেভিন, নায়াসিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, কলিন ও ভিটামিন বি-১২ অন্যতম। ফিসমিলে ভিটামিনের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো:

(ক) রাইবোফ্লাভিন	-	৩ মিগ্রা/পাউন্ড
(খ) নায়াসিন	-	৩০ মিগ্রা/পাউন্ড
(গ) প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড	-	৩ মিগ্রা/পাউন্ড
(ঘ) কোলিন	-	১৫ মিগ্রা/পাউন্ড
(ঙ) ভিটামিন ই$_{১২}$	-	০.১-০.৩ মিগ্রা/পাউন্ড

ফিসমিলের শ্রেণীবিভাগ

ফিসমিলে প্রোটিনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে:

(১) গ্রেড এ: এতে ৫৫-৭০ % পর্যন্ত প্রোটিন থাকে

(২) গ্রেড বি: এতে ১০% এর বেশি এবং ৫৫% এর কম প্রোটিন থাকে

(৩) গ্রেড সি: এতে ১০% এর কম প্রোটিন থাকে

ফিসমিল তৈরির পদ্ধতি

ফিসমিল তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সবচেয়ে সহজতম পদ্ধতি হলো মাছ রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে ফিসমিল তৈরি করা। এতে ফিসমিলের গুণগতমান নিম্নমানের হয়। এ কারণে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাছ শুকিয়ে গুড়া করে ফিসমিল তৈরি করা হয়। এটিই পৃথিবীব্যাপী ফিসমিল তৈরির পরিচিত পদ্ধতি। বাণিজ্যিকভাবে ফিসমিল উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে আর্দ্র বিয়োজন পদ্ধতি (Wet reduction method) বলা হয়। ধারাবাহিকভাবে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্যায়সমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক. চূর্ণকরণ বা পেষণ (Grinding): মাছের উচ্ছিষ্টাংশ (Fish grinder offal) অথবা বড় আকৃতির মাছকে মাংস পেষক যন্ত্রের (meat grinder) সাহায্যে পেষণ করা হয়। তবে ১০ ইঞ্চি লম্বা বা তার ছোট আকারের মাছকে পেষণ করার দরকার হয় না।

খ. সিদ্ধকরণ (Cooking): পেষণ করা মাছ বা ছোট আকৃতির সম্পূর্ণ মাছকে আবদ্ধ অবস্থায় চাপের মধ্যে বাষ্প প্রবাহিত করে সিদ্ধ করা হয়। ফলে মাছের মাংস ও হাড় নরম হয় এবং কোষ প্রাচীর ভেঙে যায়। এভাবে চাপ ও তাপের দ্বারা মাছের তৈল বেরিয়ে আসে। সিলিন্ডারাকৃতির কুকারের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়। কুকার ১৫-২০ ফুট দৈর্ঘ্যে এবং ১৫-৩০ ইঞ্চি ব্যাসের হয়ে থাকে এবং এটির ভেতর মাছ নড়াচড়া করার জন্য কনভেয়ার বেল্ট থাকে। কুকারের ভেতর সারিবদ্ধ পাইপের মাধ্যমে বাষ্প পরিচালনা করা হয়।

গ. চাপ প্রয়োগ (Pressing): কুকিং করা মাছকে এরপর ধারাবাহিকভাবে চাপ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়। চাপ প্রয়োগের ফলে কুকিং করা মাছ থেকে দুটি অংশ পাওয়া যায়- (১) তরল অংশ যাকে প্রেস লিকার বলা হয়। এটি মাছ থেকে বেরিয়ে আসা পানি ও তৈলের সমষ্টি। (২) শুকনো অংশ যা প্রায় শুকনো মাছের খন্ড, একে প্রেস কেক বলা হয়। প্রেস কেকে ৪০-৭০% পানি (Moisture) বিদ্যমান থাকে।

ঘ. শুষ্ককরণ (Drying): প্রেস কেককে এবারে গরম বাতাসের প্রবাহ সংবলিত ড্রায়ারের মধ্যে ফেলে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। ড্রায়ারের তাপমাত্রা ৬০° সে. এর নিচে রাখা হয়।

ঙ) কিউরিং (Curing): উৎপন্ন দ্রব্য যেন বেশি গরম না হয়ে যায় সেজন্য কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে ফিসমিলকে উপরে নিচে নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা করা হয়। তাপমাত্রা ৬০° সে. এর বেশি হলে ফিসমিলের প্রোটিন ডিনেচারড হয়ে যেতে পারে। বাতাসের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে ফিসমিলের গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ডাস্ট অক্সিড্যান্ট হিসেবে বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন (BHT) ব্যবহার করা হয়।

চ) গুড়াকরণ (Milling): ঠান্ডা করার পর প্রেস কেককে গুড়া করে চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য হিসেবে ফিসমিল তৈরি করা হয়।

ছ) প্যাকেটকরণ ও মজুদকরণ (Packaging and strorage): প্রস্তুতকৃত ফিসমিলকে বায়ুরোধী প্যাকেটে সুবিধাজনক ওজনে প্যাকেট করা ও মজুদ করা হয়। ফিসমিল প্যাকিং ও গুদামজাতকরণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় যাতে কোনো পোকামাকড় বা ইঁদুর প্যাকেট কেটে না দেয়। বাতাসের সংস্পর্শে ফিসমিলের গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

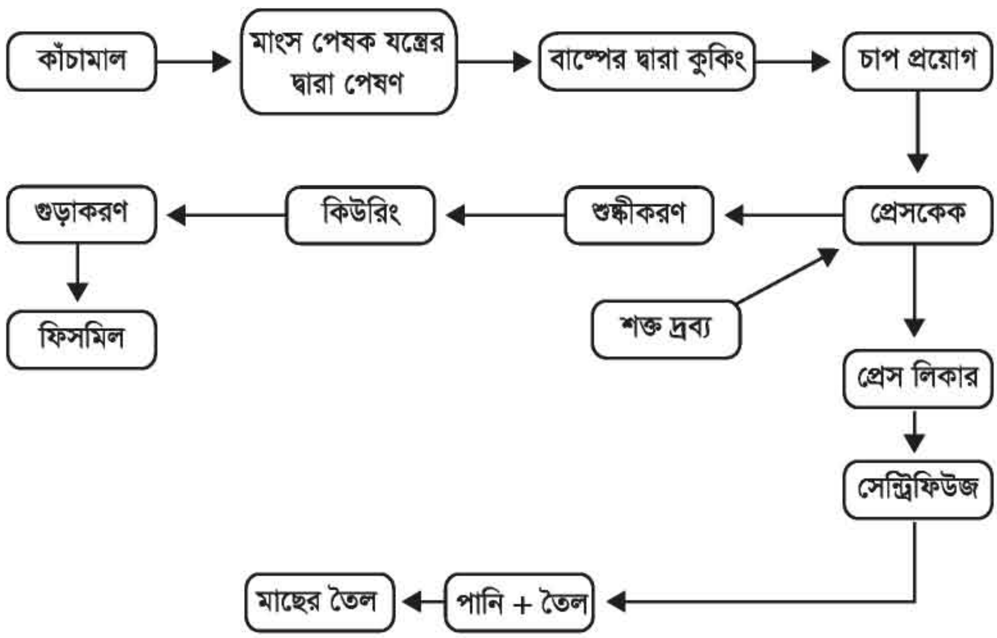

চিত্র: ফিসমিল তৈরির ফ্লোচার্ট

ফিসমিলের ব্যবহার

এক সময় ফিসমিল শুধুমাত্র জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে ফিসমিলের ব্যাপক ব্যবহার বেড়েছে। কোনো কোনো দেশে আহরিত মাছের প্রায় ৫০% ফিসমিল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। তবে পশুপাখির খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার অন্যতম। ফিসমিলে উচ্চমাত্রায় প্রোটিনের কারণে পোল্ট্রি ফিড বা হাঁস মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উন্নত মাছ চাষ ও মাছ/চিংড়ি চাষের জন্যও এটি অপরিহার্য সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ফিসমিল বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের খাওয়ার উপযোগী করা হয়। এছাড়া ঔষধ শিল্পে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দ্রব্যাদি তৈরিতে ফিসমিল ব্যবহার করা হয়।

গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা ভালো চাষ অনুশীলনের গুরুত্ব

খামারে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির গুণগত মান ও নিরাপত্তার বিষয়টি চাষি, বিক্রেতা, প্রক্রিয়াজাতকরণকারী বা রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতাসহ সংশিষ্ট সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব বলে বিবেচিত। গুণগতমান ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক উৎপাদন থেকে শুরু করে বিদেশি ক্রেতার নিকট রপ্তানি করা পর্যন্ত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সকলকে কমবেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। মাছ/চিংড়ি চাষ, মাছ/চিংড়ি ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিপণন, পরিবহন, রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিদেশি ক্রেতার নিকট প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকরণ- সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আবার ধাপগুলোর মধ্যে সমম্বয় সাধন করে নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের জন্য মাছ/চিংড়ি চাষি, বিক্রেতা ও প্রক্রিয়াজাতকরণকারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা অপরিহার্য। কারণ মাছ/চিংড়ির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই চাষি কর্তৃক চাষের ক্ষেত্রে ভালো চাষ অনুশীলন বা গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস অনুসরণ করা হয়েছে কী সে বিষয়টি প্রক্রিয়াজাতকরণকারীকে নিশ্চিত হতে হবে। কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর গুরুত্ব দিলেই মাছ/চিংড়ির গুণগতমান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হবে না। আহরণোত্তর পরিচর্যার পাশাপাশি প্রয়োজন চাষ পর্যায়ে কঠোরভাবে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা ভালো চাষ অনুশীলন অনুসরণ করে নিরাপদ মাছ/চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।

গুড অ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা ভালো চাষ অনুশীলনের সংজ্ঞা

চাষ পর্যায়ে অনুসরণীয় যে সকল কার্যাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হলে পণ্য হিসেবে মাছ/চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার (Food Safety) বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাকে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বলা হয়। অর্থাৎ চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মগুলোকেই 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বা জিএপি' বলা হয়। চাষ পর্যায়ে সংশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও কার্যক্রমগুলোর জন্য অনুসরণীয় গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বা ভালো চাষ অনুশীলন এর ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

(১) খামারের অবস্থান: চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচনের সময় চাষিকে সংশিষ্ট জমির অতীত ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ জমির অতীত ব্যবহার মাটির রাসায়নিক উপকরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পূর্বে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন জমিতে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছনাশকের অবশেষ (Residue) বিদ্যমান থাকে। এরূপ জমিতে মাছ/চিংড়ি খামার স্থাপন করলে উক্ত ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ মাছ/চিংড়ির বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং উৎপাদিত মাছ/চিংড়িকে ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তোলে। একইভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশুপাখির বিচরণ, বা বায়ুবাহিত দূষণের (যেমন- রাসায়নিক স্প্রে) মত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আশপাশের পরিবেশও মাছ/চিংড়ি খামারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার, শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির মত মারাত্মক উৎস সংলগ্ন স্থানে মাছ/চিংড়ি খামার তৈরি করা মোটেও সমীচীন নয়। কোনো মাছ/চিংড়ি খামার কৃষিক্ষেত, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার, জনবসতি বা বস্তির সন্নিকটে স্থাপন করা উচিত নয়। এরূপ স্থানে খামারের স্থান নির্বাচন করতে হলে চাষিকে মাছ/চিংড়ি খামারের ওপর স্থাপনাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে স্থান নির্বাচন করতে হবে। নিয়মিত কীটনাশক ও সার ব্যবহার করা হয় এমন ধরনের নিবিড় কৃষিচাষ পদ্ধতির জমি মাছ/চিংড়ির বৃদ্ধিতে এবং মাছ/চিংড়ির নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। রাসায়নিক দূষণে দূষিত পানিতে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ি ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

২০২২

(২) চাষে ব্যবহৃত পানি: মাছ/চিংড়ি খামারের পানির মান উৎপাদনাধীন মাছ/চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দূষিত পানি যেমন মাছ/চিংড়ি মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা মাছ/চিংড়ির বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানি উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ (Residue) জমা করে ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায়। পরিশেষে এই অবশেষ এবং ক্ষতিকর জীবাণু ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হ্যাজার্ড হিসেবে দেখা দেয়। পানির উৎসটি দূষিত হলে খামারের পানিও দূষিত হবে। মাছ/চিংড়ি খামারের স্থান নির্বাচনের সময় তাই ভালো পানির উৎসের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। ভারী ধাতুসমূহ (Heavy metals), বিভিন্ন কীটনাশক ও কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং কলিফর্ম ও স্যালমোনেলা জীবাণু মূলত পানি দূষণের জন্য দায়ী। ভারী ধাতুগুলোর অন্যান্য উৎসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক উৎসটি হলো শিল্প কারখানার বর্জ্য।

(৩) আশপাশের পরিবেশ: মাছ/চিংড়ি খামারের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভালো অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এর ফলে নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। চাষ পর্যায়ে অনেক সময় ভূমিক্ষয় বা ভূমিধস ঘটে থাকে যা চাষির জন্য সরাসরি আর্থিক ক্ষতির কারণ হয় ও পানিতেও রাসায়নিক ও জীবাণুর দূষণ ঘটায়। জলাশয়ের চারদিকে পরিকল্পিত উপায়ে গাছ লাগালে ভূমিক্ষয় বা ভূমিধস রোধ করার পাশাপাশি জলাশয়ে রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত দূষণও রোধ করা যায়। এ ছাড়া জলাশয় ও আশপাশ থেকে ঝোপঝাড়, অতিরিক্ত জলজ আগাছা ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলা দরকার। মাছ/চিংড়ি খামারে বন্য প্রাণীর বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এজন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখি ও অন্যান্য বন্য প্রাণী বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ইকলি, ইত্যাদি) সংক্রমণের উৎস। সরাসরি জলাশয়ে বা জলাশয়ের আশপাশে অথবা মাছ/চিংড়ির খাবার তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানের নিকটে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ই.কলি, ইত্যাদি) পানিতে বা খাবারে মিশে পরিশেষে উৎপাদিত মাছ/চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। খামারে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির এই সংক্রমণ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ভোক্তার নিকট পৌঁছায় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়। ইদুর জাতীয় প্রাণী অনেকগুলো রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর বাহক। এদের যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে এরা খুব সহজেই খাদ্যকে সংক্রমিত করতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ এলাকায় এদের বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

(৪) স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস/হাইজিন প্রাকটিস: মাছ/চিংড়ি খামারে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলতে মূলত মানুষের মল ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা পশুপাখির মল ও বর্জ্যের সার হিসেবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে স্তন্যপায়ী বা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু বহন করে যা মাছ/চিংড়ির খামারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মাছ/চিংড়ি খামারে, বিশেষ করে জলাশয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মলমূত্রের দূষণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব। মাছ/চিংড়ি খামারে কর্মরত লাকজনকে কোনো অবস্থাতেই পুকুরের পানিতে, পাড়ে, পুকুর সংলগ্ন এলাকায়, খামারের পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন সব জলাশয়ে (যেমন- নদী, খাল, ইত্যাদি) মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না।

মলমূত্র খামার সংলগ্ন স্থানে ত্যাগ করলে মলমূত্র বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়তে পারে। মলমূত্র ত্যাগের জন্য খামার এবং পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে জলাবদ্ধ পায়খানা (ল্যাট্রিন) তৈরি করতে হবে। পায়খানাগুলোকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন মলাধার থেকে দূষিত তরল পদার্থ কোনোভাবেই জলাশয়ে চুইয়ে না পড়ে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও উষ্ণ রক্তের প্রাণীর মলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। এ জন্য পুকুরে অপরিশোধিত মল ও বিষ্ঠাকে সার হিসেবে ব্যবহার মাছ/চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই মাছ/চিংড়ির পুকুরে উল্লিখিত উৎসের জৈব সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

(৫) মাছ/চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতা: মাছ/চিংড়ি একটি দামি পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে এর যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দেয়া প্রয়োজন। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষি অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকে। অত্যধিক লাভের আশায় চাষি নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করে থাকে। ফলে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্নমানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাছ/চিংড়ির পাশাপাশি ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে পড়ে। চাষ পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাঁচা খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়িভুঁড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ণ, ইত্যাদি মাছ/চিংড়ির খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এ ধরনের খাবার ব্যবহারে চাষিরা বেশি উৎসাহী, কারণ এতে খরচ কম। কিনতু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের কাঁচা খাবার বিভিন্ন ধরনের রাগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত থাকে, যেমন- স্যালমোনেলা, ভি, কলেরা, ই, কলি, ইত্যাদি। এ ধরনের খাবার প্রয়োগের ফলে খুব সহজেই মাছ/চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। এ ধরনের কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানিকে দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণকে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে মাছ/চিংড়ির ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। তবে এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগজীবাণুর সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।

(৬) ঔষধের ব্যবহার: প্রাণীকূলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের অপব্যবহার প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক মাছ/চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার চাষির জন্য বিপদ ডেকে আনে। এর অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ ব্যবহার মাছ/চিংড়ির দেহে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (Residue) জমা করে এবং মাছ/চিংড়ির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চাষ পর্যায়ে অতীতে ব্যবহৃত কতিপয় অ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চাষ পর্যায়ে অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও জারী করা হয়েছে। চাষাধীন মাছ/চিংড়ি খামারে নিয়োজিত কর্মী, পরিবেশ ও ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

এক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ, মাত্রা নির্ধারণ এবং এর অবশেষ নিঃশেষের সময় (withdrawl time) মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি স্টোরে ঔষধ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ এবং খালি প্যাকেট বা পাত্র ফেলে দেয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। চাষ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঔষধের অনুমোদিত একক তালিকা প্রণয়ন করা এখনও সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ি পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে, যেমন- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও অন্যান্য দেশ। তাই চাষ পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দেশসমূহের অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৭) মাছ/চিংড়ির আহরণপূর্ব মূল্যায়ন: চাষের সময় সাধারণত প্রত্যেক চাষি নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাছ/চিংড়ির আকার, পরিমাণ ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরনের রুটিন চেক, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। চাষ পর্যায়ে মাছ/চিংড়ি ধরার আগে এই রুটিন চেক মাছ/চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি মূল্যায়নের একটি বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দেয়। খামারে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি কাঙ্ক্ষিত স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা মাছ/চিংড়ি ধরার পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য মাছ/চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে মাছ/চিংড়ির গুণগতমান পরীক্ষা করা উচিত। কারণ আহরণের পর মাছ/চিংড়ির গুণগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তা সম্পর্কিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তখন চাষি বা প্রক্রিয়াজাতকরণকারীর পক্ষে আর তেমন কিছু করার সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে আহরণপূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়নে ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

(৮) আহরণের সময় অনুসরণীয় প্রাকটিসসমূহ: খামারে চাষকৃত মাছ/চিংড়ি আহরণের কাজটি কতগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এগুলো উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হলো:

- খাবার কমিয়ে দেয়া/বন্ধ করে দেয়া।
- আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ ও কর্মী প্রস্তুত রাখা।
- হ্যান্ডলিং ও পরিবহন।

জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য উল্লিখিত ধাপগুলোর নির্ধারিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আহরণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চাষির উচিত সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মাছ চিংড়ি আহরণের দিনক্ষণ ঠিক করা। মাছ/চিংড়ি আহরণের কাজটি সাধারণত নোংরা অবস্থায় হলেও মাছ/চিংড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা মাছ/চিংড়ি থেকে নতুন মাছ/চিংড়িতে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। মাছ/চিংড়ি রাখা ও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাকেট, টাব ও অন্যান্য

পাত্রকে যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মাছ/চিংড়ি আহরণের কাজে যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে তাদেরকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বিশেষ করে সংশিষ্ট ব্যক্তির হাতে কোনো কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত থাকবে না। আহরণের পর সরাসরি হাত দিয়ে মাছ/চিংড়ি হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গ্লোভ্‌স) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভালো।

(৯) পরিচর্যা এবং পরিবহনের জন্য প্রস্তুতি ও পরিবহনের পূর্বে মাছ/চিংড়িকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এরপর থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গুণগতমানের প্রকৃত অবনতি শুরু হয়। তাই প্রস্তুতির এই পর্যায়ে অনেক বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। এ পর্যায়ে চাষির করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপঃ

• ইতোপূর্বে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত মাছ/চিংড়িকে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরি কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে প্রথমে বরফের একটি স্তর, । তারপর মাছ/চিংড়ির একটি স্তর, তারপর আবার বরফ- এভাবে সাজাতে হবে।

• পরিবহনের সময় এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা বিবেচনা করে বরফ ও মাছ/চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত মাছ/চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১। দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

• পরিবহনের সময় মাছ/চিংড়িতে যেন চাপ না লাগে সেজন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাস্টিকের বাক্সে মাছ/চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। উপযুক্ত ডিজাইনের বাক্স উপর্যুপরি সাজিয়ে রাখলেও নিচের বাক্সের মাছ/ চিংড়িতে একটুও চাপ পড়েনা। পক্ষান্তরে বাকেটের ওপর বাকেট রাখলে উপরের বাকেটের চাপে নিচের বাকেটের মাছ/চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

• ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মাছ/চিংড়িকে ডিপো/আড়তে/সার্ভিস সেন্টারে/সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

• পরিবহনের পর পরিবহন যান ও মাছ/চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

মাছ/চিংড়ি উৎপাদনে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়ন

হ্যাজার্ড এনালিসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে হাসাপ (HACCP)। কোনো খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার এটি হচ্ছে একটি আধুনিক পদ্ধতি। কোনো খাদ্যপণ্যের কাঁচামালের উৎসস্থল থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য ক্ষতিকর পদার্থিক, জীবগত ও রাসায়নিক বিষয়গুলোকে (হ্যাজার্ড) এ পদ্ধতির সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি ধাপে চিহ্নিত হ্যাজার্ডগুলোকে প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিরাধ (নিয়ন্ত্রণ) ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোর হ্যাজার্ড প্রতিরোধের সক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডগুলোর দ্বারা বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত বিপদ সৃষ্টি সম্ভাবনাগুলোর নিরিখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো কোনো ধাপ সংকটপূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) তা চিহ্নিত করে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ধাপেই বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়। এতে কেবলমাত্র প্রয়াজনীয় ধাপেই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে নিবিড় করার মাধ্যমে পণ্যের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২০২২

হ্যাসাপ-এর গুরুত্ব

মাছ/চিংড়িতে ক্ষতিকর জীবাণু, কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেলে আমদানিকারক দেশগুলো এরকম মাছ/চিংড়ি গ্রহণ করে না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মাছ/চিংড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু, নোংরা ও ময়লা বস্তু এবং বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের মাছ/চিংড়িকে সাধারণত নিম্নমানের মাছ/চিংড়ি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সাধারণত যে সমস্ত কারণে বাংলাদেশের মাছ/চিংড়ি নিম্নমানে পর্যবসিত হয় তার বেশিরভাগেরই উৎস মাছ/চিংড়ির চাষ ও আহরণোত্তর পরিচর্যার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে মাছ/চিংড়ির চাষ পর্যায়ে রাসায়নিক ও জীবগত হ্যাজার্ড সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মাছ/চিংড়ি চাষ এবং পরিবেশের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মৎস্য পণ্যে এমনসব ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং অণুজীবের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে যেগুলোর প্রয়োগ ও সংক্রমণ চাষ পর্যায়েই ঘটার সম্ভাবনা বেশি। তাই মাছ/চিংড়িতে নাইট্রোফুরান ও ক্লোরামফেনিকল নামক ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক এবং টাইফয়েড ও কলেরার ন্যায় মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। মাছ/চিংড়ি উক্ত ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণুর উপস্থিতির কারণে প্রতিবছর রপ্তানিকৃত বিপুল পরিমাণ মাছ/চিংড়ি বিদেশ থেকে ফেরৎ আসে। ফলে একদিকে রপ্তানিকারকগণ যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তেমনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তাই এ আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাছ ও চিংড়ির চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যাসাপের মূলনীতি

হ্যাসাপ এর সকল কার্যক্রম সাতটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। হ্যাসাপের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপঃ

(১) মাছ ও চিংড়ির খামারে সম্ভাব্য কী কী সমস্যা উদ্ভব হতে পারে তা চিহ্নিত করে ঐ সমস্যাগুলো মাছ ও চিংড়ির কী কী ক্ষতি করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা। একই সাথে সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

(২) মাছ ও চিংড়ি চাষের ধাপগুলোর মধ্যে ঠিক কোন ধাপটিতে বা কোন কোন ধাপে প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে চাষের সঙ্গে সংশিষ্ট অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্মূল হবে বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত হবে তা নির্ধারণ করা।

(৩) সমস্যাগুলো নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত করার জন্য গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো ঠিক কিভাবে বা কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

(৪) মূলনীতি ২-এ নির্ধারিত ধাপটিতে বা ধাপগুলোতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নির্মূল বা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় প্রশমিত করার জন্য গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো যেভাবে বা যে মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা আসলেই কার্যকর কিনা তা জানার জন্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) মূলনীতি ৪-এ উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে যদি দেখা যায় যে, প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়নি তা হলে ঘটে যাওয়া সমস্যা সংশোধনের জন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা নির্ধারণ করা।

(৬) মাছ ও চিংড়ি খামারের জন্য গৃহীত হ্যাসাপ পদ্ধতিটি চাষির সমস্যা নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশাকে পূরণ করছে কিনা তার একটি সার্বিক যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) মাছ ও চিংড়ি খামারের জন্য গৃহীত হ্যাসাপ পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল কার্যক্রমের লিখিত প্রমাণ বা ডকুমেন্ট সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

মাছ ও চিংড়ি খামারে হ্যাসাপ বাস্তবায়ন।

প্রথমে মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশিষ্ট সম্ভাব্য সকল হ্যাজার্ড বিশ্লেষণ করতে হবে। হ্যাজার্ড এনালিসিস এর কার্যক্রমটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য চাষ সংশিষ্ট সকল কার্যক্রমের একটি প্রবাহিক নকশা বা ফ্লো ডায়াগ্রাম তৈরি করতে হবে। প্রণীত এ নকশাটিতে কোনো ত্রুটি নেই তা যাচাই করে নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে ফ্লো ডায়াগ্রামে কোন ধাপ বাদ গেলে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের কাজটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরপর মাছ/চিংড়ি চাষের সকল পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে হ্যাসাপ-এর সাতটি মূলনীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

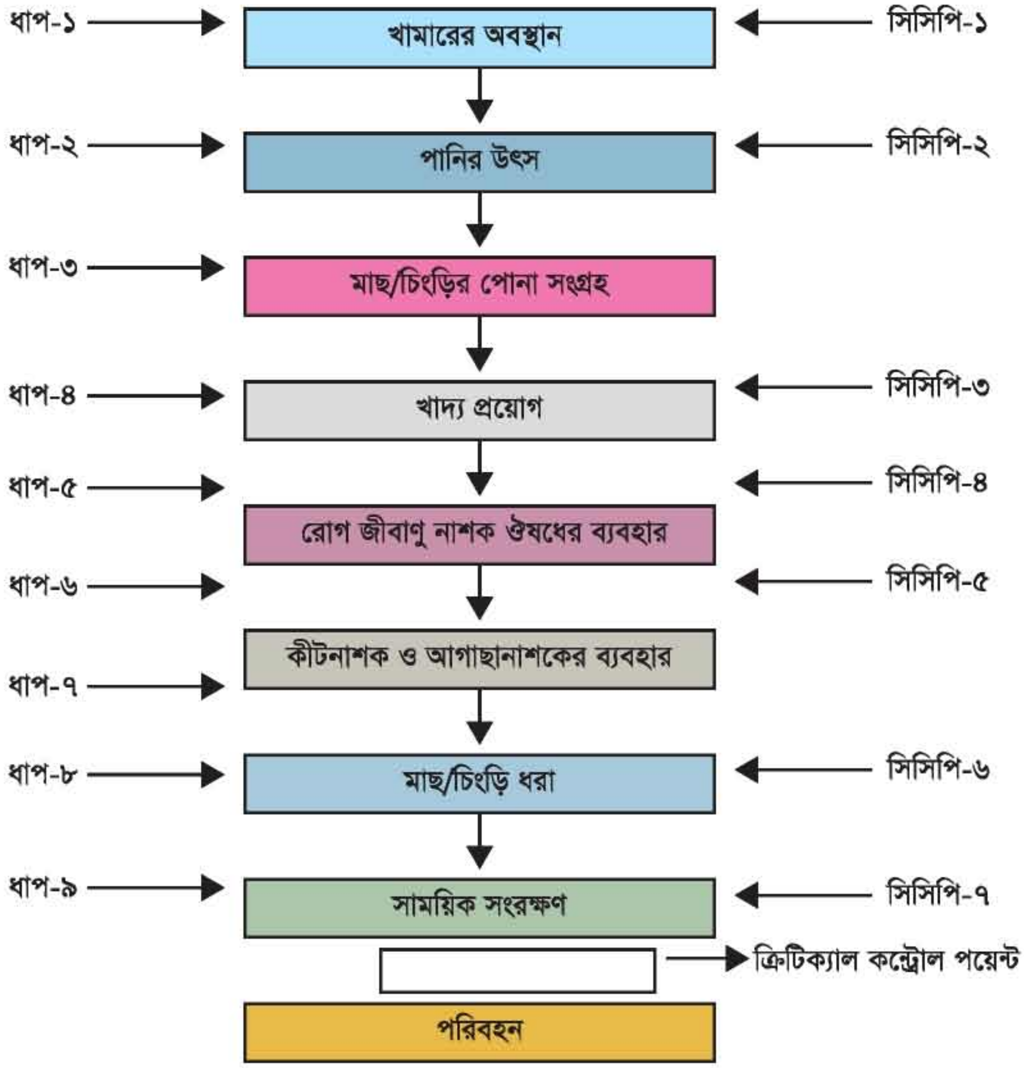

চিত্র: মাছ বা চিংড়ি উৎপাদনের একটি নমুনা ফ্লোচার্ট

উল্লিখিত প্রসেস ফ্লো চার্টটি একটি উদাহরণ মাত্র। কোনো একটি নির্দিষ্ট মৎস্য বা মাছ/চিংড়ি খামারের প্রসেস ফ্লোচার্ট-এর সঙ্গে এর মিল নাও থাকতে পারে। প্রসেস ফ্লোচার্ট তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বাদ না যায়। কারণ এই ফ্লোচার্টকে ভিত্তি করেই পরবর্তী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

হ্যাজার্ড এনালাইসিস

উৎপাদনের ধাপসমূহ	সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডসমূহ	প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ
খামারের অবস্থান	• রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ: কীটনাশক, আগাছানাশক ও ভারী ধাতুসমূহের (পারদ,সীসা, ক্যাডমিয়াম, ইত্যাদি) দ্বারা দূষণ • জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ: ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ও ভাইরাসের দ্বারা দূষণ	• স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খামার পরিচালনা করা • মাটি ও পানি পরীক্ষা করা • স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খামার পরিচালনা করা • মাটি ও পানি পরীক্ষা করা
পানির উৎস	• রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ: কীটনাশক, আগাছানাশক ও ভারী ধাতুসমূহের দ্বারা দূষণ • জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ: ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ও ভাইরাসের দ্বারা দূষণ	• স্বাস্থ্যসম্মত উৎসের পানি ব্যবহার করা • পানি পরীক্ষা করা • স্বাস্থ্যসম্মত উৎসের পানি ব্যবহার করা • পানি পরীক্ষা করা
মাছ/চিংড়ির পোনা সংগ্রহ	• জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ: ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া,পরজীবী ও ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত	• মাছ ও চিংড়ির পোনা পরীক্ষা করা
খাদ্য প্রয়োগ	• জীবগত হ্যাজার্ডসমূহ: ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড এর দ্বারা দূষণ • রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ: অ্যান্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন ও কীটনাশক	• সঠিক মানের খাদ্য ব্যবহার করা • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা • খাদ্যের পরীক্ষা করা • সঠিক মানের খাদ্য ব্যবহার করা • খাদ্যের পরীক্ষা করা
রোগ জীবাণুনাশক ঔষধের ব্যবহার	• রোগ জীবাণুনাশক ঔষধের অবশেষ	• সঠিক মাত্রায় অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা • ঔষধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা
কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার	• কীটনাশক ও আগাছানাশকের অবশেষ	• সঠিক সময়ে ও মাত্রায় কেবলমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার করা • নির্দিষ্ট সময় পর মাছ/চিংড়ি ধরা • মাছ/চিংড়ি পরীক্ষা করা

উৎপাদনের ধাপসমূহ	সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডসমূহ	প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ
মাছ/চিংড়ি ধরা	• জীবগত হ্যাজার্ডসমূহঃ ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি	• মাছ/চিংড়ি ধরার সাস্থ্যসম্মত সরঞ্জাম ব্যবহার ধরার পর রৌদ্রে না রাখা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পাত্রে রাখা। শামুক, কাঁকড়া ও ঝিনুক একত্রে না রাখা
সাময়িক সংরক্ষণ	• পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ: কাঁচ ও লোহার টুকরা, মশা, মাছি বা অন্যান্য পোকা মাকড়ের দেহের অংশ, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, ইঁদুর ও ছুঁচোর লামে, মুরগি ও হাঁসের পালকের অংশ, বাঁশের ঝুড়ি ও হাগেলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদি	• যথাযথ মানের ঘরে ও পাত্রে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণ করা
	• রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ: কীটনাশক, আগাছানাশক, ডিটারজেন্ট, কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টের দ্বারা সংক্রমণ	• সংরক্ষণের স্থানে কীটনাশক, আগাছানাশক, কেরোসিন, পেট্রোল, লুব্রিক্যান্ট ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য না রাখা
	• জীবগত হ্যাজার্ডসমূহঃ ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি	• সংরক্ষণের সঙ্গে সংশিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করা
পরিবহন	• পদার্থগত হ্যাজার্ডসমূহ: বাঁশের ঝুড়ির পঁচা পাতি, হোগলা পাতার পাটির ছাচি, পাটের বস্তার আঁশ, বালি, ইত্যাদির দ্বারা দূষণ	• পরিষ্কার ও আবৃত রাখা, যথাযথ মানের প্লাস্টিকের পাত্রে মাছ/চিংড়ি পরিবহন করা
	• রাসায়নিক হ্যাজার্ডসমূহ: কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্টের দ্বারা সংক্রমণ	• পরিবহনের সময় মাছ/চিংড়ির কাছাকাছি কেরোসিন, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট না রাখা
	• জীবগত হ্যাজার্ডসমূহঃ ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা দূষণ এবং তাপমাত্রা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণবিহীন অবস্থার কারণে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি	• সংরক্ষণের সংগে সংশিষ্ট স্থান, পাত্র ও উপকরণাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা • স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত বরফ পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করা

মাছ/চিংড়ি দূষণের উৎস শনাক্তকরণ

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য একটি অতি দ্রুত পচনশীল পণ্য। মাছ/চিংড়ি চাষ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি ধাপে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে মানসম্মত মৎস্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব।

হ্যাসাপ পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্যের দূষণের যে কোনো কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের উপায় নিরূপণ করা সম্ভব। HACCP পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে Risk Analysis এর মাধ্যমে Risk Assess করে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পদান করতে হলে প্রতিটি Risk Contamination উৎস খুঁজে বের করতে হবে। তাই EU Traceability Regulation 178/2002 জারী করেছে। USFDA Public Health Security And Biotermin Act-2002 খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। বাংলাদেশও মৎস্য পণ্যের Traceability শনাক্ত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

Traceability-এর সংজ্ঞা

সাধারণত কোন দূষণ কোথায়, কখন, কি অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে তা নির্ধারণ করাকেই Traceability বলা হয়। FAO, Codex Alimentarius Commission এর মতে Traceability বলতে একটি কর্মপ্রক্রিয়া কিভাবে, কখন, কোথায়, কার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে তার ইতিহাস, ব্যবহার বা অবস্থা শনাক্তকরণের ক্ষমতাকে Traceability বলে।

Traceability প্রধানত ২ প্রকার যথা-

ক, অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল Traceability

ফুড চেইনের বা সরবরাহ চেইনের বা প্রক্রিয়াজাতকরণের কোনো একটি ধাপে বা ১টি ব্যাচের কর্মপ্রবাহ শনাক্ত করার ক্ষমতাকে অভ্যন্তরীণ Traceability বলে।

খ. চেইন Traceability

কোনো একটি খাদ্যদ্রব্য তৈরির সরবরাহ চেইনের শুরু থেকে প্রক্রিয়াকরণের শেষ ধাপ পর্যন্ত পণ্যের পরিচিতি সম্পর্কিত সংগৃহীত ও সংরক্ষিত তথ্যসমূহকে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ইতিহাস, ব্যবহার বা অবস্থান বা দূষণ শনাক্তকরণ ক্ষমতাকে চেইন ট্রেসিবিলিটি বলে।

সংক্রমণের উৎস নির্ধারণ

বিশ্বখাদ্য সংস্থার মতে এটা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি ইতিহাস জানা যাবে। অর্থাৎ পণ্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক, কীটনাশক ও হরমোন বা রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে তা জানতে হবে। এ সংক্রমণ কোন অবস্থায়, কোথায় কখন, কিভাবে হচ্ছে বা হয়েছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দূষণের কারণ এবং তার প্রকৃত উৎস নিরূপণ করে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। নিচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছক (Decision Tree) অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন করা হলে পণ্যের সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত করা সম্ভব।

		বিষয় শনাক্তকরণ	রেকর্ড	শনাক্তকরণ চিহ্ন
সরবরাহকারীর নিকট থেকে সনদ গ্রহণ	→ ←	ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি	ঘর/যানবাহন/অবতরণের তারিখ/ধরা তারিখ/কোন এলাকার/কখন ধরা হয়েছেব্যাচ নম্বর/সাপাইয়ের কোড/কারখানার কোড নম্বর	শনাক্তকরণ কোড ব্যবহার
↓				
কাঁচামাল গ্রহণ	→ ←	যেখানে রাখা হবে তার বিবরণ	গ্রহণের তারিখ (রঙিন ট্যাগ ব্যবহার)/এজেন্ট কোড/ক্রয়ের বা সরবহাকারীর কোড/ব্যাচ নম্বর	ব্যাচ কোড, আইডি
↓				
গ্রেড বাছাই/লেবেল এবং রেকর্ড (মাছ ও চিংড়ি)	→ ←	গ্রেড/ওজন রেকর্ডকরণ ও লেবেলিং	ব্যাচ কোড/মান যাচাই রেকর্ড/অন্য বাক্সে স্থাপন ও তার রেকর্ড	ব্যাচ আইডি সংযোজন
↓				
মাথা ছাড়ানো/খোসা ছাড়ানো/নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার/টুকরা করা/ধৌতকরা, ইত্যাদি	→ ←	ধৌতকরণ	লিখিত ব্যাচ কোড যাচাই, রেকর্ডসহ নতুন বাক্সে/ঝুড়িতে স্থানান্তর	ব্যাচ আইডি সংযোজন
↓				
চূড়ান্ত গ্রেডিংওজন করা/ বাছাই করা ধৌত করা	→ ←	প্যাকিং	১. মান যাচাই রেকর্ড ২. ব্যাচ কোড রেকর্ড ৩. লেবেলিং রেকর্ড ৪. গ্রেডিং রেকর্ড ৫. ওজনের রেকর্ড	ব্যাচ আইডি/ সংযোজন এবং ওজন গ্রেড, এপ্রোভাল নম্বর কোড ব্যবহার

↓

হিমায়িতকরণ	→ ←	প্যাকিংকরণ	প্যাকিং ট্রেতে লেবেলসহ পণ্য স্থানান্তর/ফ্রিজিং রেকর্ড	তাকের লেবেল, ব্যাচ ব্যাচ আইডি

↓

গ্রেডিং অনুসারে পণ্য সাজানো	→ ←	চূড়ান্ত পণ্য যে তাকে রাখা হবে তার লেবেলিং	মাছের/মাছ/চিংড়ির ইনার ও আউটার কানের ব্যাচ লেবেল/গ্রেড লেবেল/ওজনের লেবেল সংযোজনের রেকর্ড	বার কোড প্রদান, ব্যাচ কোড,মাছ/চিংড়ি কোড, উৎপাদনের তারিখ, কারখানার নাম

↓

প্যাকিং	→ ←	হিমাগারে সংরক্ষণ করা	ব্যাচ কোড, লেবেল মনিটরিং রেকর্ড/প্রডাক্ট লেবেল/বার কোড	বার কোড নম্বর, লেবেলিং

↓

লেবেলিং	→ ←	রপ্তানি	চূড়ান্ত পণ্য বার কোডিং করা এবং লেবেলিং রেকর্ড সংরক্ষণ	বার কোড ব্যবহার যার মাধমে চাষ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের উৎস নির্ধারণ করবে

সংক্রমণের উৎস শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা

আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে কোনো খাদ্য দ্রব্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাঁচামালের উৎস হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদনের উৎস নির্ধারণ করা অপরিহার্য। উৎপাদিত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তাদের চাহিদা যে কোন ধরনের খাদ্য ঝুঁকি এড়িয়ে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্রেতার ও ভোক্তার বিশ্বস্ততা অর্জনই Traceability এর মূল উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলে পণ্যের Traceability নির্ধারণ করা সম্ভব:

ক. নিরাপদ উপাদান দ্বারা পণ্য তৈরিকরণ এবং পণ্যের ইতিহাস সম্পর্কে সকল রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

খ. উপাদানের মধ্যে কোনো Antibiotic, Hormon, Pesticide বা অন্যকোন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়েছে কিনা তা শনাক্তকরণ এবং এ মাত্রা নির্ধারণ;

গ. উৎপাদিত পণ্যের ঝুঁকি নির্ধারণ;

ঘ. প্রতারণা রোধ করা এবং লেবেলিং ক্লেইম রোধ করা।

কারখানায় Traceability বাস্তবায়ন

একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের Traceability নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে:

১. কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দ্বারা ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা ২০২২

২. ফ্লো-ডায়াগ্রাম নির্ধারণ করা

৩. কী প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদিত হবে তা যাচাই করা

৪. রেকর্ড যথাযথভাবে আছে কীনা তা যাচাই করা

৫. কারখানার স্থাপনাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

৬. কারখানার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরিচালিত করা

৭. কাঁচামাল উৎপাদন থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি কাজের রেকর্ড সচ্ছতার সাথে সংরক্ষণ করা

৮. উৎপাদিত পণ্যের প্রতিটি পর্যায়ে কোড নম্বর/আইডি নম্বর প্রকাশ করা এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. পচন ক্রিয়ায় মাছ/চিংড়ির কোন কোন গুণাবলি নষ্ট হয়?

২. মাছ/চিংড়ির পচন কী কী ভাবে সংঘটিত হয়?

৩. কী কী ভাবে মাছ/চিংড়ির রাসায়নিক পচন সংঘটিত হয়?

৪. মাছ/চিংড়ির পচন রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর নাম কি?

৫. মাছ/চিংড়ির দেহে ব্যাকেটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ বন্ধের জন্য গৃহীত কৌশলগুলো লেখ।

৬. কী কী উপায়ে মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণ করা যায়?

৭. নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ/চিংড়ি সংরক্ষনের পদ্ধতিগুলোর নাম কি?

৮. মাছ/চিংড়ি কত তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়?

৯. হাসাপ কয়টি নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়?

১০. Traceability কয় প্রকার ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. র্যানসিডিটি বলতে কী বোঝ?

২. দ্রুত হিমায়িতকরণ বলতে কী বোঝ?

৩. দ্রুত হিমায়িতকরণের সুবিধাগুলো লেখ।

৪. বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্রগুলোর নাম লেখ।

৫. ফিসমিলের শ্রেণীবিভাগগুলো নাম লেখ।

৬. ফিসমিলে ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

৭. মাছ/চিংড়ি আহরণের সময় অনুসরণীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাছ/চিংড়ি শীতলীকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

২. মাছ/চিংড়ি কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৩. ফিসমিল তৈরির পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

৪. ভালো চাষ অনুশীলনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

২০২২ ৫. হ্যাসাপের মূলনীতিমালা বর্ণনা কর।

৬. মাছ/চিংড়ি দূষণের উৎস শনাক্তকরণ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় গুণগতমানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় ব্রুড চিংড়ি নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রুড চিংড়ি সরাসরি নদী বা ঘের বা অন্যের পুকুর থেকেও সংগ্রহ করা যায়। তবে নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্তির বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিতকরণের জন্য হ্যাচারি চত্বরে পরিণত ব্রুড চিংড়ি প্রতিপালন করা অতীব জরুরি।

পুকুরের আকার ও আয়তন

ছোট বড় যে কোনো পুকুরেই গলদা চিংড়ি মজুদ করা যায়। আয়তকার পুকুর চিংড়ি মজুদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পুকুরের আয়তন ২০-৫০ শতাংশ হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। পুকুরের ঢাল ১:২ হলে ভালো হয়।

পুকুরের গভীরতা

পুকুরের পানির গভীরতা ১-২ মিটার এর মধ্যে থাকতে হবে।
পুকুরের তলদেশ সমতল ও পচা কাদামুক্ত থাকা উচিত।

পুকুরের পাড়

পুকুর পাড়ের চূড়া বাইরের দিকে কমপক্ষে ৩০ সেমি উঁচু থাকা ভালো। এর ফলে বর্ষাকালে পুকুরের আশপাশে বৃষ্টি বিধৌত খারাপ পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। বৃষ্টি বিধৌত অ্যাসিড পানিতে পুকুরের পানির পিএইচ কমে গিয়ে চিংড়ি মড়কের কারণ হতে পারে। পুকুরের পাড় পরিষ্কার রাখা উচিত। এছাড়া পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে যাতে বাইরের পানির সাথে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে।

চিত্রঃ পুকুরের পাড়

পানির গুণাগুণ

নিচে পানির গুণাগুণের অনুকূল মাত্রা দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	প্যারামিটার	মাত্রা
১	তাপমাত্রা	২৮° থেকে ৩১° সে.
২	পিএইচ	৭.০- ৮.৫
৩	স্বচ্ছতা	৩৫-৪৫ সেমি
৪	আয়রন	<০.২ পিপিএম (যত কম হবে তত ভালো)
৫	নাইট্রাইট-নাইট্রোজেন	<০.১ পিপিএম (যত কম হবে তত ভালো)
৬	নাইট্রেট-নাইট্রোজেন	<২০ পিপিএম (যত কম হবে তত ভালো)
৭	অ্যামোনিয়া	<২০.১ পিপিএম (যত কম হবে তত ভালো)
৮	দ্রবীভূত অক্সিজেন	৬.০০-৮০০ পিপিএম

সতর্কতা

ক) তাপমাত্রা ১৪-৩৫°সে. এর মধ্যে রাখতে হবে ।

খ) পিএইচ মান ৭ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে রাখতে হবে ।

গ) পানির স্বচ্ছতা ৩০-৭০ সেমি. এর মধ্যে রাখতে হবে ।

পুকুর প্রস্তুতি

১. আগাছা পরিষ্কার

পুকুরের পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিংড়ির উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে জলজ আগাছা বলে । এই সমস্ত জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে ।

২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

দুভাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায় ।

(ক) পুকুর শুকিয়ে ও (খ) ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে ।

ক) পুকুর শুকানো

রাক্ষুসে ও আগাছা মাছ অপসারণের জন্য পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভালো । পুকুর শুকানোর পর কড়া রৌদ্রে তলায় ফাটল ধরাতে হবে । এই কাজটি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে করলে ব্যয় কম হয় । কিন্তু সঠিক সময়ে প্রজননক্ষম চিংড়ি পেতে হলে আরও পূর্বে অর্থাৎ ডিসেম্বর/জানুয়ারি মাসে পুকুর প্রস্তুত করে প্রজননক্ষম চিংড়ি সংগ্রহ করতে হবে । পুকুর শুকানোর পর ভাঙ্গা পাড় মেরামত করতে হবে । তলায় অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে । পুকুরের উপর বড় গাছের ডালপালা থাকলে তা ছেঁটে দিতে হবে । পাড়ের ঝোপঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে ।

চিত্র: পুকুরের আগাছা পরিষ্কার

খ) ঔষধ প্রয়োগ

কোনো কারণে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে নিচের যে কোনো এক প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় বা বাজে মাছ পুকুর থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

রোটেনন পাউডার: ডেরিস গাছের মূল থেকে তৈরি এই পাউডার দেখতে অনেকটা হালকা বাদামি রঙের । রোটেনন প্রয়োগে মাছ মারা যায় কিন্তু চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ কীটের উপর রোটেননের বিষক্রিয়া খুব বেশি কার্যকর হয় না । রোটেনন দ্বারা মৃত মাছ খাওয়া যায় ।

প্রয়োগ মাত্রা

প্রতি শতাংশে প্রতি ফুটপানির গভীরতায় ২৫-৩০ গ্রাম রোটেনন ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

সূর্যালোকিত দিনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রোটেনন পাউডার বালতিতে নিয়ে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাই তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত কাই তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দ্বারা ছোট ছোট বল। তৈরি করতে হবে এবং বাকি দুভাগের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি মিশিয়ে তরল করতে হবে। প্রথমে ছোট বলগুলো সমস্ত পুকুরের - পানিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পাশাপাশি তরলীকৃত রোটেননও পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫-২০ মিনিটের। মধ্যেই মাছ মরা শুরু হলে জাল দিয়ে মৃত মাছ ধরে নিতে হবে। দিনের সূর্যালোকে রোটেনন প্রয়োগ করলে ভালো দ্রুত ও ভালো ফল পাওয়া যায়। রোটেনন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর্যন্ত এর কার্যকারিতা থাকে।

চিত্রঃ পুকুরে চুন প্রয়োগ

ক্যালসিয়াম কার্বাইড

কাঁকড়া পুকুরের পাড় নষ্ট করে। কাঁকড়া মারার জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ট্যাবলেট অত্যন্ত কার্যকর। কাঁকড়ার গর্তের মধ্যে ৪-৫টি ট্যাবলেট রেখে গর্তটি বন্ধ করে দিলে কাঁকড়া মারা যায়। কাঁকড়া সহজেই আলো দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আলোর ফাঁদ পেতেও কাঁকড়া মারা যেতে পারে।

চুন প্রয়োগ

সাধারণত মাটি ও পানির পিএইচ এর উপর নির্ভর করে চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মাটি ও পানির পিএইচ ৬.৫ -৭.৫ এর মধ্যে থাকলে প্রতি শতাংশে ১- ১.৫ কেজি পোড়া চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

পুকুর তৈরির সময় প্রয়োজনীয় চুন মাটির চাড়ী বা স্টিলের হালকা ড্রামের মধ্যে নিয়মানুযায়ী ভিজিয়ে রেখে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাড়ের ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুর তলা চাষ দেয়ার ২-৩ দিন পর অথবা পানি ভর্তি পুকুরে ঔষধ প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

সতর্কতা

ক) চুন ব্যবহারের সময় নাক, মুখ গামছা দিয়ে ঢেকে নিতে হবে এবং বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে যাতে চুন। প্রয়োগকারীর শরীরে না পড়ে।

খ) প্লাস্টিকের বালতিতে চুন ভিজানো যাবে না।

সার প্রয়োগ

প্রাকৃতিক খাদ্য বা প্যাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য পুকুরে দুধরনের সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যথা- জৈব ও অজৈব সার।

অজৈব সার

অজৈব সার হিসেবে পুকুরে সাধারণত ইউরিয়া, টিএসপি ব্যবহার করা হয়। অজৈব সার প্রাথমিকভাবে পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

জৈব সার

পুকুরে জৈব সার হিসেবে সাধারণত গোবর, কম্পোস্ট, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করা হয়। পুকুরে জুপ্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য মূলত জৈব সার ব্যবহার করা হয়।

অজৈব সার

অজৈব সার হিসেবে পুকুরে সাধারণত ইউরিয়া, টিএসপি ব্যবহার করা হয়। অজৈব সার প্রাথমিকভাবে পুকুরে ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে সার প্রয়োগের মাত্রা (শতাংশ প্রতি)

গোবর	-	৮-১০ কেজি অথবা
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	-	৪-৫ কেজি
ইউরিয়া	-	১০০- ১৫০ গ্রাম
টিএসপি	-	৫০-৭৫ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

শুকনো পুকুরের তলা ভালো করে চাষ দিয়ে প্রথমে প্রয়াজনীয় জৈব সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গলদা চিংড়ির পুকুরে চাষের সাথে কিছু সরিষার খৈল (০.২৫ কেজি/শতাংশ) মিশিয়ে দিলে ভালো হয়। পুকুর পানি দিয়ে ভর্তি করার পর অজৈব সার পানিতে গুলিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে অজৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। এতে সার দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়।

চিত্রঃ শুকনো পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

চিত্রঃ সার মিশ্রণ পদ্ধতি

চিত্রঃ পানি ভরা পুকুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

হররা টানা

পুকুরে সার প্রয়োগের ৭ দিন পর এবং চিংড়ি ছাড়ার পূর্বে ভালো করে হররা টেনে দিতে হবে যাতে পুকুরের তলার কাদায় কোনো বিষাক্ত গ্যাস না থাকে।

চিত্রঃ হররা টানা

আশ্রয়স্থল স্থাপনঃ গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ভিন্নতর। চিংড়ি খোলস বদলানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। খোলস পাল্টানোর সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। তখন তাদের আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। সব চিংড়ি একই সময়ে খোলস পাল্টায় না। এ সময় সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িগুলোকে খেয়ে ফেলতে পারে। এজন্য চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনায় আশ্রয়স্থল স্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন যাতে অন্য প্রাণী বা চিংড়ি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। তাই তাল/না-রিকেল/খেজুর গাছের শুকনো পাতা/ বাঁশের কঞ্চি। ভাঙা প্লাস্টিক পাইপ। গাছের ডালপালা ইত্যাদি দিয়ে আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায়। শতকে কমপক্ষে ১টি আশ্রয়স্থল স্থাপন করা উচিত।

আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত উপকরণ

- শুকনা তাল বা নারিকেলের পাতা/খেজুর পাতা।
- বাঁশের কঞ্চি/বাঁশের চোঙা
- প্লাস্টিকের ফাঁপা পাইপ।
- ভাঙা কলসের অংশ।
- গাছের ডাল (হিজল গাছের ডাল উত্তম)

ডালপালা পচে পানি যেন নষ্ট না হয়।

চিত্রঃ চিংড়ি আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশল

তাল বা নারিকেলের পাতা এমনভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাল বা নারিকেলের পাতা কোণাকোণি (৪৫°) পুতে দিলে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেশি জায়গা পাওয়া যাবে এবং পাতাগুলো মাটির উপর থাকলে সহজে পচবে না। বাঁশের কঞ্চি আটি বেঁধে অথবা প্লাস্টিকের পাইপ পৃথক পৃথকভাবে পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে। খেজুরের পাতা আটি বেঁধে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণ

চিংড়ি মজুদের ২/১ দিন পূর্বে তাল বা নারিকেলের পাতা প্রতি শতাংশ জলায়তনে ১-২টি স্থাপন করতে হবে। তাল বা নারিকেলের ডাল মাটিতে এমনভাবে পুঁতে দিতে হবে যেন পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে কোণাকোণি অবস্থায় থাকে। প্লাস্টিক পাইপ, ভাঙা কলসি, পুকুরের তলায় রেখে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, চিংড়ি মজুদের ১-২ দিন আগে তাল, নারিকেল বা খেজুর পাতা প্রতি শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য উপকরণগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে।

পরিণত চিংড়ি মজুদকরণ

অভ্যস্থকরণঃ যে কোনো এলাকা থেকে সংগৃহীত চিংড়ি পুকুরে মজুদের পূর্বে উক্ত পুকুরের পানির পরিবেশ ও তাপমাত্রার সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে। যে পাত্রে চিংড়ি পরিবহন করে আনা হবে সেই পাত্রের ৫০% পানি ফেলে দিয়ে উক্ত পাত্রে পুকুর থেকে ১৫-২০ মিনিট ধরে পানি ছিটিয়ে ৫০% পানি পূর্ণ করতে হবে। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা না আসা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। অভ্যস্থকরণ ব্যতিরেকে কোনো অবস্থাতেই চিংড়ি পুকুরে ছাড়া যাবে না।

মজুদের হারঃ পুকুরের পানির প্রতি শতাংশে ৪০-৫০টি (স্ত্রী: পুরুষ = ২- ৩: ১)

খাদ্য তৈরিঃ ব্রুড পরিণত চিংড়ির খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি নিচে দেয়া হলোঃ

উপাদান	-	মিশ্রণের হার
খৈল	-	৪০%
কুঁড়া	-	২০%
ফিসমিল / মিট এন্ড বানে মিল	-	২৫%
গম/ ভুট্টার ভুষি	-	১৫%
	মোট	১০০ %

এছাড়াও প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৫০- ১০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন প্রিমিক্স মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। সাধারণত এ জাতীয় খাদ্যে প্রায় ৩০% প্রোটিন থাকে।

খাদ্য প্রয়োগ

মজুদকৃত চিংড়ির দৈহিক ওজনের ৩-৪% হারে দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রতি দিনের খাদ্যকে দুভাগে ভাগ করে সকাল ও সন্ধ্যায় তা প্রয়োগ করতে হবে। তৈরিকৃত ও মিশ্র খাদ্যের পরিবর্তে চিংড়ির উপযোগী তৈরি পিলেট খাবার চিংড়ির দৈহিক ওজনের ৪% হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিংড়ি নিশাচর বিধায় সন্ধ্যায় কিছুটা বেশি খাবার প্রয়োগ করতে হবে। চিংড়ি খাবার ঠিকমত গ্রহণ করছে কি না তা মাঝে মধ্যে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

পুকুরে চিংড়ির বৃদ্ধি যথাযথভাবে হচ্ছে কি না এবং তাদের দেহে রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না তা মাঝে মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। গলদা চিংড়ির দৈনিক গড় দৈহিক বৃদ্ধি ০.৪ - ০.৭৫ গ্রাম হয়ে থাকে। চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধির সময়কাল হচ্ছে। মার্চ থেকে নভেম্বর এবং কম বৃদ্ধির সময়কাল হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস।

চিত্রঃ পুকুরের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষন

ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ

ব্রুড চিংড়ি বা পরিপক্ব চিংড়ি সহজেই পাওয়া যায় এমন জায়গায় হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত। বাংলাদেশের সকল ধরনের জলাশয়ে অর্থাৎ নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও পুকুরে পরিপক্ব গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। এছাড়া হ্যাচারির নিজস্ব পুকুরেও ব্রুড চিংড়ি বা ডিমওয়ালা চিংড়ি উৎপাদন করে হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে পুকুরের চিংড়ির ডিম আসতে শুরু করে। এ সময় পুকুর থেকে ডিমওয়ালা চিংড়ি আহরণ করতে হবে। ডিমওয়ালা চিংড়ি আহরণের জন্য সাধারণত মই জাল বা বেড় জাল ব্যবহার করা হয়। ব্রুড চিংড়ি আহরণের পর অতি যত্ন সহকারে পরিবহন করতে হবে যেন ডিমওয়ালা চিংড়ি কোনোক্রমেই আঘাত প্রাপ্ত না হয়। ঝাঁকি জাল দিয়েও ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করা যেতে পারে। সকাল অথবা সন্ধ্যা, যখন দিনের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে এমন সময় চিংড়ি আহরণ করা উত্তম। এতে ব্রুড চিংড়ির উপর বাড়তি পরিবেশগত কোনো পীড়ন (stress) পড়ে না। সাধারণত ৩ ধরনের চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। ধূসর বর্ণের ডিমওয়ালা, কমলা রঙের ডিমওয়ালা ও মাথায় অবস্থিত ডিমওয়ালা চিংড়ি। ধূসর বা কমলা বর্ণের ডিমওয়ালা চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে সেক্ষেত্রে মাথায়। ডিমওয়ালা কমলা রঙের চিংড়ি সংগ্রহ করে ২-৩টি স্ত্রী চিংড়ির জন্য ১টি পুরুষ চিংড়ি একত্রে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে সংগৃহীত চিংড়ি সংগ্রহ করে পরিশোধনপূর্বক হোল্ডিং ট্যাংকের পরিবেশে মিলনের জন্য রাখতে হবে।

চিত্রঃ ব্রুড চিংড়ি

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. গলদা বুড় চিংড়ি মজুদ পুকুরের আয়তন কত হলে ভালো হয়?
২. গলদা ব্রুড চিংড়ি মজুদ পুকুরের গভীরতা কত হলে ভালো হয়?
৩. রাক্ষুসে মাছ দমনে রোটেনন পাউডারের প্রয়োগমাত্রা কত ?
৪. পুকুরে চুন প্রয়োগের মাত্রা কিসের উপর নির্ভরশীল?
৫. পুকুরে সাধারণত কয় ধরনের সার ব্যবহার করা হয়?
৬. পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রতি শতাংশ পুকুরে কী পরিমাণ গোবর সার প্রয়োগ করা হয়?
৭. পুকুরে হররা টানা হয় কেন?
৮. মজুদকৃত চিংড়ির দৈহিক ওজনের শতকরা কত ভাগ খাদ্য পুকুরে প্রয়োগ করা হয়?
৯. গলদা চিংড়ির দৈনিক গড় দৈহিক বৃদ্ধি কত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গলদা ব্রুড মজুদ পুকুরের পাড় সম্পর্কে লেখ ।
২. ব্রুড পুকুরে রোটেনন প্রস্তুতকালীন সময়ে পাউডারের ব্যবহার পদ্ধতি লেখ ।
৩. ব্রুড পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে চুন প্রয়োগ পদ্ধতি লেখ ।
৪. গলদা চিংড়ির পুকুরে আশ্রয়থল স্থাপন করা হয় কেন?
৫. গলদা চিংড়ির পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন ।

১. গলদা চিংড়ির পুকুর প্রস্তুতি বর্ণনা কর ।
২. মজুদ পুকুরে গলদা চিংড়ি মজুদ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
৩. ব্রুড গলদা চিংড়ি সগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

চতুর্থ অধ্যায়

গলদা চিংড়ির প্রজনন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা

তাইওয়ানের বিজ্ঞানী ড. এস ডবিউ লিং ১৯৬১ সনে মালয়েশিয়ার মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটে কাজ করার সময় সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করেন যে, গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির চিংড়ি হলেও ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে (Brackish Water) এরা লার্ভা পর্যায় সম্পন্ন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এ চিংড়ি নদীর মাহনায় ডিম ছাড়ে, ডিম ফুটে লার্ভি বের হয়, লার্জি মোহনায় প্রায় এক মাসের মধ্যে পিএল হয় এবং পরবর্তীতে নদীর উজানে যাত্রা শুরু করে ও জুভেনাইল চিংড়িতে পরিণত হয়। ১৯৬২ সালে ড. লিং ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে লার্ভা পালন করে সাফল্য লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পুকুরে চাষের জন্য গলদা চিংড়ির পোনা উৎপন্ন করেন। এর পরে ১৯৬৫ সালে টি ফুজিমুরা এর নেতৃত্বে হাওয়াইতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন ও চাষের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়।

যে কোনো চাষ ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো ভাল বীজ বা পোনার প্রাপ্যতা। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে থাইল্যান্ডের কিছু চাষি প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহ করে গলদা চাষ শুরু করে। আমাদের দেশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও বরিশালের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহ করে সনাতন পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ শুরু করে।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৮ সালে প্রথম এডিবি প্রকল্প থেকে কক্সবাজারে গলদা চিংড়ির হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চিংড়ি চাষ প্রকল্পের (আইডিএ) কর্মকর্তাগণ সাময়িক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে। চিংড়ি চাষ প্রকল্প (আইডিএ) খুলনা অঞ্চলে ১৯৮৮ সনে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জে সাধারণভাবে নির্মিত হ্যাচারি দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে পিএল উৎপাদনে সফলতা লাভ করে। ১৯৯৩ সনে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চাঁদপুর-এর সহযাগিতায় গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারির সূচনা হয়। ১৯৮৮ সালে উত্তর-পশ্চিম মৎস্য সমপ্রসারণ প্রকল্প, পার্বতীপুর, দিনাজপুরে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন হয়। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের ১০টি জেলায় ১০টি চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করে মোটামুটিভাবে সফলতা লাভ করে। সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কতিপয় বেসরকারি সংস্থা বিশেষ করে ব্র্যাক, প্রশিকাসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন বেশ কিছু হ্যাচারি গলদার পিএল উৎপাদন করছে।

গলদা হ্যাচারির প্রয়োজনীয়তা

গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে প্রধান সমস্যা পিএল/জুভেনাইলের দুষ্প্রাপ্যতা। দেশে গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পিএল স্বল্পতার কারণে চাষ সম্প্রসারণ বিঘ্নিত হয়। চিংড়ি চাষিদের চাহিদা অনুসারে পিএল সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত হ্যাচারি নেই। বাংলাদেশের গলদা চিংড়ি চাষ প্রধানত প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়ি পোনার উপর নির্ভরশীল। চিংড়ি চাষিগণ প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পিএল মজুদ করে চিংড়ি চাষ করে থাকে। ফলে প্রাকৃতিক উৎসের পিএলও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে অপরিকল্পিতভাবে পোনা সংগ্রহকালে অন্যান্য প্রজাতির অসংখ্য পোনা/জীব বিনষ্ট হওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়াও নিম্নলিখিত কারণে গলদা হ্যাচারি স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম:

- গলদা রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম
- দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিমায়িত চিংড়ি, এর মধ্যে গলদা চিংড়ির পরিমাণ ৬০০০-৭০০০ মে.টন

- সুস্থ-সবল পিএল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস
- পরিবেশ বিপর্যয় রোধ
- সময়মতো সহজলভ্য উপায়ে পিএল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- একই আকারের/একই জাতের এবং একই বয়সের পিএল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

চিংড়ি হ্যাচারির প্রকারভেদ

প্রজাতির উপর ভিত্তি করে চিংড়ি হ্যাচারি দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা-।

ক) গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ও

খ) বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি পানি ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে চিংড়ি হ্যাচারি তিন প্রকারের হয়ে থাকে যথা

১. প্রবাহ পদ্ধতি (Flow through system/Open system): এ পদ্ধতিতে ব্রাইন মিশ্রিত শোধনকৃত পানি পুনঃব্যবহার করা হয় না। এটি সারা বিশ্বে কার্যকরভাবে প্রচলিত পদ্ধতি। অধিক ঘনত্বে লার্ভি মজুদ করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ ব্রাইন প্রয়োজন হয় ফলে উপকূলীয় এলাকার জন্য অধিক উপযোগী।

২. পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতি (Re-circulation System/ Closed system): এ পদ্ধতিতে বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশন বা বায়োফিল্টার লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের সাথে ব্যবহৃত হয়। ব্রাইন মিশ্রিত শোধনকৃত পানি পুনঃব্যবহার হয় বিধায় ব্রাইনের পরিমাণ কম লাগে। হ্যাচারিতে বাণিজ্যিকভাবে পিএল উৎপাদনে এ পদ্ধতি ব্যবহার হয়। পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতি গতিশীল আবদ্ধ পদ্ধতি (Dynamic Close System) নামেও পরিচিত। বায়োফিল্টারের মাধ্যমে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের পানির ভৌত ও বায়োলজিক্যাল ফিলট্রেশন হয়। ফলে Solid and Nitrogenous থিংবেং দূরীভূত হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতিটি লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের সাথে একটি বায়োফিল্টার ব্যবহৃত হয়। বিশেষক্ষেত্রে কমন বায়োফিল্টার ব্যবহৃত হয়।

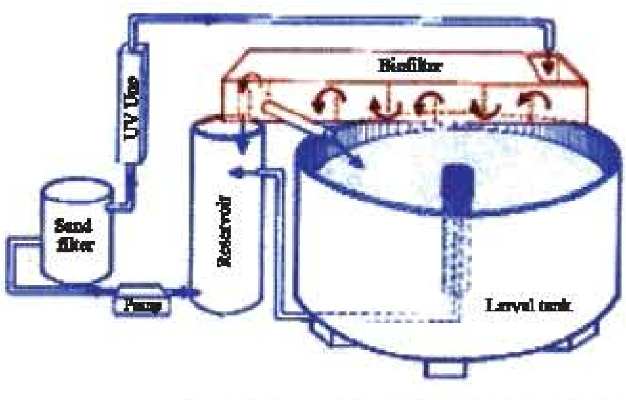

চিত্রঃ পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে পানি প্রবাহচিত্র

৩. সবুজ পানি পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে একটি ট্যাংকে ১২ পিপিটি লবণাক্ততার পানিতে প্রধানত ক্লোরেলা ও অন্যান্য প্রজাতির ফাইটোপ্লাংকটনের মিশ্রচাষ করা হয়। প্রতিদিন লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের পানি

২০২২

পরিবর্তনকালে পরিষ্কার পানির পরিবর্তে সবুজ পানি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত হাওয়াই দ্বীপে এ পদ্ধতি প্রচলিত। আমাদের দেশে এ পদ্ধতির হ্যাচারি এখনও চালু হয়নি।

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির স্থান নির্বাচন

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থায়ীভাবে ব্যয়বহুল বাণিজ্যিক হ্যাচারি স্থাপন করার পূর্বে স্থান নির্বাচনের জন্য দূরদর্শীতার সাথে বিভিন্ন বিষয়াদি বিবেচনা করা প্রয়োজন। হ্যাচারি স্থাপনের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত।

পোনা বিপণনের সুব্যবস্থা (Fry marketing facility): হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সঠিকভাবে বিপণন পূর্বক হ্যাচারির বাণিজ্যিক উপযোগিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই উৎপাদিত পোনার বাজার প্রাপ্তির বিষয়টি হ্যাচারি স্থাপনকালে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। গলদা চিংড়ি চাষ এলাকার কাছাকাছি যেখানে মূল চাষ মৌসুমে গলদা চিংড়ি পোনার চাহিদা রয়েছে সেসব এলাকায় হ্যাচারি স্থাপন করা হলে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল বিপণনের সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি পিএল-এর পরিবহনজনিত পীড়নের সম্ভাবনা থাকে না।

ভূগর্ভস্থ পানির গুণাগুণ: হ্যাচারির সফলতা পানির গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য মানসম্মত ব্রাইন এবং স্বাদু পানির প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের কাছাকাছি হ্যাচারি স্থাপন করা সম্ভব না হলে হ্যাচারি পরিচালনার উপযোগী ব্রাইন ভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়। ব্রাইন সংগ্রহের উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা হলে ব্রাইনের পরিবহনজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু স্বাদু পানি হ্যাচারি এলাকা থেকেই সংগ্রহ করা হয়। হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে তাই ব্রাইন অপেক্ষা স্বাদু পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। হ্যাচারি স্থাপনের জন্য এমন কোন স্থান নির্বাচন করা সমীচীন নয়, যেখানে ব্রাইন এবং স্বাদু পানি উভয়ই পরিবহন করার প্রয়োজন হয়। স্বাদু পানি ভূগর্ভস্থ বা ভূ-উপরিতরের হতে পারে। হ্যাচারিতে ব্যবহারের উপযোগী স্বাদু পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

প্যারামিটার	মাত্রা
পিএইচ	৭.০-৮.৫
লৌহ	<০.২ পিপিএম
ক্ষারত্ব	৮০ - ১০০ পিপিএম
দ্রবীভূত অক্সিজেন	> ৫ পিপিএম
নাইট্রাইট নাইট্রোজেন	০.১ পিপিএম (যত কম তত ভালো)
নাইট্রেট নাইটোজেন।	২০ পিপিএম (যত কম তত ভালো)
অ্যামোনিয়া	০.১ পিপিএম (যত কম তত ভালো)
ক্লোরিন	মুক্ত
ভারী ধাতু	<০.০১ পিপিএম
আর্সেনিক	<০.০১ পিপিএম
হাইড্রোজেন সালফাইডমুক্ত	
কীটনাশক মুক্ত	

২০২২

ব্রুড প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন ও পরিপক্ক ব্রুড প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক। বাণিজ্যিক হ্যাচারি পরিচালনায় সুস্থ, সবল ও রাগমুক্ত ব্রুড চিংড়ি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর সহজ প্রাপ্যতার উপরে হ্যাচারির বাণিজ্যিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে বা চাষের জলাশয় থেকে পরিপক্ক ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা ব্রুড চিংড়ি উৎপাদনের উপযোগী হ্যাচারি সংলগ্ন জলাশয় থাকলে নির্ধারিত সময়ে সেখানে ব্রুড উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ সুবিধা: হ্যাচারি এলাকায় ২২০ ও ৪৪০ ভাল্টের নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বিদ্যুৎ ব্যতীত একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা সহজসাধ্য নয়। তাই হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে সেখানে ১-ফেজ (২২০ ভোল্ট) এবং ৩-ফেজ (৪৪০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। বিকল্পভাবে এয়ার বোয়ার চালানোর জন্য ডিজেল ইঞ্জিন ও জেনারেটর থাকা আবশ্যক।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: হ্যাচারির যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হলে উৎপাদিত পোনা বাজারজাতকরণে অপরিসীম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবহনজনিত কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে হ্যাচারির বাণিজ্যিক উৎকর্ষ সাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ব্রাইন সগ্রহ, ব্রুড চিংড়ি সংগ্রহ, হ্যাচারির উপকরণাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের সুবিধার্থে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থাযুক্ত স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা আবশ্যক।

পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা: একটি স্বাস্থ্যসম্মত হ্যাচারির জন্য উত্তম পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অপরিহার্য। হ্যাচারির বর্জ্য পানি যেন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ন্যূনতম ক্ষতির সৃষ্টি না করে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় সেদিকে খেয়াল রেখে হ্যাচারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

বন্যামুক্ত স্থান: বন্যামুক্ত উপযোগী এলাকায় চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করতে হবে। নতুবা বন্যার পানিতে হ্যাচারি অবকাঠামাসমূহের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

দূষণমুক্ত এলাকা: পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণমুক্ত না হলে হ্যাচারিতে আকস্মিক যে কোনো রাসায়নিক বা জীবাণুঘটিত দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই হ্যাচারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের প্রাক্কালে উক্ত এলাকা দূষণমুক্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প-কলকারখানা, ইটের ভাটা, রাইস মিল, কাঁচা বাজার, সুপার মার্কেট ইত্যাদির কাছাকাছি স্থানের পরিবেশ সর্বদা দূষণযুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প-কলকারখানার অশোধিত বর্জ্যপদার্থ এবং কালো ধোঁয়া পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। এরূ প বর্জ্যপদার্থের কারণে আশপাশের স্বাদু পানির গুণাগুণ দূষিত থাকে। তাই হ্যাচারি স্থাপনের জন্য এরূ প স্থান নির্বাচন থেকে যতদূর সম্ভব বিরত থাকা সমীচীন।

দুষণমুক্ত এলাকা: পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দুষণমুক্ত না হলে হ্যাচারিতে আকস্মিক যে কোনো রাসায়নিক বা জীবাণুঘটিত দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই হ্যাচারি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের প্রাক্কালে উক্ত এলাকা দূষণমুক্ত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। শিল্প-কলকারখানা, ইটের ভাটা, রাইস মিল, কাঁচা বাজার, সুপার মার্কেট ইত্যাদির কাছাকাছি স্থানের পরিবেশ সর্বদা দূষণযুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প-কল অশোধিত বর্জ্যপদার্থ এবং কালো ধোঁয়া পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। এরূপ বর্জ্যপদার্থের কারণে আশপাশের স্বাদু পানির গুণাগুণ দূষিত থাকে। তাই হ্যাচারি স্থাপনের জন্য এরূ প স্থান নির্বাচন থেকে যতদূর
২০২২ সম্ভব বিরত থাকা সমীচীন।

উপকরণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা: হ্যাচারি নির্মাণকালে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী এবং হ্যাচারি পরিচালনার সময় উৎপাদন। কাজে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সহজলভ্য না হলে হ্যাচারির নির্মাণকাজ বা উৎপাদন কর্মকা- ব্যাহত হতে পারে। দূরবর্তী স্থান থেকে এসব উপকরণ সংগ্রহ করতে গেলে সময়, ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে এসব বিষয়াদি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা দরকার।

মাটির ধরন ও পানি ধারণক্ষমতা: কোনো এলাকার মাটির ধরন ও পানি ধারণক্ষমতার উপরে সে স্থানের স্বাদপানির গুণাগুণ এবং যে কোনো স্থাপনা নির্মাণের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে। তাই গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে সে স্থানের মাটি পরীক্ষা করা উচিত। অন্যথায় হ্যাচারি পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা মাঝামাঝি পর্যায়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হ্যাচারি ভবন, অবকাঠামো অথবা পানির গুণাগুণে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু: কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে সে স্থানের বায়ু ও পানির তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের আদ্রতা ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত। বাতাসের তাপমাত্রা দিন-রাত এবং ঋতুবৈচির্ত্যের সাথে ব্যাপকভাবে উঠানামা করে এমন স্থান গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য উপযোগী নয়। হ্যাচারি পরিচালনার সাথে এসব বিষয়াদির সম্পর্ক রয়েছে বিধায় হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে উক্ত স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়াদি বিবেচনায় এনে হ্যাচারির স্থান নির্বাচন করা উচিত।

সামাজিক নিরাপত্তা: সফলভাবে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য এলাকার সামাজিক পরিস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং নৈতিক সমর্থন ব্যতীত কোনো প্রকার উৎপাদন-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন ও পরিচালনায় যেহেতু বড় অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, তাই হ্যাচারি স্থাপনের পূর্বে বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। হ্যাচারি এলাকার সামাজিক পরিস্থিতি, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ধর্মঘট, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অস্থিরতা সে স্থানে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন, পরিচালনা ও পোনা বিপণন কর্যক্রমকে ব্যাহত করবে। তাই এরূপ সমস্যাসংকুল স্থানে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত নয়।

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, ধারণক্ষমতা ও ব্যবহারের উপযাগেিতার উপর এর উৎপাদন সফলতা নির্ভর করে। হ্যাচারির ধরন, হ্যাচারি পরিচালনা পদ্ধতি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদন এলাকার পরিবেশের সাথে অবকাঠামোর পার্থক্য বা পরিবর্তন হতে পারে। সুতরাং একটি হ্যাচারি নির্মাণের পূর্বে সংশিষ্ট এলাকার পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে অভিজ্ঞ নকশাকার দিয়ে এর নকশা তৈরি করে নিতে হবে। নকশা তৈরির সময় নিম্নেক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. নির্বাচিত এলাকার ভৌগলিক সুবিধা।
২. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।
৩. উপকরণ সংগ্রহের সুবিধা
৪. স্থানীয় জনগনের গ্রহনযোগ্যতা ও সম্পক্ততা
৫. হ্যাচারিতে কর্মরত শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা
৬. হ্যাচারি পরিচালনার ঝুঁকিসমূহ অপসারণ বা কমানোর সুবিধা
৭. হ্যাচারির বর্জ্য নিষ্কাশন ও আবর্জনা অপসারণের সুবিধা
৮. জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সুবিধা

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো

গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো সঠিকভাবে এবং সঠিক ধারণক্ষমতা সম্পন্নভাবে নির্মাণ করা না হলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে এবং হ্যাচারি পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। হ্যাচারিতে কর্মরত কর্মচারীদের ব্যবহার উপযাগেিতার কথা বিবেচনায় রেখে সঠিক ডিজাইন এবং আয়তনের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামোর ডিজাইন এবং আয়তন নিম্নলিখিত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে

১. ভূমির আকার, আয়তন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অবস্থানগত সুবিধা =
২. মূলধন বিনিয়োগের সামর্থ্য
৩. উৎপাদনযোগ্য চিংড়ির প্রজাতি
৪. হ্যাচারির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, পোনের বাজার ও ব্রুড চিংড়ির প্রাপ্যতা
৫. হ্যাচারি পরিচালনায় দক্ষ জনবল

উপরালেখিত বিষয়াদির প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত একটি আদর্শ গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে নিম্নলিখিত ভৌত সুবিধা থাকা প্রয়োজন

হ্যাচারি ভবন: গলদা চিংড়ি হ্যাচারির ভবনটি খোলামেলা হওয়া প্রয়োজন। ইটের সাধারণ গাঁথুনির উপরে অ্যাসবেস্টস অথবা ফাইবার শিটের ছাউনী দেয়া হলে ভবনের অভ্যন্তরে পরিচালিত উৎপাদন কাজে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে লার্ভা প্রতিপালনের ট্যাংকে প্রচুর আলো পড়ার প্রয়োজন হয়। তাই অ্যাসবেস্টসের ছাউনীর ক্ষেত্রে এলআরটি-এর ঠিক উপরে স্বচ্ছ ফাইবার শিট স্থাপন করে ট্যাংকে আলো পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হ্যাচারি ভবনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎপাদন ট্যাংকসমূহ ছাড়াও আর্টিমিয়া হ্যাচিংএর ব্যবস্থা, ল্যাবরেটরি, অফিস, স্টোর, ফিডরুম, ওয়াশরুম ইত্যাদির সংস্থান রাখতে হবে। তাই নির্মাণকালে এমনভাবে এর নকশা প্রণয়ন করতে হয় যেন বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যাতায়াতে কোনো সমস্যা না হয়, অথচ হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না।

ব্রাইন মজুদের ট্যাংক: গলদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালনা করতে হলে সারা মৌসুমেই লবণ পানির প্রয়োজন হয়। তাই প্রথমেই লবণ পানি মজুদ করে রাখতে হয়। যে সব এলাকায় কেবলমাত্র বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ব্রাইন পাওয়া যায় (লবণ তৈরির মাঠ বা বিশেষ ভাবে হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত ব্রাইন) সে এলাকা থেকে ব্রাইন সংগ্রহ করে মজুদ ট্যাংকে রাখতে হয়। এ ট্যাংক মাটির উপরে বা মাটির নিচে বা অর্ধেক মাটির নিচে স্থাপন করা যায়। এ ট্যাংক সিমেন্ট-কংক্রিটের দ্বারা নির্মাণ করে পানি প্রবেশ ও বাহির এবং পরিষ্কার করার পাইপলাইন রাখতে হবে।

স্বাদু পানির টিউবওয়েল, পাম্প মেশিন এবং পাম্প হাউস: ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে স্বাদু পানির চাহিদা মিটানো হয়। এ জন্য টিউবওয়েল, পাম্পমেশিন ও পাম্প হাউস প্রয়াজন। হ্যাচারির দৈনিক পানির চাহিদার উপরে নির্ভর করে টিউবওয়েলের ব্যাস, পাম্পের শক্তি ও পাম্প হাউসের আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পানি মিশ্রিতকরণ ও শোধন ট্যাংক: এ ট্যাংকে স্বাদু পানির সাথে ব্রাইন মিশ্রিত করে নির্ধারিত লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি তৈরি করা হয় এবং বিচিং পাউডার মিশ্রিত করে পানি শোধন করা হয় । এ ট্যাংকের আয়তন ও সংখ্যা হ্যাচারি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভরশীল । হ্যাচারিতে দৈনিক পানি ব্যবহারের চাহিদার উপরে নির্ভর করে অন্তত ৫ দিনের চাহিদা মিটাতে পারে এরূপ আয়তনের পানি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন শোধন ট্যাংক নির্মাণ করা উচিত । ব্যবস্থাপনা সুবিধার জন্য ১৫-২০ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংকই উপযোগী । এ ট্যাংক মূল হ্যাচারি ঘরের বাইরে থাকতে পারে । মিশ্রণ ট্যাংক RCC ঢালাই নির্মিত হলে ভালো হয় । খরচ কমানোর জন্য ইটের গাথুনি দিয়েও এ ট্যাংক নির্মাণ করা যেতে পারে ।

বালির ফিল্টার ট্যাংক

এ ট্যাংকে বালি, কাঠকয়লা, কাঁকর, নুড়িপাথর, ঝিনুক, ইত্যাদি দিয়ে পানি ছাকনি বা ফিল্টার তৈরি করা হয় । পানিতে উপস্থিত সকল প্রকার অদ্রবণীয় কণা, ভাসমান পদার্থ, বিভিন্ন প্রাণীর ডিম, লার্ভা ইত্যাদি এমনকি সকল প্রোটোজোয়া, ফাংগাস এবং অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া এ ফিল্টারের সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব । হ্যাচারির পানির চাহিদানুযায়ী প্রতি ঘণ্টায় কতটুকু পানি ফিল্টার করতে হবে তা নির্ধারণ করে এর আয়তন এবং ধারণক্ষমতা ও সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় ।

পরিশ্রুত পানি জমা করার ট্যাংক

হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে এর উৎপাদন ট্যাংকে একবারে অনেক পানি সরবরাহের প্রয়োজন হতে পারে । তাই প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শোধিত ও পরিশ্রত পানি প্রয়োজনীয় পরিমাণে জমা রাখার জন্য এ ধরনের ট্যাংকের প্রয়োজন হয় । হ্যাচারিতে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় পানির ৩-৫ গুণ পানি এ সমস্ত ট্যাংকে মজুদ রাখলে হ্যাচারি পরিচালনা সহজতর হয় ।

ওভারহেড ট্যাংক

শোধিত ও পরিশ্রুত মিশ্রিত পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে সহজে উৎপাদন ট্যাংকে প্রবাহিত করার জন্য ওভারহেড ট্যাংকের প্রয়োজন হয় । এ ধরনের ট্যাংক সাধারণত সিমেন্ট-কংক্রিটের নির্মিত হয়ে থাকে এবং এর নির্মাণ ব্যয় কিছুটা ব্যয়বহুল হয়ে থাকে । ওভারহেড ট্যাংকের সাহায্যে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে দৈনিক পানি পরিবর্তনকালে এলআরটিতে পানি সঞ্চালনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় ।

ব্রুড শোধন ট্যাংক

বাইরে থেকে সংগৃহীত ক্রুড বা ডিমওয়ালা চিংড়ি এ ট্যাংকে শোধন করা হয় । সাধারণত ০.৫-১ টন ধারণক্ষম-তা । সম্পন্ন ট্যাংক এ কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । কাজের সুবিধার্থে স্থায়ী অবকাঠামো অপেক্ষা ফাইবার গ্লাস বা প্লাস্টিকের স্থানান্তরযোগ্য ট্যাংক এ কাজে ব্যবহার করা হয় ।

ব্রুড চিংড়ি হোল্ডিং ও ম্যাচুরেশান ট্যাংক

ডিম ফুটে লার্ভা বের হওয়া পর্যন্ত পরিপক্ব স্ত্রী গলদা চিংড়িকে এ ট্যাংকে রেখে প্রতিপালন করা হয় । হোল্ডিং ট্যাংক ২ ধরনের হয়ে থাকে । প্রথমত বাইরে থেকে ডিমওয়ালা চিংড়ি এনে একটি পৃথক চৌবাচ্চায় রাখতে হয় । পরে এ চৌবাচ্চা থেকে যেসব চিংড়ির ডিম ধূসর বর্ণের হবে সেই চিংড়ি দ্বিতীয় হোল্ডিং ট্যাংকে রাখা হয় । একটি ট্যাংকেও এ কার্যক্রম সম্পাদন করা যায় তবে পৃথক ট্যাংক ব্যবহার হ্যাচারি পরিচালনা সহায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত । ২০২২

হ্যাচিং ট্যাংক

এ ট্যাংকে পরিপক্ব স্ত্রী গলদা চিংড়ি রাখা হয় এবং এখানে এর ডিম ফুটে লার্ভা হয়। অনেক হ্যাচারিতে ব্রুড হোল্ডিং ট্যাংককে হ্যাচিং ট্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে আলাদা হ্যাচিং ট্যাংক ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত। এ কাজে স্থায়ী অবকাঠামো অপেক্ষা ঋজচ ট্যাংক ব্যবহার করা সুবিধাজনক। হ্যাচিং ট্যাংক লম্বাকৃতি বা গোলাকার হতে পারে। এখানে ডিম ফুটার পরে লার্ভা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সংযোগ করা যায়। এর ধারণক্ষমতা ৫০০ লিটার থেকে ১ টনের মধ্যে হলে ভালো হয়।

লার্ভা প্রতিপালনের ট্যাংক বা এলআরটি

এই সমস্ত ট্যাংকে সদ্য ফোটা লার্ভা মজুদ করা হয় এবং পিএল হওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রতিপালন করা হয়। ট্যাংকের আকার উপ-বৃত্তাকার, গোলাকার অথবা বর্গাকার হতে পারে। ট্যাংক পরিষ্কার করা ও তাতে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য গোলাকার ট্যাংক অধিকতর সুবিধাজনক। এ ধরনের ট্যাংকের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে খাদ্য পরিবেশন করা এবং পরিষ্কার করা সহজতর। ব্যবস্থাপনা সুবিধার জন্য গলদা চিংড়ি হ্যাচারির লার্ভা প্রতিপালনের ট্যাংক সাধারণত ৩ টন থেকে ৫ টনের মধ্যে হয়ে থাকে। ছোট হ্যাচারির জন্য ১-২ টন পানিধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ফাইবার গ্লাস বা প্লাস্টিক ট্যাংকও ব্যবহার করা যায়।

বায়োফিল্টার ট্যাংক

পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনাকালে এলআরটি-এর সাথে বায়োফিল্টার ট্যাংক নির্মাণ করতে হবে। এলআরটি সংলগ্ন বায়োফিল্টার ট্যাংক সাধারণত এলআরটি-এর আয়তনের ২৫% হয়ে থাকে। এ ট্যাংক নির্মাণকালে এলআরটি-এর সাথে বায়াফিল্টার ট্যাংকের মধ্যে পানি পুনঃসঞ্চালনের বিভিন্ন সুবিধার সংস্থান রাখতে হবে। প্রতিটি এলআরটি-এর জন্য পৃথক বায়োফিল্টার ট্যাংক নির্মাণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সম্প্রতি বায়োফিল্টারের মাধ্যমে পানি পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিধায় অধিকাংশ আধুনিক হ্যাচারিতে এ ট্যাংক নির্মাণ করা হয় না।

নার্সারি ট্যাংক

লার্ভা পিএল পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়ার পরে এদের প্রতিপালনের পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে যায় বিধায় তখন এদের পৃথক নার্সারি ট্যাংকে প্রতিপালন করার প্রয়োজন হয়। এ কাজে স্থায়ী অবকাঠামো ব্যবহার করা যায়। তবে এলআরটি হিসেবে ব্যবহৃত ট্যাংকও পরিষ্কার করে নিয়ে এ কাজে ব্যবহার করা যায়। নার্সারি ট্যাংকের ডিজাইন ও আয়তন এলআরটি-এর অনুরূপ হতে পারে।

ট্যাংকে এ্যাপক্সি রংকরণ

হ্যাচারিতে উৎপাদন কাজের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এমন ট্যাংক সিমেন্ট-কংক্রিটের তৈরি হলে এসব ট্যাংকের ভিতরের গায়ে মেরিন এ্যাপক্সি পেইন্টের প্রলেপ লাগানো প্রয়োজন। অন্যথায় সিমেন্টের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া পরবর্তীতে ট্যাংকের পানিতে এসে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এর ফলে যে কোনো সময় উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এসব ক্ষতিকর রোগজীবাণু যাতে ট্যাংকের পানির সংস্পর্শে এসে কোনো প্রকার সংক্রমণের সৃষ্টি করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ট্যাংকের ভিতরের অংশে এ্যাপক্সি-মেরিন পেইন্টের প্রলেপ দেয়া হয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন ট্যাংকের কোথাও এ রঙের প্রলেপ উঠে না যায়। এমন হলে সম্পূর্ণ ট্যাংকের এ্যাপক্সি প্রলেপ তুলে ফেলে নতুনভাবে পেইন্ট করতে হবে।

২০২২

ফিড রুম/সার্ভিস রুম

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে লার্ভা ও পিএল-এর খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজের জন্য একটি পৃথক কক্ষ থাকা আবশ্যক। এ কক্ষটি আলো-বাতাসযুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ল্যাবরেটরি।

গলদা চিংড়ির লার্ভার রূপান্তর এবং এলআরটি-তে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উপযোগিতা পরীক্ষা ও সংরক্ষণ, আর্টিমিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অনুরূপ অন্যান্য পরীক্ষামূলক কাজের জন্য অবশ্যই একটি ল্যাবরেটরি ইউনিট থাকা প্রয়াজন।

আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক

গলদা চিংড়ির লার্ভাকে প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহ করতে হয়। তাই চাহিদা অনুযায়ী আর্টিমিয়া নপ্লি হ্যাচিং-এর জন্য আর্টিমিয়া ট্যাংক ব্যবহার করতে হয়। এ জাতীয় ট্যাংক সিমেন্ট-কংক্রিটের হতে পারে। তবে ফাইবার গ্লাস বা প্লাস্টিকের স্থানান্তরযোগ্য ট্যাংক হলে তা পরিষ্কার করা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা সহজ হয় ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা সুবিধাজনক হয়।

প্যাকিং এবং বাজারজাতকরণের শেড

এখানে পিএল বিক্রির আগে তাকে খাপ খাওয়ানো এবং পরিবহনের উদ্দেশ্যে উপযুক্তভাবে প্যাকিং করার জন্য আলাদা একটি শেড থাকতে হবে। তাছাড়া এ শেডে বিক্রয়ের জন্য পিএল রাখার সুবিধা, প্যাকিং এর জন্য প্রয়োজনীয় পানি রাখার সুবিধা, পোনা ও অক্সিজেন দেয়ার সুবিধা, ক্রেতার বিশ্রাম এবং বসার সুবিধা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। এ এলাকায় ট্রাক বা অন্য কোনো যানবাহন সহজে যাতায়াত করতে পারে সেজন্য রাস্তা ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা নির্মাণ করতে হবে।

পানি নিষ্কাশন এবং বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা

হ্যাচারির সামগ্রিক হাইজিন রক্ষার উদ্দেশ্যে এর উপযোগী নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উৎপাদন ইউনিট থেকে বর্জ্যপানি সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা না হলে হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তা ব্যাহত হবে এবং এ ক্ষেত্রে উন্নত গুণগতমাণ সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। হ্যাচারির প্রত্যেকটি উৎপাদন ইউনিট থেকে বর্জ্যপানি নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ঢালসম্পন্ন নর্দমা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে একটি কেন্দ্রীয় নর্দমায় মিলিত হয় এবং এখান থেকে সম্পূর্ণ হ্যাচারির বর্জ্য পানি একটি পৃথক ট্যাংকে শশাধনের জন্য জমা হয়। জমাকৃত বর্জ্যপানি এ ট্যাংকে শাধেনের পূর্বে বাইরে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা যাবে না।

মেকানিক্যাল ইউনিট

হ্যাচারির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি এ ইউনিটে স্থাপনপূর্বক পরিচালনা করা হয়। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে। বোয়ার, জেনারেটর, সাবমার্সিবল হিটারের জন্য অটো থার্মো-কন্ট্রোল প্যানেল বোর্ড, ইউভি স্টেরিলাইজার, কার্টিজ ফিল্টার, বিদ্যুতের মিটার ও প্রধান সুইচ ইত্যাদি। হ্যাচারিতে শব্দদূষণ এবং ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানির কারণে দূষণের সম্ভাব্যতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে জেনারেটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হ্যাচারির বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর সাথে মানানসই অবস্থানে পরিকল্পিতভাবে এসব যন্ত্রপাতি স্থাপন করা না হলে হ্যাচারি পরিচালনার কাজ জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

২০২২

সাধারণ/প্রশাসনিক ইউনিট

একটি বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে উন্নত গুণগতমাণ সম্পন্ন পিএল উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আরও কিছু ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। এসব অবকাঠামো সরাসরি উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না হলেও হ্যাচারির সার্বিক বাণিজ্যিক উৎকর্ষ সাধনে এসব অবকাঠামোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এসব অবকাঠামোগুলো হচ্ছে (১) অফিস রুম, (২) স্টোর রুম, (৩) রেস্ট রুম বা গেস্ট হাউস, (৪) কর্মচারী, টেকনিশিয়ান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসিক সুবিধা এবং আবাসিক ইউনিটসমূহের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক নর্দমা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, (৫) গার্ড শেড, (৬) গ্যারেজ এবং গাড়ি পার্কিং এর স্থান, (৭) গেইট,

সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাতা ও প্রাঙ্গণ বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি।

এসব অবকাঠামোর ডিজাইন, আয়তন ও অন্যান্য সুবিধা সংযাজেনের বিষয়টি হ্যাচারির চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপরে ভিত্তি করে নির্মাণ করতে হবে।

বহিরাঙ্গন ব্রুডপালন ও নার্সারি পুকুর

যে সকল হ্যাচারির আঙিনায় পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে সে সকল হ্যাচারিতে এ ধরনের পুকুর নির্মাণ ও ব্যবহার হ্যাচারি , পরিচালনার জন্য সুবিধাজনক এবং এতে হ্যাচারি পরিচালনা বেশ লাভজনক। হ্যাচারি সংলগ্ন স্থানে ব্রুড পালনের পুকুর থাকলে যথাসময়ে নিজস্ব হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য ব্রুড চিংড়ি পাওয়া নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া অবিক্রীত পিএল হ্যাচারি সংলগ্ন নার্সারি পুকুরে প্রতিপালন করে জুভেনাইল পর্যায়ে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। নার্সারি পুকুরের আয়তন ১০-২০ শতক হতে পারে এবং পানির গড় গভীরতা ৬০-৭০ সেমি রাখা যেতে পারে।ব্রুড পালন পুকুরের আয়তনও হ্যাচারিতে ব্রুড চিংড়ির চাহিদা এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে। এ সকল পুকুরের পানির গড় গভীরতা ১-১.৫ মিটার পর্যন্ত রাখা যেতে পারে।

গলদা হ্যাচারি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

আধুনিক গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির স্পেসিফিকেশন, মডেল, কার্যক্ষমতা, আকার আকৃতি ও ব্যবহার পদ্ধতির উপর সম্যক ধারণা না থাকলে সুষ্ঠুভাবে হ্যাচারি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। গলদা হ্যাচারিতে বহুল ব্যবহৃত ও অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির পরিচিতি, স্পেসিফিকেশন ও ব্যবহারবিধি/কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো

ক. যন্ত্রপাতি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	এয়ার বায়োর	৫৭.৫/১০ অশ্বক্ষমতা (৩ -ফেজ /৪৪০ ভোল্ট)	সকল ট্যাংকে বায়ু সঞ্চালন চালু রাখা, এটি হ্যাচারির শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র
২	ডিজেল ইঞ্জিন	১০/১৫/২০ অশ্বক্ষমতা	আপদকালীন এয়ারবোয়ার চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়
৩	জেনারেটর	১৫/২০ কেভি এ/২২০-৪৪০ ভোল্ট, সিঙ্গেল ও থ্রি ফেজ	আপদকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ চলমান রাখা
৪	স্বাদু পানির পাম্প	১/২ অশ্ব ক্ষমতা, ১.৫ʺ/৩ʺ ব্যাস	ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও সরবরাহ
৫	সাবমার্সিবল পাম্প	১.৫/০.৫ʺ অশ্বক্ষমতা/১ ফেজ ২২০ ভোল্ট	এরেশন ও হ্যাচারির বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহ
৬	ব্যাটারি অপারেটর এরেটর	৯-১২ ভোল্ট	মাদার চিংড়ি পরিবহনকালে বায়ু সঞ্চালন এরেটর
৭	ইমারশন হিটার (থার্মোস্ট্যাটসহ)	১/২/৩ কিলোওয়াট ২২০/৪৪০ ভোল্ট	লার্ভা/ পি এল ট্যাংকে ২৮-৩১° সে. তাপমাত্রা স্থির রাখার জন্য
৮	থার্মামিটার	-	বায়ু ও পানির তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ
৯	রিফ্লাক্টোমিটার	এস-১০০/ জাপান অরিজিন	পানির লবণাক্ততা পরিমাপ
১০	প্রিং ব্যালান্স	১০-২০ কেজি পর্যন্ত	সূক্ষ্ম ওজন পরিমাপ
১১	ইলেকট্রোনিক ডিজিটাল ব্যালেন্স	০.০১ গ্রাম-২০০ গ্রাম পর্যন্ত	সূক্ষ্ম ওজন পরিমাপ
১২	ডায়াল ব্যালান্স	৫০০ গ্রাম ১০ কেজি পর্যন্ত	খাদ্য উপকরণ, আর্টিমিয়া সিস্ট, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি পরিমাপ
১৩	বেন্ডার	-	লার্ভার সম্পূরক খাদ্য (কাস্টার্ড) তৈরি
১৪	অটোমেটিক ইমারজেন্সি ল্যাম্প ও এলার্ট হন	-	বোয়ার হাউজের জন্য
১৫	আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক	এফআরপি (ঢাকনাসহ) ৪০০/৫০০ লিটার	আর্টিমিয়া ও স্ফুটন
১৬	ডিপ ফ্রিজ ও রেফ্রিজারেটর	১০ সিএফটি	খাদ্য সংরক্ষণ (কাস্টার্ড, আর্টিমিয়া ইত্যাদি)
১৭	এয়ারকুলার	১.৫ টন	তাপমাত্রা অনুকূলে রাখার জন্য
১৮	স্টিম কুকার	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাস্টার্ড তৈরি

২০২২

খ. আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	নাইলন রশি	বিভিন্ন সাইজ	প্যাকিং, ইমারজেন্সি সংযোগ মেরামত ইত্যাদি
২	রাবার ব্যান্ড	প্রতি প্যাকেট ১০০টি প্রতি ব্যাগ ১০০ প্যাকেট	পিএল প্যাকিং ইত্যাদি
৩	পলি ব্যাগ	৩০ সেমি x ২০ সেমি ২৪ সেমি x ৩৬ সেমি	পিএল পরিবহন
৪	ফিল্টার সামগ্রী (কাঠ কয়লা, নুড়ি পাথর, বালি ঝিনুকের খোসা ইত্যাদি)	পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত ও শুকনা	বালি ফিল্টারের উপাদান
৫	পানি সঞ্চালনের পাইপ	১″/১.৫″/১″ ফেজ সাধারণ ফ্ল্যাকিবল /রিং পাইপ	হ্যাচারির বিভিন্ন ট্যাংকে পানি সঞ্চালন
৬	পিভিসি সাইফন ফিল্টার এবং পাইপ	-	ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার
৭	ফিল্টার কাপড়	৫৬/ ১০০/১৫০ মেস	শোধন ও পরিশ্রুত পানি ছাঁকনের জন্য
৮	পিএল গণনার বাটি ও চামুচ	সাদা ম্যালামাইনের ও মাঝারী আকার	পিএল দেখা ও গণনার কাজে ব্যবহৃত হয়
৯	প্লাস্টিক বালতি , মগ,জগ,বাটি ইত্যাদি	ছোট, বড় ও মাঝারী আকার	লার্ভি, পিএল ইত্যাদি সংগ্রহ ও স্থানান্তর, পানিভরণ ও নিষ্কাশন ইত্যাদি
১০	অক্সিজেন সিলিন্ডার	-	মাদার ও পিএল পরিবহনের সময় এবং LRT তে অক্সিজেন সরবরাহ

গ. আবশ্যকীয় পাইপ ও ফিটিংস সামগ্রী

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	পিভিসি পাইপ	২.৫″ । ৩″/৪″ /৫″ ০.৭৫″/১″/১.৫″	পানি সরব্রাহ লাইন বায়ু সঞ্চালন
২	জিআই পাইপ	১.৫″/১″/০.৭৫″	ঐ
৩	পিভিসি ফিটিংস	এঞবব । এলবো/ রিডিউসার সকেট থ্রেড	পানি ও বায়ু সঞ্চালন লাইন সংযোগ
৪	পিভিসি গেইট ভাল্ব	০.৭৫″/১″/১.৫″/২.৫″ / ৫″	বায়ু ও পানি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ
৫	পলিভিনাইল অ্যাডহেসিভ	-	সংযোগ
৬	ড্রিল মেশিন, হেক্সো বেড	-	পাইপ, রড ইত্যাদি ছিদ্রকরণ ও কাটার জন্য

২০২২

ঘ. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	বাল্ব ও টিউব লাইট	টিউব -৪০ ওয়াট বাল্ব-৬০/১০০/২০০ ওয়াট	হ্যাচারি প্রাঙ্গণ আলোকিতকরণ, আর্টিমিয়া ফুটানো এবং লার্ভি বাছাই
২	সুইচ, পাগ, সকেট ইত্যাদি	-	বৈদ্যুতিক সংযোজন
৩	ফিউজ কাটআউট	-	সংক্রিয় বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন
৪	অ্যাডহেসিভ টেপ	-	লাইন সংযোজন
৫	অটোসার্কিট ব্রেকার	-	স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ঙ.বায়ু সঞ্চালন সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	এয়ার সুইচ	ছোট/বড় ক্যালিবার	বায়ু সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ
২	এয়ার স্টোন	ঐ	বুদবুদ
৩	এয়ার কানেক্টর	T Shape	সংযোগ সাধন
৪	লীড ওয়েট	-	এয়ার স্টোন-কে তলায় স্থির রাখে

চ. আবশ্যকীয় নেট ও ব্যাগ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	লার্ভা ক্যাচ নেট	১৫˝ ডায়া এবং ১৫০ মেস	আর্টিমিয়া নপ্লি ধরা
২	পিএল ক্যাচ নেট	১৫˝ ডায়া এবং ৫৬ মেস	LRT থেকে পিএল ধরা ও স্থানান্তর
৩	আর্টিমিয়া ক্যাচ নেট	১৫˝ ডায়া ১০০/১২০ মেস	আর্টিমিয়া নপির সংগ্রহ
৪	আটিমিয়া ক্যাচ ব্যাগ	১৮˝/৩৬˝ ১০০/ ১২০ মেস	আর্টিমিয়ার সিস্ট ধৌতকরণ
৫	মাদার ক্যাচ নেট	লম্বা হাতলযুক্ত ডিপ নেট	মাদার ধরা
৬	পলি প্রোপাইলিন ফিল্টার ব্যাগ	(৩০ সেমি X ৮৫ সেমি) ১/৫/১০	পরিশ্রুত পানি ছাঁকন

২০২২

ছ, ল্যাবরেটরি সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	স্পেসিফিকেশন/মডেল/আকার	কাজ
১	কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ	-	লার্ভার স্টেজ ও রোগ জীবাণু পর্যবেক্ষণ
২	গ্লাস স্লাইড ও কভার স্লিপ	-	ঐ
৩	গ্রিফেন বিকার	১০/৫০/১০০/২৫০/৫০০/ ১০০০ মিলি	আর্টিমিয়া নপি সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ, লার্ভা পর্যবেক্ষণ, রাসায়নিক পরীক্ষা ইত্যাদি
৪	গ্র্যাজুয়েটেড সিলিন্ডার	৫০/১০০/২৫০/৫০০/১০০০ মিলি	রাসায়নিক সামগ্রী মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়
৫	টেস্ট টিউব, কনিক্যাল ফ্ল্যাক্স, ফ্ল্যানেল, পিপেট, ড্রপার ইত্যাদি	-	ঐ
৬	ডিসপোজেবল গ্লোভস	-	রোগ সংক্রমণ রোধকল্পে হাতে পরিধান করা
৭	সেফটি গজ	-	দুর্ঘটনায় ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ
৮	ম্যাগনিফাইং গ্লাস	-	আর্টিমিয়া সিস্ট, নপ্লি ও লার্জি পর্যবেক্ষণ
৯	ফিল্ড টেস্ট কিট(ক্লোরিন, P", ক্ষারত্ব, হার্ডনেস, ঋব,অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি)		স্বাদু ও লবণ পানির প্যারামিটারের মাত্রা নির্ণয়
১০	১০ দ্রবীভূত অক্সিজেন কীট	-	উৎপাদন ট্যাংকের পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ণয়

জ. রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্র

জীবমাত্রই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মত চিংড়ির পিএলও বিভিন্ন Causative Agent-এর মাধ্যমে রোগাক্রান্ত হতে পারে। Causative Agent-গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও এককোষী প্রাণী উল্লেখযোগ্য। হ্যাচারিতে রোগ বলতে ডিমওয়ালা চিংড়ি, লার্ভা ও পিএল-এর রোগকেই বুঝায়। হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় ত্রুটি ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই হ্যাচারি পরি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে "রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম"। সে জন্য হ্যাচারির অভ্যন্তরে মূলত পানি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি এবং সরবরাহকৃত খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখা ও জীবাণুমুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক।

রোগ প্রতিরোধে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্রের নাম নিচে দেয়া হলো:

- বিচিং পাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিন)
- সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড (তরল)

- ফরমালিন (ল্যাব গ্রেড)
- সোডিয়াম থায়োসালফেট
- সোডিয়াম বাই-কার্বনেট
- অক্সিটেট্রাসাইক্লিন
- ট্রেফলন
- প্রিফুরান
- ভঃরপধ (Ethylene Di-amino Tetra acetic Acid)
- এ্যাকোয়াকালচার প্রোবায়োটিক
- জুমসাইড/প্রোটোজুয়াসাইড
- মিথিলিন ক
- ভিটামিন প্রিমিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন সি

ঝ. খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ।

লার্ভা ও পিএল-এর দ্রুত বৃদ্ধি, দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টির অভাবজনিত রোগ নিরাময়ের জন্য সময়মতো সঠিক পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত সম্পূরক খাদ্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. জীবিত খাদ্যঃ আর্টিমিয়া।

২. তৈরি খাদ্যঃ কাস্টার্ড ও ফরমুলেটেড (এনক্যাপসুলেটেড) ফিড

১. আর্টিমিয়াঃ আর্টিমিয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রাণীকণা - প্রোটিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ক্রাস্টিসয়া যা চিংড়ির। লার্ভার জন্য জীবন্ত প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. কাস্টার্ডঃ কাস্টার্ড হলো বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ে তৈরি এক প্রকার সম্পূরক খাবার যা জীবিত খাবার আর্টিমিয়ার পাশাপাশি লার্ভার জন্য সরবরাহ করা হয়।

১ কেজি কাস্টার্ড তৈরির ফর্মুলা নিচে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	উপকরণ	পরিমাণ
১	গুড়া দুধ	৩০০ গ্রাম
২	ডিম	৩৫০ গ্রাম
৩	কর্ণ ফ্লাওয়ার	১০০ গ্রাম
৪	মাছ/চিংড়ি/ শ্রিম্প মিট	২১০ গ্রাম
৫	কড লিভার অয়েল	১৭ মিলি
৬	ভিটামিন প্রিমিক্স	১২ গ্রাম
৭	আগার পাউডার	১০ গ্রাম
৮	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	১ গ্রাম

২০২২

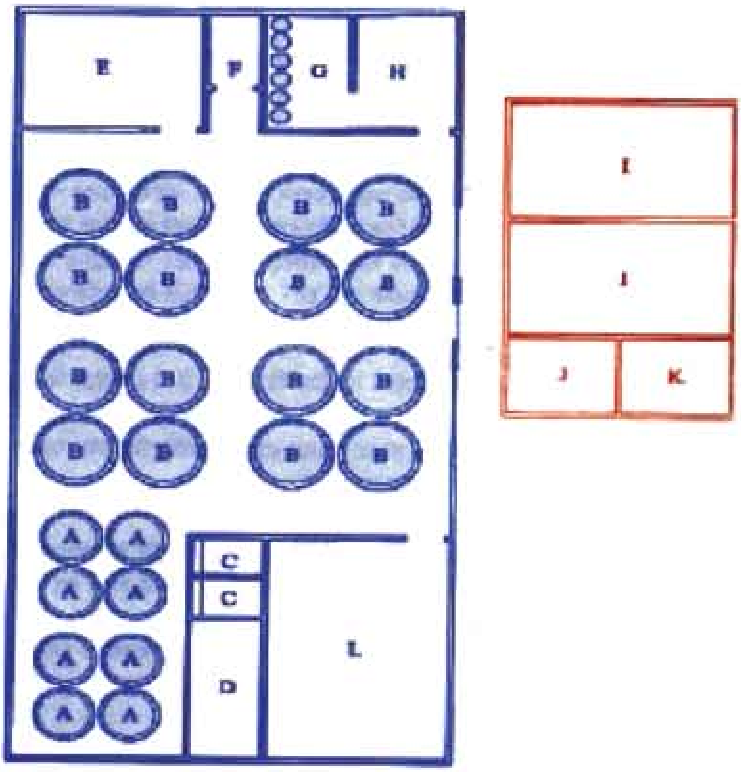

চিত্র: হ্যাচারির ফ্লো ডায়াগ্রাম

ফরমুলেটেড খাদ্য

বর্তমানে গলদা চিংড়ির লার্ভার জন্য উপযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতকৃত ফরমুলেটেড খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পিলেট খাদ্য, মাইক্রো-পার্টিকুলেট খাদ্য এবং মাইক্রো-এ্যানক্যাপসুলেটেড খাদ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কৌটার গায়ে নির্দেশাবলি অনুসরণ করা উচিত। এসব খাদ্যের মধ্যে মাইক্রো-এ্যানক্যাপসুলেটেড খাদ্য ট্যাংকে প্রয়োগের পর দীর্ঘসময় এর অভ্যন্তরস্থ পুষ্টি উপাদান ধরে রাখতে সক্ষম। তাছাড়া এসব খাদ্যের দ্বারা ট্যাংকের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। গলদা চিংড়ি লার্ভার জন্য প্রস্তুতকৃত ফরমুলেটেড খাদ্য নির্বাচনের সময় খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি লার্ভার বয়স এবং মুখবিবরের মাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সতর্কতার সাথে খাদ্যকণার আকার নির্ধারণ করতে হবে।

হোল্ডিং ট্যাংক ব্যবস্থাপনা

কমলা বর্ণের ডিমওয়ালা চিংড়িকে হোল্ডিং ট্যাংকে রাখা হয়। স্ত্রী গলদা চিংড়ির ডিমের রং প্রথমে কমলা থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ডিম ফুটার সময় হলে কালচে বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করলে পরিবহনের সময় অনেক ডিম নষ্ট হতে পারে। তাই ডিমওয়ালা চিংড়ি সংগ্রহ করার ৫-৭ দিন পর ডিম ফুটবে এমন স্ত্রী গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করা দরকার। উপযুক্ত ডিমওয়ালা স্ত্রী গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করার পর সতর্কতার সাথে ডিমওয়ালা চিংড়ির আকার, ওজন, সংখ্যা, সময় এবং দূরত্ব বিবেচনা করে পরিবহন করা হয়। পরিবহনকালে পানির তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সকাল ও বিকালে ডিমওয়ালা চিংড়ি পরিবহন করা উত্তম। প্লাস্টিকের হাফ ড্রামে ৫০ লিটার পানিতে দূরত্ব অনুযায়ী ২৫-৩০টি চিংড়ি পরিবহন করা যায়। পরিবহনের সময় পানি পরিবর্তন ও ব্যাটারি চালিত এরেটরের সাহায্যে বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়। এতে চিংড়ির উপর পরিবেশগত পীড়নের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

ডিমওয়ালা চিংড়ি পরিশোধন: প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত ডিমওয়ালা চিংড়ির শরীরে বিভিন্ন রোগজীবাণু থাকে। এসব ডিমওয়ালা চিংড়ি হ্যাচারিতে প্রবেশ করানোর পূর্বে পরিশোধন করা খুবই জরুরি। ২০-২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে ৪০-৪৫টি চিংড়ির ৩০ মিনিট বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে গাছেল করিয়ে পরিশোধন করতে হয়। এর ফলে চিংড়ির শরীরে বাহ্যিকভাবে থাকা রাগজীবাণু দূর করা সম্ভব হয়।

খাপ খাওয়ানো: হ্যাচারির পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য প্যারামিটারের সাথে ডিমওয়ালা চিংড়িকে খাপ খাওয়ানো হলে এদের মৃত্যুহার কমে যায়। অন্যথায় এসব ডিমওয়ালা চিংড়ি থেকে সুস্থ সবল লার্ভা পাওয়া সম্ভব হয় না। চিংড়ি খাপ খাওয়ানোর সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা উচিত

- হোল্ডিং ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে চিংড়ি মজুদ করা ঠিক নয়। কারণ অধিক ঘনত্বে খাদ্যগ্রহণ ও চলাচলে অসুবিধা হয়, জাতিভাজিতা বেড়ে যায় এবং পানির গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।
- মজুদের পর পরই হোল্ডিং ট্যাংকে আশ্রয়স্থল হিসেবে পিভিসি পাইপ ব্যবহার করতে হবে।
- দুর্বল, অসুস্থ ও কম ডিমওয়ালা বা ছোট আকৃতির চিংড়ি মজুদ করা যাবে না।

হোল্ডিং ট্যাংকে খাদ্য প্রয়োগ: হোল্ডিং ট্যাংকে মাদার চিংড়িকে নিয়মিত গুণগতমাণসম্পন্ন খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। যে সব খাদ্য প্রয়োগ করা যায় তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো

ক) চাউল বা গম
খ) ভাত
গ) ঝিনুকের মাংস
ঘ) শামুক
ঙ) গুড়া চিংড়ি
চ) পূর্ণ বয়স্ক আর্টিমিয়া

উল্লেখ্য যে, ঝিনুকের মাংস, শামুক ও গুড়া চিংড়ি ব্যবহারে পানি বেশি নষ্ট হয়। তাই এগুলো টুকরো টুকরো করে গরম পানিতে হালকা সিদ্ধ করে প্রয়োগ করা উচিত। ইদানিং বাজারে বিভিন্ন ব্রান্ডের ফরমুলেটেড পিলেট খাবার পাওয়া যায়। ডিমওয়ালা চিংড়িকে প্রতিদিন মোট দৈহিক ওজনের ৫% হারে খাবার দিতে হয়। হোল্ডিং ট্যাংক থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার প্রতিদিন ২বার সাইফনিং করে পরিষ্কার করতে হবে। ২০২২

হ্যাচিং ট্যাংক ব্যবস্থাপনা

ডিমের বর্ণ কালচে ধূসর বা ছাই বর্ণের হলে হ্যাচিং ট্যাংকে স্থানান্তর করা হয়। হ্যাচিং ট্যাংকের পানির গুণাগুণ নিম্নরূপ হতে হবে।

তাপমাত্রা	২৮-৩১° সেলসিয়াস
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
লৌহ	০.০ পিপিএম
ক্লোরিন	০.০ পিপিএম
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৪-৫ পিপিএম
নাইট্রাইট নাইট্রোজেন	০.১ পিপিএম এর কম
অ্যামোনিয়া	০.১ পিপিএম এর কম
হাইড্রোজেন সালফাইড	০.০ পিপিএম

হ্যাচিং ট্যাংকে প্রতি বর্গমিটারে ৩-৪টি ডিমওয়ালা চিংড়ি মজুদ রাখতে হবে। হ্যাচিং ট্যাংকে উপযুক্ত ডিমওয়ালা চিংড়ি স্থানান্তরের পর পরিশোধনকৃত ১২ পিপিটি লবণাক্ত পানির সাথে স্বাদু পানি মিশিয়ে হ্যাচিং ট্যাংকের পানির লবণাক্ততা ৪-৫ পিপিটি করতে হবে। হ্যাচিং ট্যাংকের পানিতে ১০ পিপিএম ইডিটিএ এবং ০.০৫ পিপিএম ট্রাফলান প্রয়োগ করা যেতে পারে। ডিমওয়ালা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে হ্যাচিং ট্যাংকে ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা সাইজের ছিদ্রযুক্ত পিভিসি পাইপ পরিমাণমত দেয়া যেতে পারে। পানির উচ্চতা ১.৫-২ ফুট রাখতে হবে। হ্যাচিং ট্যাংকে খাদ্য সরবরাহ করা ঠিক নয়। কারণ খাদ্যের মাধ্যমে লার্ভার শরীরে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

হ্যাচিং ট্যাংক থেকে লার্ভা সংগ্রহ ও পরিশোধন

গলদা চিংড়ির ডিম সর্বদা রাতের বেলায় ফুটে, কখনও দিনের বেলায় ফুটে না। সকাল বেলা ১২০ মিলি মাইক্রন কুপ নেটের সাহায্যে হ্যাচিং ট্যাংক থেকে লার্ভা সংগ্রহ করতে হয়। হ্যাচিং ট্যাংক থেকে লার্ভা সংগ্রহ করার জন্য ২০-৫০ মিলি আয়তনের কয়েকটি বীকার, ৪-৫ পিপিটি মাত্রার পরিশ্রুত ও জীবাণুমুক্ত পানি, বালতি, মগ, গামলা, ফরমালিন ইত্যাদি উপকরণ প্রয়োজন হয়। লার্ভা সংগ্রহ করার পূর্বে কালো পলিথিন দিয়ে হ্যাচিং ট্যাংক ঢেকে দিতে হবে। হ্যাচিং ট্যাংকের বায়ুসঞ্চালন বন্ধ করে এক পার্শ্বে একটি বাল্‌ব জ্বালিয়ে দিলে লার্ভাগুলো আলোর কাছে চলে আসবে। এরপর খুব ধীরে ধীরে কুপ নেটের সাহায্যে লার্ভা সংগ্রহ করে গামলার পানিতে ছাড়তে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বার বার এ প্রক্রিয়া চালিয়ে লার্ভা পৃথক করতে হবে। অতঃপর ২৫-৩০ লিটার পরিমাপের গামলায় হ্যাচিং ট্যাংক থেকে ৮-১০ লিটার পানি নিয়ে বায়ুসঞ্চালন দিয়ে সংগৃহীত লার্ভা রাখতে হবে। লার্ভা সংগ্রহের কাজ শেষ হলে প্রথমে গামলায় সংগৃহীত লার্ভি থেকে সাইনিং করে ময়লা দূর করতে হবে। তারপর গামলার ভিতরে ১২ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি ১ থেকে ২ মগ ছিটিয়ে দিতে হবে অথবা সরু পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধা ঘণ্টা পর পর ১২ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি গামলায় সরবরাহ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ৫-৭ ঘণ্টার মধ্যে গামলা পানির লবণাক্ততা ১২ পিপিটি আনতে হবে। ১২ পিপিটি লবণাক্ততায় আসার পর উক্ত লার্ভার গামলায় ২০০-২৫০ পিপিএম ফরমালিন (প্রতি ২৫ লিটার পানিতে ৫ মিলি) প্রয়োগ করে আধাঘণ্টা বায়ু সঞ্চালনপূর্বক পরিশোধন করতে হবে। আধাঘণ্টা পর

৫০% পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় ২ মগ ১২ পিপিটি পানি গামলায় আস্তে আস্তে ঢালতে হবে। প্রতি ২৫-৩০ লিটারের গামলায় ১,০০,০০০-১,৫০,০০০টি লার্ভা রাখা যায়। এভাবে সংগৃহীত লার্ভা এলআরটি-তে নির্ধারিত ঘনত্বে মজুদ করতে হয়। প্রতিপালন ট্যাংকে ১ টন পানিতে সাধারণত ১ লক্ষ লার্ভা মজুদ করা যায়। সেজন্য লার্ভা গণনা করা প্রয়োজন। প্রথমে লার্ভাসহ গামলার মোট পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। একটি ছোট বীকারে গামলা থেকে লার্ভাসহ অল্প পানি নিয়ে তার পরিমাণ জেনে লার্ভার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গামলায় লার্ভার আনুমানিক সংখ্যা জানা যেতে পারে। লার্ভার সংখ্যা = (ছোট বীকারে লার্ভার সংখ্যা = ছোট বীকারের পানির আয়তন) × গামলার পানির মোট আয়তন। এলআরটি-তে লার্ভা মজুদের সময় এদেরকে এলআরটি-এর পানির সাথে ভালোভাবে খাপখাইয়ে মজুদ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রথমে পরিশোধিত লার্ভার গামলাটি ফরমালিন মিশ্রিত পানি দিয়ে তলাসহ চতুর্দিক পরিষ্কার করতে হবে। অতঃপর লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের সাথে লার্ভা ভর্তি গামলার পানির তাপমাত্রা ঠিক করার জন্য এলআরটি-এর পানি দুই মগ করে লার্ভার গামলায় ১০ মিনিট পর পর ছিটিয়ে অথবা পাইপের সাহায্যে ধীরে ধীরে সরবরাহ করতে হবে এবং গামলাটি লার্ভা এলআরটি-এর পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে আস্তে আস্তে প্রতিপালন ট্যাংকের পানিতে লার্ভা ছাড়তে হবে। রাত ৮.০০ টা থেকে ৯.০০ টার মধ্যে এলআরটি-তে লার্ভা ছাড়ার কাজ সম্পন্ন করা ভাল।

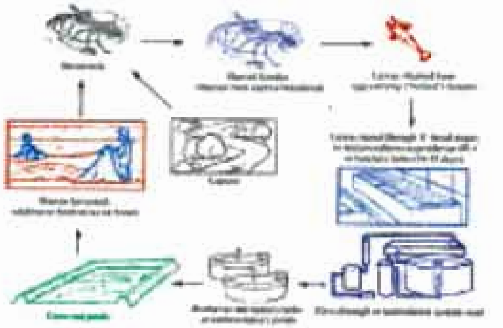

চিত্রঃ হ্যাচিং ট্যাংক থেকে লার্ভা সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া

লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে ব্যবস্থাপনা

হ্যাচিং ট্যাংক থেকে সদ্যফুটা লার্ভা সংগ্রহ, শোধন ও গণনাপূর্বক নির্ধারিত মজুদ ঘনত্বে লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক বা এলআরটি-তে মজুদ করা হয়। এ ট্যাংকেই লার্ভার ১১টি পর্যায় অতিক্রম করে এরা পোস্টলার্ভা পিএল-এ রূপান্তরিত হয়। এর জন্য পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও অন্যান্য বিষয়াদির উপরে নির্ভর করে প্রায় ৩০-৪০ দিন সময়ের মধ্যে লার্ভা পিএল-এ রূপান্তরিত হয়। এই সময়টি লার্ভার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল। উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অংশ এখানে অনুশীলন করা হয়।

চিত্রঃ সদ্যফোটা লার্ভা সংগ্রহ ট্যাংক

গলদা চিংড়ির লার্ভা প্রতিপালনে এলআরটি ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়

১. এলআরটি-তে নির্দিষ্ট সংখ্যক লার্ভা সঠিক পদ্ধতিতে শোধনপূর্বক এলআরটি-এর পানির সাথে ভালোভাবে খাপ খাওয়ানোর পর মজুদ করা।

২. লার্ভার জন্য জীবিত প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহ করা এবং এজন্য নিয়মিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ আর্টিমিয়া সিস্ট হ্যাচিং-এর ব্যবস্থা করা।

৩. নির্ধারিত সময় থেকে লার্ভার জন্য পরিমিত পরিমাণে কাস্টার্ড খাদ্য সরবরাহ করা এবং এজন্য নিয়মিত, প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাস্টার্ড খাদ্য তৈরি করা।

৪. কাস্টার্ড খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি এ খাদ্যের মোট চাহিদা ও কাস্টার্ড সরবরাহের পরিমাণের সাথে সমন্বয় সাধন করে লার্ভার জন্য নিয়মিত ফরমুলেটেড খাদ্য পরিবেশন করা।

৫. এলআরটি থেকে লার্ভার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্য দৈনিক ১ অথবা ২ বেলা সাইফনের সাহায্যে নিয়মিত অপসারণ করা।

৬. এলআরটি-এর দেয়াল ও মেঝেতে জমে থাকা ময়লা নিয়মিত ব্রাশ করে পরিষ্কার করা এবং সাইফনের সাহায্যে অপসারণ করা।

৭. পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে পরিচালিত হ্যাচারিতে পানি পুনঃসঞ্চালনের উদ্দেশ্যে বায়োফিল্টার স্থাপন, বায়োফিল্টার সক্রিয়করণ, এলআরটি-এর সাথে বায়োফিল্টারের সংযোগ স্থাপন এবং বায়াফিল্টার পরিচালনা করা।

৮. বায়োফিল্টার পরিচালিত হতে থাকলে নিয়মিত এলআরটি-এর পানিতে আয়নিত ও অনায়নিত অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট ও নাইট্রেটের পরিমাণ নির্ধারণ এবং এলআরটি-এর পানিতে এসবের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. খোলা-পানি পদ্ধতিতে পরিচালিত হ্যাচারিতে প্রতিদিন সমগুণাবলি সম্পন্ন পানি দ্বারা এলআরটি-এর ২৫ । ৩০% পানি পরিবর্তন করা।

১০. এলআরটিতে পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, পি.এইচ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি, পানিতে ফেনা সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা।

১১. পানিতে বায়ুসঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা।

১২. লার্ভার রূপান্তর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

১৩. নিয়মিত লার্ভার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা, এর চলাফেরা, নড়াচড়া, খাদ্যগ্রহণের প্রবণতা ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা।

১৪. লার্ভার নিয়মিত আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে এর শরীরে ক্ষতিকর রোগজীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করা।

১৫. এলআরটি-এর পানিতে ক্ষতিকর রোগজীবাণুর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।

১৬. লার্ভার রোগজীবাণু প্রতিরোধে নিয়মিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে উপযুক্ত রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্র নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করা।

১৭. লার্ভার রোগ শনাক্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮. লার্ভার রোগ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংকে উচ্চ ক্লোরিন প্রয়োগপূর্বক সম্পূর্ণ ট্যাংকের রোগাক্রান্ত লার্ভা ধ্বংস করে সতর্কতার সাথে নিষ্কাশন করা এবং ট্যাংকটি জীবাণুমুক্ত করে ধুয়ে রাখা।

১৯. এলআরটি-তে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হলে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

২০. এলআরটি ইউনিটের মেঝে, নর্দমা, পাইপলাইন ও অন্যান্য অবকাঠামো নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করে পরিষ্কার করা।

২০২২

২১. এলআরটি থেকে পোনা পর্যবেক্ষণের জন্য স্থাপিত বিকার ও পাত্রের পানি নিয়মিত পরিবর্তন করা ।

২২. এলআরটি ইউনিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করা ।

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে এলআরটি ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে কাজের ধরন অনুযায়ী উপরালেখিত বিষয়গুলোকে কয়েকটি প্রধান শিরানোমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । যেমন -

১. এলআরটি-তে লার্ভার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

২. এলআরটি-এর পানি ব্যবস্থাপনা

৩. এলআরটি পরিষ্কারকরণ

৪. লার্ভার স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণ

৫. লার্ভা প্রতিপালন ইউনিটের স্যানিটেশান এবং হাইজিন রক্ষা

(১) এলআরটি-তে গলদা চিংড়ি লার্ভার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

এলআরটি-তে লার্ভার নিরবচ্ছিন্ন পুষ্টি অর্জন এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে । হ্যাচারিতে লার্ভার জন্য এলআরটি-তে নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের খাদ্য প্রয়োগ করা হয়

১. জীবিত প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া নপ্লি

২. প্রস্তুতকৃত খাদ্য

১. গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে জীবিত প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়ার ব্যবহার

আর্টিমিয়া বা ব্রাইন শ্রিম্প চিংড়ির মত ক্লাসটাসিয়া শ্রেণীভুক্ত এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির জলজ সন্ধিপদ প্রাণী । লবণাক্ত পানির হ্রদ বা অনুরূপ প্রাকৃতিক জলাশয়ে এরা বসবাস করে । গলদা চিংড়ির লার্ভা এবং পিএল পর্যায়ে বিকল্পহীন প্রাকৃতিক জীবিত খাদ্য হিসেবে আর্টিমিয়া নপির গুরুত্ব অপরিসীম । গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে আর্টিমিয়া নপ্লি ব্যবহারের উপযাগিতাসমূহ নিম্নরূপ

- সাধারণ সমুদ্রের পানি অথবা কৃত্রিম লবণাক্ত পানিতে সহজ পদ্ধতিতে আর্টিমিয়া নলি ফুটানো এবং এলআরটি-তে সরবরাহ করা যায় ।
- আর্টিমিয়া সিস্ট সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা সুবিধাজনক ।
- সদ্য ফুটা আর্টিমিয়া নপ্লি তাৎক্ষণিকভাবে লার্ভার খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা যায়, আবার হিমায়িত বা সিদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায় ।
- আর্টিমিয়া নপ্লি লবণাক্ততার ব্যাপক পরিবর্তন সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে ।
- আর্টিমিয়া নপ্লি ট্যাংকের পানির গুণাগুণ নষ্ট করেনা, বরং পানির গুণাগুণ উন্নয়নে সহায়তা করে ।
- উন্নতমানের ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও অন্যান্য দুষপ্রাপ্য পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতির কারণে বিকল্পহীন খাদ্য হিসাবে আর্টিমিয়া নপির উপযোগিতা রয়েছে ।
- নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে অর্টিমিয়া নপির পুষ্টিমান কমে গেলে এদেরকে পুনরায় পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ (Enrichment) করা যায় ।
- ডিমওয়ালা চিংড়ি বা পোনার জন্য বিশেষ বা নির্ধারিত কোনো পুষ্টি উপাদান বাহক (Carrier) হিসেবে আর্টিমিয়া নপির মাধ্যমে সরবরাহ করা যায় ।

১৫-১০০ পিপিটি লবণাক্ততায় আর্টিমিয়ার ডিম স্বল্প সময়ের মধ্যে ফুটে যায়। কিনতু ১৫০ পিপিটি লবণাক্ততায় ডিমটি একটি শক্ত কৃত্তিকাবরণী বা ঈড়ৎরড়হ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বাদামি বর্ণের সিস্টে পরিণত হয়। অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণের মান অপরিবর্তিত রেখে শুষ্ক সিস্টকে বায়ুশূন্য অবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে উপযুক্ত পরিবেশে অভ্যন্তরস্থ ডিম ফুটে পিয়াসে রূপান্তরিত হতে পারে। ৫০-৭০ পিপিটি লবণাক্ত পানির সংস্পর্শে এলে অল্প সময়ে সিস্টের উপরের খোলস ফেটে সন্তরণশীল পিয়াস লার্ভা বা নপ্লি বের হয়ে আসে। এদের কুসুম থলিতে উচ্চমানের লিপিড ও বিভিন্ন ধরনের ফ্যাট সামগ্রীর উপস্থিতির কারণে পির বর্ণ উজ্জ্বল কমলা বা সানোলি হয়ে থাকে। সিস্ট এবং আর্টিমিয়া পির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

নং	বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্যের মাত্রা
১.	সিস্টের গড় ব্যাস	২০০-৩০০ মাইক্রন
২.	সিস্টের গড় ওজন	৩.৫ মাইক্রোগ্রাম
৩.	প্রতি গ্রাম ওজনে সিস্টের গড় সংখ্যা	১,৯০,০০০-৩,৫০,০০০ টি
৪.	সদ্য ফুটা নপ্লির গড় দৈর্ঘ্য	৪০০-৬০০ মাইক্রন (০.৪ মিমি)
৫.	সদ্য ফুটা নপ্লির গড় ওজন	০.০০২ মিলিগ্রাম
৬.	১ গ্রাম ওজনে সদ্য ফুটা পির গড় সংখ্যা	১,৪০,০০০-৩,২০,০০০ টি
৭.	পূর্ণ বয়স্ক আর্টিমিয়ার গড় দৈর্ঘ্য	৬৫০-১,০০০ মাইক্রন (১০-১৫ মিমি)

আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে নপ্লি উৎপাদন

আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে হ্যাচারিতে দুভাবে নপ্লি উৎপাদন করা যায়। যেমন-

ক. সিস্টের খোসা না ছড়িয়ে সরাসরি নপ্লি উৎপাদন

খ. সিস্টের খোসা ছড়িয়ে নপ্লি উৎপাদন

ক. সিস্টের খোসা না ছড়িয়ে সরাসরি নপ্লি উৎপাদন করার পদ্ধতি

● আর্টিমিয়া সিস্টের সাথে বিভিন্ন ক্ষতিকর রোগজীবাণু থাকে। উত্তমরূপে ধৌত করা না হলে এসব রোগজীবাণু দ্বারা হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাচারিতে সাধারণত ১০ পিপিএম ক্লোরিনের দ্রবণে সম্পৃক্ত করে আর্টিমিয়া সিস্টকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এর পাশাপাশি ক্লোরিনের প্রভাবে সিস্টের উপরের কৃত্তিকাবরণী বা ঈড়ৎরড়হ অনেকটা নরম হয়ে হ্যাচিং সহজতর হয় এবং হ্যাচিং এর হার বৃদ্ধি পায়।

● আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে নপ্লি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আর্টিমিয়া সিস্ট ওজন করে নেয়া হয়। বিচিং পাউডার অথবা অন্য যে কোনো ক্লোরিন সামগ্রী ব্যবহারে ১০ পিপিএম ক্লোরিন দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এ দ্রবণে আর্টিমিয়া সিস্ট রেখে মাঝারি গতিতে ১-১.৫ ঘন্টা বায়ু সঞ্চালন করে প্রতিটি সিস্টকে ক্লোরিন দ্রবণে উত্তমরূপে সম্পৃক্ত করত জীবাণুমুক্ত করা হয়। ১০০ মেস স্কুপ-নেটে উক্ত আর্টিমিয়া সিস্ট সংগ্রহ করা হয় এবং চলমান স্বাদু পানির নিচে ৪/৫ মিনিট রেখে ধৌত করত ক্লোরিন মুক্ত করা হয়।

● ইতোমধ্যে আর্টিমিয়া হ্যাচিং এর জন্য নির্ধারিত ট্যাংক ভালোভাবে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করে পূর্ব থেকে প্রস্তুত রাখা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য সরঞ্জাম (এয়ার স্টোন, লীড ওয়েট, এয়ার হাসে, থার্মোমিটার, হীটার, থার্মেস্ট্যাট-সেন্সর, বালতি, গামলা, মগ, কুপ নেট ইত্যাদি) জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করা হয়।

● অতঃপর হ্যাচিং ট্যাংকে পরিমাণমত পরিশ্রুত ও জীবাণুমুক্ত সমুদ্রের পানি (২০-২৫ পিপিটি) সরবরাহ করা হয়।

● হ্যাচিং ট্যাংকে মাঝারি গতিতে সার্বক্ষণিক বায়ু সঞ্চালন করা হয়। এর ফলে আর্টিমিয়া সিস্ট তূপিকৃত না হয়ে সর্বদা ট্যাংকের পানিতে ঝুলন্ত অবস্থায় উঠানামা করতে থাকে। এ জন্য হ্যাচিং ট্যাংকের তলদেশ সমতল না হয়ে ফানেল সদৃশ হলে ভালো হয়।

● হ্যাচিং ট্যাংকের পানির তাপমাত্রা সর্বদা ৩০-৩১° সে. মাত্রায় স্থির রাখতে হবে। অন্যথায় হ্যাচিং এল ফলাফল ভালো না হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

● আর্টিমিয়া সিস্ট হ্যাচিং-এর প্রাথমিক পর্যায়ে আলোর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই হ্যাচিং ট্যাংকে ১,৭০০ ২,০০০ লাক্স আলো পড়া নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য হ্যাচিং ট্যাংকের উপরে দু'টি ৮০ ওয়াট ফ্লোরোগেন্ট টিউব লাইটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

● অতঃপর হ্যাচিং ট্যাংকের পানি জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করা আর্টিমিয়া সিস্ট হ্যাচিং-এর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

● হ্যাচিং ট্যাংকে আর্টিমিয়া সিস্টের ঘনত্ব ১.৫-২ গ্রাম/লিটার এর মধ্যে রাখতে হবে। অন্যথায় হ্যাচিং এর হার কমে যেতে পারে বা এছাড়া জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে।

● পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, আলো, বায়ু প্রবাহ এবং অন্যান্য গুণাগুণের উপরে নির্ভর করে পানিতে ভিজানোর (Hydration) ৮ ঘন্টার মধ্যে আর্টিমিয়া সিস্ট এর হ্যাচিং শুরু হতে পারে। আদর্শ পরিবেশে ১৬-২৪ ঘন্টার মধ্যে ৭০%-৮০% সিস্ট ফুটে যায়। তবে আরও ভালো ফলাফল প্রাপ্তির জন্য ১৮ ঘণ্টা পরে প্রথমবার নপ্লি সংগ্রহ করে পুনরায় হ্যাচিং চালানো এবং ২৪ ঘন্টা পরে ২য় বার নপ্লি সংগ্রহ করা ভাল।

● আর্টিমিয়া নপ্লি আহরণের কাজ শুরু করার অন্তত ৩০ মিনিট পূর্বে হ্যাচিং ট্যাংকের বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করে দিয়ে পানিকে স্থির হতে দেয়া হয় এবং ট্যাংকটি কালো পলিথিন দ্বারা ঢেকে দিয়ে শুধুমাত্র নিচের দিকে একটি উজ্জ্বল আলো রাখা হয়। এর ফলে নপ্লি ট্যাংকের নিম্নাংশে জমা হয় এবং সিস্ট ও সিস্টের খোসা পানির উপরে ভেসে উঠে। এ অবস্থায় ট্যাংকের নিম্নাংশের গেইট-বাল্‌ব খুলে অথবা সাইফন পাইপের সাহায্যে ১০০ মেস ফুপ-নেটে নপ্লি আহরণ করা হয় এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত হালকা পদার্থ ট্যাংকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আহরিত নপ্লি পরিষ্কার লবণাক্ত পানিতে ধৌত করে মৃদু বাকু সঞ্চালনসহ পৃথক পরিষ্কার পাত্রে রাখা হয়।

● নরি সাথে অবাঞ্ছিত সিস্ট বা খাসোর পরিমাণ বেশি মনে হলে সংগ্রহের ট্যাংকে বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করে পুনরায় তে নপ্লি আহরণ করা হয়। এভাবে পর পর দুবার আহরণ করা হলে পরিত্যক্ত সিস বা খাসোর পরিমাণ একেবারে কমে যায়। এখান থেকে আর্টিমিয়া নপ্লি ধৌত করে প্রতিপালন ট্যাংকে সরবরাহ করা হয়।

● আর্টিমিয়া নপ্লি সংগ্রহের ট্যাংকের প্রতি ৩০ লিটার আয়তনের জন্য ১২৫ মিলি হারে তরল হাইড্রোজেন-পার অক্সাইড (৫০%) যোগ করে মৃদু বায়ু সঞ্চালন করা হলে ট্যাংকে প্রচুর বুদবুদ সৃষ্টি হয়ে ফেনার উদ্ভব ঘটে এবং নপির সাথে অবস্থিত সিস্ট ও খোসা উক্ত ফেনার সাথে উঠে আসে। তখন বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করে কুপ নেটের সাহায্যে উপর থেকে ফেনা দূর করা হলে আটিমিয়া নপ্লি সম্পূর্ণরূপে সিস্ট-মুক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে সিস্ট দূর করার পরে পুনরায় পরিশ্রুত স্বাদু পানির সাহায্যে উত্তমরূপে ধৌত করে আর্টিমিয়া নপ্লি পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়।

● ভিবরিও জাতের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া স্বাদু পানি সহ্য করতে পারেনা। তাই স্বাদু পানি দ্বারা ধৌত করা হলে আর্টিমিয়া নপ্লি অনেকাংশে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।

২০২২

খ. আর্টিমিয়া সিস্টের খোসা ছড়ানোর পদ্ধতি

আর্টিমিয়া সিস্টের খোসা ছাড়িয়ে ফুটানোর ব্যবস্থা করা হলে হ্যাচিং এর হার বৃদ্ধি পায় এবং খোসা ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত সামগ্রী পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়। তাছাড়া খোসা না থাকার কারণে হ্যাচিং ট্যাংক থেকে নপ্লি সংগ্রহের কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতিতে আর্টিমিয়া সিস্টের খোসা যেতে পারে—

আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে খোসা ছড়িয়ে নপ্লি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কৌটা খুলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আর্টিমিয়া সিস্ট ওজন করে একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাত্রে ৩-৪ লিটার পরিষ্কার স্বাদু পানিতে ভিজানো (Hydration) হয়। ১ ঘণ্টা পরে ভিজানো আর্টিমিয়া সিস্ট ৬০-৮০ মাইক্রন স্কুপ-নেটে নিয়ে পরিশ্রুত চলমান স্বাদু পানিতে উত্তমরূপে ধৌত করা হয়। সিস্টের খোসা ছড়ানারে পরবর্তী কাজ দুটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যায়।

১ম পদ্ধতি: প্রতি ১ কেজি সিস্টের সাথে পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাত্রে পর্যায়ক্রমে ৪০ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), ৪ লিটার সোডিয়াম হাইপাক্লোরাইট দ্রবণ (৪° সে. তাপমাত্রা) এবং ৪ লিটার পরিশ্রুত ও জীবাণুমুক্ত সমুদ্রের পানি (৪° সে. তাপমাত্রা যোগ করে দ্রবণটিকে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে থাকলে ৫-১০ মিনিটের মধ্যে সিস্টের খোসা (Corion) দ্রবীভূত হওয়া শুরু হয় এবং সম্পূর্ণ দ্রবণটি উজ্জ্বল কমলা বর্ণ ধারণ করে। এ বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়ে দ্রবণের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। দ্রবণের সাথে বরফ যোগ করে এর তাপমাত্রা ১৮ ২৫° সে.-এর মধ্যে রাখা হলে অধিকতর ভালো ফল পাওয়া যায়।

২য় পদ্ধতি: একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের পাত্রে ১ কেজি ভিজানো আর্টিমিয়া সিস্টের সাথে ৭ লিটার লবণাক্ত পানি যোগ করা হয় এবং বরফ প্রয়োগ করে এর তাপমাত্রা ২০° সে.-এ এনে স্থির রাখা হয়। উক্ত দ্রবণের সাথে ১২৫ গ্রাম পাথুরে চুন (Cao) যোগ করে ভালোভাবে মিশ্রিত হওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া করা হয়। অতঃপর এর সাথে ২৭৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম হাইপাক্লোরাইট দ্রবণ যোগ করে অবিরাম নাড়াচাড়া করা হয়। এ সময়ে দ্রবণের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পরিমাণমত বরফ যাগ করে এর তাপমাত্রা ৪০° সে. মাত্রায় স্থির রাখা হয়। ৫/৭ মিনিট নাড়াচাড়া করার পর দ্রবণের তাপমাত্রা ৩০° সে, মাত্রায় নামানোর জন্য কিছু অতিরিক্ত বরফ যোগ করা হয়। অতঃপর এর সাথে পুনরায় উপরালেখিত মাত্রায় পাথুরে চুন এবং ক্যালসিয়াম হাইপাক্লোরাইট দ্রবণ যোগ করে অনবরত নাড়াচাড়া করা হয়। ১০ মিনিটের মধ্যে সিস্টের খোলস দ্রবীভূত হওয়া শুরু হয় এবং দ্রবণটি গাঢ় কমলা বর্ণ ধারণ করে। সম্পূর্ণ কাজটি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়।

যে পদ্ধতিতেই হাকে না কেন, খোসামুক্ত হওয়ার পর ৬০-৮০ মাইক্রন কুপ-নেটে ডিমগুলো নিয়ে প্রথমে চলমান স্বাদু পানিতে ধৌত করা হয়। পরে ১০০ পিপিএম সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে ২/৩ মিনিট ধুয়ে খোসা ছড়ানারে বিক্রিয়া বন্ধ করা হয় এবং ক্লোরিনের অবশিষ্টাংশ দূর করা হয়। অতঃপর ডিমগুলো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার স্বাদু বা লবণাক্ত পানিতে রাখা হলে খোসামুক্ত ডিম পাত্রের তলায় গিয়ে জমা হয় এবং খাসোযুক্ত সিস্ট পানির উপরে ভাসতে থাকে। পাত্রের তলা থেকে খাসামুক্ত ডিম সাইফনের সাহায্যে সংগ্রহ করে হ্যাচিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে হ্যাচিং-এর প্রয়োজন না হলে খোসামুক্ত ডিম সংরক্ষণ করা যায়। রেফ্রিজারেটারে ৩-৪° সে, তাপমাত্রায় খোসামুক্ত ডিম ৩/৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়। কিনতু উল্লিখিত তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেট-ারে খোসামুক্ত ডিম লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করা যায়। ১ লিটার পানিতে ৩০০ গ্রাম সাধারণ লবণ (NaCl) মিশ্রিত করে লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা হয়। উক্ত দ্রবণে খোসামুক্ত ডিম মৃদু বায়ু সঞ্চালন সহ ৩/৪ ঘণ্টা রেখে দেয়া হয়। এ অবস্থায় অভিস্রবণ (Osmosis) পদ্ধতিতে ডিমের অভ্যন্তরস্থ পানি বের

হয়ে আসে। ১৫০ মাইক্রন চালুনীর সাহায্যে ডিম সংগ্রহ করে রেফ্রিজারেটারে ৬-৭ সপ্তাহ পর্যন্ত উক্ত ডিম সংরক্ষণ করা সম্ভব। প্রত্যক্ষ সূর্যালোকের নিচে খাসামুক্ত ডিমের কার্যকারিতা দ্রুত লাপে পায়। হাইপোক্লোরা-ইট দ্রবণের বিক্রিয়ার ফলে খোসা ছাড়ানো ডিম স্বাভাবিকভাবেই জীবাণুমুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া এর সাথে কোনো প্রকার ময়লা থাকে না বিধায় সহজে এবং কম সময়ে হ্যাচিং করানো যায়। খোসা ছাড়ানো আর্টিমিয়া ডিম এলআরটি-তে সরাসরি সরবরাহ করা যায়।

এলআরটি-তে আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহের মাত্রা

পরিপূর্ণ পুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এলআরটি-তে প্রতিটি লার্ভার জন্য দৈনিক ৪০-৫০ টি হারে আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহ করা প্রয়োজন। লার্ভা মজুদ করার পরবর্তী দিবস থেকে এলআরটি-তে আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়। ধৌত ও জীবাণুমুক্ত সদ্য ফুটা আর্টিমিয়া নপ্লি গণনা করে এলআরটি-এর পোনার সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরবরাহ করা উচিত। সাধারণত এলআরটি-এর প্রতি টন আয়তনের জন্য দৈনিক ১০ গ্রাম হারে আর্টিমিয়া সিস্ট (৯০% হ্যাচিংযোগ্য) সরবরাহ করা হলে উপরাক্তে সংখ্যা বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাই এলআরটি-তে প্রতিদিন একবারে প্রতি টনে ১০ গ্রাম অথবা ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে দৈনিক ২ বারের প্রতিবারে প্রতি টনে ৫ গ্রাম হারে আর্টিমিয়া সিস্ট সরবরাহ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আর্টিমিয়ার সিস্ট ফুটে সন্তরণশীল নপ্লি বের হয়ে আসার পরবর্তী পর্যায়কে ইনস্টার-১ বলা হয়। ১২ ঘণ্টা পরে এরা প্রথম খোলস পরিবর্তন করে ইনস্টার-২ পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়। এ পর্যায়ে আর্টিমিয়া নপ্লির দেহস্থিত পুষ্টি উপাদান কমে যায় এবং এরা বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। ইনস্টার-২ ভক্ষণে চিংড়ি পোনার পুষ্টি অর্জন হয় না। তাই এলআরটি-তে আর্টিমিয়া নপ্লি ইনস্টার-১ পর্যায়ের মধ্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা উচিত। অন্যথায় এদের পুষ্টিমাণ সমৃদ্ধকরণের (Enrichment) প্রয়োজন পর ইনস্টার-২ অথবা এর পরবর্তী পর্যায়ে যখন এরা বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করে তখন বিশেষ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ করে অর্টিমিয়া নপিকে সমৃদ্ধকরণপূর্বক পুনরায় এলআর-টি-তে সরবরাহ করা যায়।

হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তার অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে আর্টিমিয়ার ভূমিকা রয়েছে। মুহূর্তের অসাবধানতায় আর্টিমিয়া নলির মাধ্যমে হ্যাচারিতে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ফাংগাসের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই হ্যাচারিতে আর্টিমিয়া সিস্টের হ্যাচিং ও অন্যান্য ব্যবহারবিধিতে চরম সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি প্রতি ব্যাচের আর্টিমিয়া সিস্ট ব্যবহার শুরু করার পূর্বে নমুনা গ্রহণ করে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এর সাথে বিভিন্ন রোগজীবাণুর অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

২. প্রস্তুতকৃত খাদ্য

হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ি লার্ভা প্রতিপালনে এলআরটি-তে লার্ভার জন্য জীবিত প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে আর্টি-ময়া নপ্লি সরবরাহ করা হলেও এর মাধ্যমে লার্ভার সম্পূর্ণ পুষ্টি অর্জন হয় না। তাই আর্টিমিয়া নলির পাশাপাশি লার্ভার জন্য নিয়মিত প্রস্তুতকৃত খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হ্যাচারিতে সাধারণত দুই ধরনের প্রস্তুতকৃত খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যেমন

ক. কাস্টার্ড খাদ্য ও

খ. ফরমুলেটেড খাদ্য

ক. কাস্টার্ড খাদ্য

কাস্টার্ড প্রোটিন সমৃদ্ধ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি এক প্রকার কৃত্রিম খাবার। জৈবিক খাবারের (আর্টিমিয়া) এর পাশাপাশি এলআরটি-তে লার্ভার জন্য পরিমিত পরিমাণে কাস্টার্ড খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। লার্ভা ও পিএল-এর বৃদ্ধির প্রত্যাশিত হার বিবেচনায় রেখে ব্যয়বহুল জৈবিক খাবারের পরিমাণ কমিয়ে প্রোটিন ও বিভিন্ন খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ কাস্টার্ড খাবার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

প্রস্তুতপ্রণালি: কাস্টার্ড প্রস্তুতের বিভিন্ন উপাদানসমূহ নিম্নরূপ-

১.	গুড়া দুধ	:	৩০০ গ্রাম
২.	ডিম	:	১০ টি
৩.	কর্নফ্লাওয়ার	:	১০০ গ্রাম
৪.	গুড়া চিংড়ি	:	২১০ গ্রাম
৫.	কডলিভার অয়েল	:	১৭ মিলিলিটার
৬.	ভিটামিন প্রিমিক্স	:	১০ গ্রাম
৭.	আগার পাউডার	:	২০ গ্রাম
৮.	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	:	২০ গ্রাম

এসব উপকরণ একসাথে বেন্ডার মেশিনে মিশ্রণ করতে হবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়ার পর এ মিশ্রণ বাষ্পী-য়তাপে সিদ্ধ ও শুষ্ক করে কেক প্রস্তুত করতে হবে।

প্রয়োগ মাত্রা: সাধারণত এলআরটি-তে লার্ভা মজুদের পরবর্তী ৫ম দিবস থেকে কাস্টার্ড খাদ্য সরবরাহ শুরু করা হয়। এ সময় থেকে তৈরিকৃত কেকগুলো লার্ভা/পিএল-এর বয়সানুসারে বিভিন্ন মেস সাইজের চালুনির মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির কণা তৈরি করে সরবরাহ করা হয়। লার্ভার ৫ দিন বয়স হতে ১০ দিন বয়স পর্যন্ত ২০০ মাইক্রন আকারের চালুনি দিয়ে কাস্টার্ড কণা তৈরি করতে হবে। পরবর্তীতে লার্ভা। পিএল-এর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ১০-২০ দিন পর্যন্ত ২৫০ মাইক্রন এবং ২১ দিন থেকে অবশিষ্ট লার্ভা পর্যায় ও পিএল বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত ৩৫০ মাইক্রন আকারের চালুনি দ্বারা কাস্টার্ড কণা তৈরি করতে হবে। প্রথমদিকে একটি ৫ টন এলআরটি-তে ২৫-৩০ গ্রাম কাস্টার্ড দৈনিক ১ বার সরবরাহ করতে হবে। লার্ভার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কাস্টার্ড সরবরাহের পরিমাণও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হবে। শেষ পর্যায়ে ৫ টন ট্যাংকে দৈনিক ২/৩ বার এবং প্রতিবারে সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম কাস্টার্ড সরবরাহ করা হবে। লার্ভার খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করে কাস্টার্ড প্রয়োগের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে। খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন অপেক্ষা কম বা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত খাদ্য ট্যাংকের পানিকে দূষিত করে লার্ভার মৃত্যু ঘটাতে পারে। আবার খাদ্যের পরিমাণ কম হলে স্বজাতিভক্ষণ এবং পুষ্টিহীনতার সম্ভাবনা থাকে।

কাস্টার্ড প্রয়োগের পূর্বে নিয়মিত এর গুণগতমান যাচাই করা উচিত। ট্যাংকে কাস্টার্ড প্রয়োগের সময় বায়ুসঞ্চা-লন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। অন্যথায় লার্ভা খাদ্য কণা গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। উচ্ছিষ্ট খাদ্য ট্যাংকের তলায় জমা হবে। নিয়মিত সাইফন করে এ উচ্ছিষ্টাংশ ট্যাংক থেকে অপসারণ করা না হলে ট্যাংকের পানি দূষিত হয়ে লার্ভার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। কাস্টার্ড খাদ্য প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও সংরক্ষণের সময় এর গুণগতমান ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

২০২২

খ. ফরমুলেটেড খাদ্য

গলদা চিংড়ির লার্ভার জন্য উপযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতকৃত ফরমুলেটেড খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে পিলেট খাদ্য, মাইক্রোপার্টিকুলেট খাদ্য এবং মাইক্রো-এ্যানক্যাপসুলেটেড খাদ্য বিশেষভাবে উল্লেখযে-াগ্য। এ খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কৌটার গায়ে নির্দেশাবলি অনুসরণ করা উচিত। এসব খাদ্যের মধ্যে মাইক্রো-এ্যানক্যাপসুলেটেড খাদ্য ট্যাংকে প্রয়োগের পর দীর্ঘসময় এর অভ্যন্তরস্থ পুষ্টি উপাদান ধরে রাখতে সক্ষম। তাছাড়া এসব খাদ্যের দ্বারা ট্যাংকের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। গলদা চিংড়ি লার্ভার জন্য প্রস্তুতকৃত ফরমুলেটেড খাদ্য নির্বাচনের সময় খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি লার্ভার বয়স এবং মুখবিহ্বরের মাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সতর্কতার সাথে খাদ্যকণার আকার নির্ধারণ করতে হবে।

(২) এলআরটিতে পানি ব্যবস্থাপনা

এলআরটি-তে এর পূর্ণ আয়তনের ৫০% পানিতে নির্ধারিত সংখ্যক লার্ভা মজুদ করা হয়। এরপর শুধুমাত্র নিয়মিত ১০-২০% পানি যোগ করে চতুর্থদিনে ট্যাংকের আয়তন পূর্ণ করা হয়। ৫ম দিন থেকে নিয়মিত ১০-২০% পানি পরিবর্তন করা হয়। প্রতি সপ্তাহে ২/১ দিন ৫০% পানি পরিবর্তন করা হয়। বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ১০০% পানি পরিবর্তন অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ট্যাংকে পোনা স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পানি পরিবর্তনকালে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যেন সরবরাহকৃত পানির সকল গুণাবলি (বিশেষত লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, পিএইচ ইত্যাদি) এলআরটি-এর পানির গুণাগুণের অনুরূপ থাকে। তাছাড়া শোধিত পানিতে ক্লোরিনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ পানিতে ক্লোরিনের উপস্থিতি লার্ভার ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটাতে পারে। এলআরটিতে পানি প্রবেশকালে এর গতিসীমা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন লার্ভার শরীরে পীড়ন সৃষ্টি হতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে পানি প্রবেশের পাইপের মুখে পলিপ্রাপোইলিন ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক পরিষ্কারকরণ

লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে খাদ্য হিসেবে সরবরাহকৃত আর্টিমিয়া নপ্লি ও কাস্টার্ডের সবটুকু লার্ভা গ্রহণ করতে পারে। ফলে অতিরিক্ত খাদ্য ট্যাংকের তলায় জমা হতে থাকে। অতিরিক্ত খাদ্য ছাড়াও ট্যাংকের তলায় সাধার-ণত লার্ভার খোলস, আর্টিমিয়ার খোলস, লার্ভার মৃতদেহ ইত্যাদিও জমা হতে দেখা যায়। এসবের দ্বারা পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়। এ কারণে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ট্যাংক কমপক্ষে ২/৩ বার পরিষ্কার করা উচিত। কাস্টার্ড প্রয়োগের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে দৈনিক ১বার অর্থাৎ সকাল ৭.০০-৮.০০ টার মধ্যে এবং কাস্টার্ড প্রয়োগ শুরু করার পর থেকে প্রতিদিন দৈনিক ২বার অর্থাৎ সকাল ৭.০০-৮.০০টার মধ্যে ও বিকাল ৪.০০-৫.০০টার মধ্যে সাইফনিং-এর মাধ্যমে ট্যাংকের তলায় জমে থাকা অবাঞ্ছিত সামগ্রী পরিষ্কার করতে হবে। সাইফনিং শুরু করার পূর্বে ট্যাংকের বায়ুসঞ্চালন ১০ মিনিটকাল বন্ধ রাখলে সব ময়লা ট্যাংকের তলায় জমা হবে। তখন ধীরে ধীরে ট্যাংকের চারপাশ ঘুরে সাইফন পাইপের সাহায্যে ট্যাংকের তলা থেকে জমাকৃত ময়লা পরিষ্কার করে তুলে নিতে হবে। সাইফন করার সময় ময়লার সাথে যে পরিমাণ পানি বেরিয়ে যায়, একই গুণাবলি সম্পন্ন সমপরিমাণ পরিশোধিত পানি সরাসরি ট্যাংকে ভরতে হবে।

এলআরটি-তে জীবাণুমুক্তকরণ

লার্ভাকে প্রতিদিন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অসুস্থ লার্ভা দুর্বল অবস্থায় ট্যাংকের তলায় জড়া হয়ে পড়ে থাকে। অনেক সময় লার্ভা বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে। এসময়ে এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা হলে লার্ভার পরিপাকনালী খালি থাকতে দেখা যায়। রোগজীবাণুর সংক্রমণ, খাদ্যে পুষ্টির অভাব অথবা পানির কোন গুণাগুণের তারতম্যের ফলে সৃষ্ট পীড়নে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ধরনের ঘটনা রাধেকল্পে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রোগজীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে (পানি পরিবর্তনের পরে) এলআরটি-এর পানিতে ২০-২৫ পিপিএম ফরমালিন, ০.০৫ পিপিএম ট্রাফলান ও ৫-৬ পিপিএম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিনতু পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে পরিচালিত এলআরটি-এর পানিতে এসব রাসায়নিক সামগ্রী প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। লার্ভা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি এলআরটি-এর পানি ও পরিবেশও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

(৪) লার্ভার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণ

রোগজীবাণু ও পারিবেশিক পীড়নের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় প্রাণীর শরীরে সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে রোগ বলা হয় যা বিশেষ কিছু লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়। জলজ-পরিবেশের চাপ, রোগজীবাণু এবং চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। চিংড়ির লার্ভা ও পিএল রোগ-াক্রান্ত হওয়ার পিছনে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

(ক) Idiophathic Muscle Necrosis (IMN)

রোগের লক্ষণ : Muscle mvv, Muscle ক্ষত হওয়া এ রোগের লক্ষণ।

রোগের কারণ : পরিবেশগত সমস্যা এবং লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার হঠাৎ তারতম্য ও অধিক ঘনত্বে লার্ভা মজুদের কারণে এ রাগে হয়ে থাকে।

প্রতিকার : তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা হঠাৎ পরিবর্তন না করে এবং লার্ভার ঘনত্ব ঠিক ও প্রয়োজনীয় পানি পরিবর্তন করে এ রোগের প্রতিরোধ করা যায়।

(খ) Larval Mid Cycle Diseases (MCD)

রোগের লক্ষণ : ক্ষুদা মন্দা, সবল লার্ভা দুর্বল লার্ভাকে খেতে থাকে। রোগাক্রান্ত লার্ভা দেখতে ধূসর নীল রং এর দেখায়। দুর্বলভাবে সাঁতার কাটে ও বাঁকানো দেখায় Muscle
এ ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার : গুণগত মান সম্পন্ন খাবার ও গুণগত মানসম্পন্ন আর্টিমিয়া ব্যবহার করে এবং Proper Sanitation করে এ রোগের প্রতিকার করা যায়। ১০ পিপিএম এ্যাকুয়াকালচার প্রাবোয়াটেক ব্যবহারসহ ১০ - ২০% পানি পরিবর্তন করেও এর প্রতিকার করা যায়।

(গ) Bacterial Necrosis

রোগের লক্ষণ : এ রোগে আক্রান্ত লার্ভা নীলাভ ও কালো রং ধারণ করে এবং খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থ অনত্রগুলো ফাঁকা হয়ে যায়। লার্ভা দুর্বল হয়ে ট্যাংকের তলায় জমা হয়।

রোগের কারণ : ট্যাংকের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে, সরবরাহকৃত খাবার স্বাস্থ্যসম্মত না হলে এবং ক্রটিপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন হ্যাচারি পরিচালনা করলে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

২০২২

প্রতিকার: নিচের যে কোনো একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে এ রোগের নিরাময় করা যায় ?

- ২ পিপিএম Bi Peniciline Streptomycin
- 1 PPM Fruanel - 0.65
- 1 PPM Erythromycin
- 1 PPM Prefuran
- 0.25- 0.5 PPM Cutrin Plus (4-8 Hrs)
- 0.1 PPM Cutrin Plus (24 Hrs)
- 10 PPM Aquaculture Probiotic (7-8 days interval)

(ণ) Exuvia Entrapment Disease (EFD)

রোগের লক্ষণ : Last stage Larvae & Early Post larvae-তে এ রোগ দেখা যায় । একে । Meta morphosis molt mortality syndrome ও বলা হয় । উপাঙ্গ, চক্ষু ও রোস্ট্রীম খসে পড়ে যায় এবং খোলস পরিবর্তনে সমস্যা দেখা দেয় ।

রোগের কারণ : পানির গুণাগুণ ভালো না থাকলে এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাবারের অভাবে এ রোগ হয়ে থাকে ।

প্রতিকার : পানির গুণাগুণ ভালো রাখতে পারলে এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিকার সম্ভব ।

(ঙ) Protozoan Disease

এটি একটি এককোষী প্রাটোজোয়াজনিত রোগ । লার্ভা-এর বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রোটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় । প্রোটোজোয়া আক্রান্তের ফলে লার্ভা খোলস পাল্টাতে পারে না । যার ফলে দৈহিক বৃদ্ধিতে সমস্যার সৃষ্টি হয় । গলদা চিংড়ির হ্যাচারিতে যে সমস্ত প্রোটোজোয়া বেশি আক্রান্ত করে তার মধ্যে কয়েকটি হলো ।

- *Zoothamnium sp.*
- *Epiostylis sp.*
- *Podophyridae sp.*
- *Vorticella sp.*

রোগের লক্ষণ : লার্ভা ও পিএলকে খোলস বদলাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং লার্ভা ও পোস্ট লার্ভা বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করার ফলে লার্ভা ও পিএল এর মৃত্যু ঘটে ।

রোগের কারণ : পানি এবং খাবারের গুণগতমান খারাপ হলে এ রোগে আক্রান্ত হয় ।

প্রতিকার : নিচের যে কোনো একটি প্রয়োগ করে এ রোগের প্রতিকার করা যায় ?

- Formalin - 25-30 PPM (12hrs)
-Coper Sulphate - 0.1-1.0 PPM (1hr) সাথে Cutrin Plus
- Cutrin plus - 0.5 PPM (1hr)|

(চ) Fungus Disease

সাধারণত দুই ধরনের Fungus দ্বারা আক্রান্ত হয় ।

- Legenedium
- Fusarium

লক্ষণ: লার্ভার ফুলকায় আক্রমণ করে এবং ফুলকা ধীরে ধীরে কালো/বাদামি/তামোট/কমলা বর্ণের হতে থাকে।

রোগের কারণ : সামগ্রিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার জন্য এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্রতিকার :নিচের যে কোনো একটি প্রয়োগ করে এ রোগের প্রতিকার করা যায় ?

- Treflan - 0.05 -0.1 পিপিএম ৩ দিন পরপর
- Sanocare - 0.3 PPM ৩ দিন পরপর
- Microcide - 5 PPM ৩ দিন পরপর

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে সাধারণত ভাইরাসজনিত রোগ দেখা যায় না।

(৫) স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা।

গলদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা বজায় রাখা খুবই জরুরি। হ্যাচারি পরিচালনার সাফল্য স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থাপনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত উপকরণাদির মাধ্যমে যাতে রোগের সংক্রমণ না হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হ্যাচারির অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি হ্যাচারি পরিচালনার বিভিন্ন ধাপে হ্যাচারি কর্মীদের স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে কোনো কারণে দূষণ ঘটে গেলে তা চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। গলদা চিংড়ি হ্যাচারি ব্যবস্থাপনায় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে "রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই হলো উত্তম ব্যবস্থা"।

রোগের সংক্রমণ নির্মূলে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা

গলদা হ্যাচারিতে যে সকল স্থানে রোগ সংক্রমণের উৎস নিমূলে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে তাহলো

- হ্যাচারিতে মাদার প্রবেশ ব্যবস্থা, ডিমওয়ালা চিংড়ির এবং এর রাখার স্থান
- ব্রাইন সংগ্রহ পদ্ধতি, ব্রাইন এবং ব্রাইন রাখার স্থান।
- সরব্রাহকৃত স্বাদু পানি (ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠের উপরের পানি) এবং পানি রাখার স্থান
- হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, বালির ফিল্টার, বায়োফিল্টার এবং ফিল্টারে ব্যবহৃত উপকরণাদি, হ্যাচারি কর্মীদের হ্যাচারির বাইরে পরিধেয় পোকাক পরিচ্ছদ, জুতা-মোজা/সেন্ডেলসহ যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি
- অফিস রুম, সার্ভিস রুম, পিএল বিক্রয়ের স্থান, স্টোর রুম অর্থাৎ যেখানে বাইরের লোকজন আসা যাওয়া করে সে সব স্থান

স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা রক্ষায় পদক্ষেপসমূহ

- হ্যাচারিতে প্রবেশকালে ১৫০ পিপিএম বিচিং পাউডার স্বাদু পানিতে মিশিয়ে ফুটবাথ দ্রবণ করে উক্ত পানিতে পায়ের তলা ধৌত করে হ্যাচারিতে প্রবেশ করতে হবে। বাইরে পরিধেয় জুতা/সেন্ডেল পরে হ্যাচারির ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। ফুটবাথের দ্রবণ প্রতিদিন পরিবর্তন করতে হবে।
- হ্যাচারির বাইরে ব্যবহৃত পোকাক পরিচ্ছদ- শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, জুতা-মাজো, সেন্ডেল ইত্যাদি হ্যাচারিতে ব্যবহার না করাই উত্তম। সকল পোকাক পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট অ্যাপ্রন, গেঞ্জি, প্যান্ট, গাভস্ ইত্যাদি পরিধান করে হ্যাচারিতে প্রবেশ করতে হবে।
- হ্যাচারিতে কাজের সময় সকল ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্তকরণের পর ব্যবহার করতে হবে এবং সরঞ্জামাদি, ব্যবহারের সময় হ্যাচারি কর্মীদের হাত কনুই পর্যন্ত ফরমালিনযুক্ত পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।

হ্যাচারির বিভিন্ন ট্যাংক ও অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে

- হ্যাচারির মেঝে, নর্দমা ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- সপ্তাহে ২ দিন ১০০-১৫০ পিপিএম বিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিতে হ্যাচারির মেঝে, নর্দমা ও অন্যান্য ট্যাংকসমূহের দেয়াল সাবধানে পরিষ্কার করতে হবে ।
- লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য সাইনিং এর প্রক্রিয়া সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে করতে হবে । কোনো অবস্থায়ই আংশিক সাইফনিং করা যাবে না । এলআরটি সঠিকভাবে পরিষ্কারের উপর লার্ভার সুস্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ।

হ্যাচারির উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে ।

- হ্যাচারিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি নিয়মিত ২০০-২৫০ পিপিএম ফরমালিন মিশ্রিত পানিতে ধৌত করতে হবে ।
- এলআরটিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পর ২০০-২৫০ পিপিএম ফরমালিন অথবা ৫০ পিপিএম বিচিং পাউডারের দ্রবণে জীবাণুমুক্ত করে ধুয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে ।
- প্রত্যেক এলআরটি-এর জন্য আলাদা আলাদা সরঞ্জামাদি (মগ, গ্লাস, বালতি, সাইফনিং পাইপ, ব্রাশ ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে ।
- অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্রে হ্যাচারির দরজা যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে
- হ্যাচারিতে ধূমপান করা উচিত নয় ।
- হ্যাচারির ভেতরে টয়লেট থাকা বাঞ্ছনীয় নয় ।
- হ্যাচারিতে সর্বদা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা উচিত ।
- হ্যাচারিতে দর্শনার্থী, অবাঞ্ছিত বা অপ্রয়োজনীয় লোকজনের প্রবেশাধিকার নিরুৎসাহিত করা উচিত । সীমিত পরিসরে দর্শনার্থী হ্যাচারিতে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলে খেয়াল রাখতে হবে যেন দর্শনার্থীর মাধ্যমে হ্যাচারির জীব-নিরাপত্তা ব্যাহত না হয় ।

হ্যাচারিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

- সংক্রামক রোগ বহনকারী শ্রমিককে হ্যাচারির কাজ হতে বিরত রাখতে হবে ।
- নিয়োগ প্রত্যাশী শ্রমিক/কর্মী কোনো প্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিয়াগের আগে ডাক্তারি সার্টিফিকেট যাচাই করে নিতে হবে ।
- পোকা-মাকড়, ইঁদুর-ঘঁচো, কঁকড়া, ব্যাঙ, সাপ, কুকুর, বিড়াল, পাখি ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী যেন হ্যাচারির অভ্যন্তরে বা উৎপাদন ইউনিটে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- ইইউ বিধি নিষেধের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের FIQC বিধিমালা/৯৭ মোতাবেক হ্যাচারি পরিচালনা করতে হবে ।
- অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিক, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার পরিহার করে শুধুমাত্র অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিক, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে হবে ।
- হ্যাচারিতে ব্যবহৃত খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ, ও ব্যবহারে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে ।
- হ্যাচারিতে ব্যবহৃত ডিমওয়ালা চিংড়ি, আর্টিমিয়া, খাদ্য, ঔষধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎস শনাক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে । ২০২২

- উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে হ্যাচারি পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- হ্যাচারিতে উৎপাদন শুরু করার পূর্বে জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করার জন্য ফিউমিগেশন করা যেতে পারে।
- ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ স্থানে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন এসব সামগ্রী অথবা লার্ভা/পিএল কোনোক্রমে সংক্রমিত হতে না পারে।
- মুখ বন্ধ করা যায় এমন প্লাস্টিকের পাত্রে ময়লা-আবর্জনা রাখতে হবে। পাত্রটি মাঝে মাঝে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হ্যাচারির ভেতরে ও বাইরে অবস্থিত সকল নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ঢাকনা দিয়ে রাখতে হবে।
- সমস্ত আবর্জনা স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে অপসারণ করতে হবে। উক্ত আবর্জনা হতে প্রত্যক্ষ বা পরাক্ষেভাবে হ্যাচারিতে সংক্রমণ ঘটতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- হ্যাচারির বর্জ্য পানি বিধি মোতাবেক শশাধনের পরে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে হবে।

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে পানি ব্যবস্থাপনা

বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারির অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজ গলদা চিংড়ি হ্যাচারির অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে স্বীকৃত। হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের কাজে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বা ব্রাইন এবং স্বাদু পানি উভয়ের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময়ে প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত লবণাক্ত পানি বা ব্রাইন এবং স্বাদু পানির বেশকিছু গুণাগুণ গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন কাজের অনুকূল থাকে না। তখন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত পানি উৎপাদন কাজের অনুকূল করে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যবস্থাপনা কাজকে সামগ্রিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা" বলা হয়। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে পানি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

ব্রাইন সংগ্রহ

৮০ পিপিটি অপেক্ষা অধিক লবণাক্ততা সম্পন্ন সমুদ্রের পানিকে ব্রাইন বলা হয়। সাধারণত সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা এ মাত্রা অপেক্ষা কম থাকে। তাই সাধারণত লবণ চাষের ক্ষেত্র থেকে ব্রাইন সংগ্রহ করা হয়। একটি লবণ ক্ষেত্রকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়

১. আধার (Reservoir),

২. ঘনীভবনকারক (Condensor)

৩. ফটিকীকারক (Crystalizer)

গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঘনীভবনকারক ক্ষেত্র থেকে ব্রাইন সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রের পানিকে ঘনীভূত করে লবণ উৎপন করা হয়ে থাকে। ঘনীভবনের সাথে সাথে সমদের পানি থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন অত্যাবশ্যকীয় ট্রেস লবণ, মাইনর লবণ এবং মেজর লবণের উপস্থিতির পরিমাণ কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ লবণ (NaCI) অবশিষ্ট থাকে। তাই এ পানি যত ঘনীভূত হতে থাকে, ততই এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেস লবণের পরিমাণ কমতে থাকে। অথচ গলদা চিংড়ির জীবনচক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব ট্রেস লবণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাই গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার কাজে ১০০-১২০ পিপিটি অপেক্ষা বেশি লবণাক্ততা সম্পন্ন ব্রাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

২০২২

ব্রাইনের প্রাপ্তিস্থান

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার চকরিয়া, পেকুয়া, মহেশখালী উপজেলায় সমুদ্রের পানিকে ঘনীভূত করে লবণের চাষ করা হয়। তাই এসব উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ সুবিধার উপরে নির্ভর করে চকরিয়া বা বাঁশখালী উপজেলার লবণক্ষেত্র থেকে ব্রাইন সংগ্রহ করা যায়। সম্প্রতি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন মুন্সীগঞ্জ থেকেও ১০০ পিপিটি ব্রাইন সগ্রহ করা যায়। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ব্রাইন সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সময়।

স্বাদুপানি সংগ্রহ

গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উপযুক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে ভূগর্ভস্থ পানির খরতা এবং বিভিন্ন প্রকার ধাতব যৌগের উপস্থিতি ব্যবস্থাপনাযোগ্য পর্যায়ে থাকে না। তখন এ পানি পরিত্যাগ করে ভূপৃষ্ঠের পানিকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে শোধন করে হ্যাচারি পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যায়।

ব্রাইন ও স্বাদু পানির গুণাগুণ

গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনার উপযোগী ব্রাইন ও স্বাদু পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

নং	গুণাগুণের বিবরণ	সমুদ্রের পানি/ব্রাইন	স্বাদু পানি
১	২	৩	৪
১	লবণাক্ততা	২৮-৩২% (সমুদ্রের পানি)	০-০.৫%
২	তাপমাত্রা	২৮-৩২° সেন্টিগ্রেড	২৮-৩১° সেন্টিগ্রেড
৩	দ্রবীভূত অক্সিজেন	> ৪ পিপিএম	> ৪ পিপিএম
৪	পিএইচ	৭.৫-৮.২	৭.৫-৮.২
৫	খরতা (হার্ডনেস)	১,০০০-১,২০০ পিপিএম	৮০-১০০ পিপিএম
৬	অ্যালকালিনিটি	১২৫-১৪০ পিপিএম	১২৫-১৪০ পিপিএম
৭	লৌহ	<০.১ পিপিএম	<০.১ পিপিএম
৮	অনায়নিত এ্যামোনিয়	<০.১ পিপিএম	<০.১ পিপিএম
৯	নাইট্রেট-নাইট্রোজেন	<০.১ পিপিএম	<০.১ পিপি এম ১০
১০	নাইট্রাইট-নাইট্রোজেন	<০.০২ পিপিএম	<০.০২ পিপিএম
১১	ক্লোরিন	০	০
১২	হাইড্রোজেন সালফাইড	<০.০০৩ পিপিএম	<০.০০৩ পিপিএম
১৩	ভারী ধাতু	<০.০১ পিপিএম	<০.০১ পিপিএম

মিশ্রিত/অর্ধলবণাক্ত পানি প্রস্তুতকরণ

গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্রাইনের সাথে পরিমাণমত স্বাদপানি মিশ্রিত করে লার্ভা প্রতিপালন, আর্টিমিয়া হ্যাচিং এবং ব্রুড প্রতিপালনের উপযোগী নির্ধারিত লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি প্রস্তুত করা হয়। এ কাজে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্রাইনের পরিমাণ = মিশ্রিত পানির প্রত্যাশিত লবণাক্ততা × প্রয়োজনীয় মিশ্রিত পানির পরিমাণ = ব্রাইনের লবণাক্ততা। ২০২২

উদাহরণ: ১

১০০ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন ব্রাইন থেকে ৬ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন ১০ টন পানি প্রস্তুত করার জন্য ব্রাইন প্রয়োজন = ৬ পিপিটি × ১০ টন = ১০০ পিপিটি = ০.৬ টন

অতএব স্বাদু পানি প্রয়াজন = ১০ টন - ০.৬ টন = ৯.৪ টন।

উদাহরণ: ২

১০০ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন ব্রাইন থেকে ১২ পিপিটি লবণাক্ততা সম্পন্ন ১০ টন পানি প্রস্তুত করার জন্য ব্রাইন প্রয়োজন = ১২ পিপিটি × ১০ টন = ১০০ পিপিটি = ১.২ টন।

অতএব স্বাদু পানি প্রয়োজন = ১০ টন - ১.২ টন = ৮.৮ টন।

মিশ্রিত পানি শোধন

মিশ্রিত পানি থেকে লৌহ দূর করার পাশাপাশি পানিকে জীবাণুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে এর সাথে ১৫ পিপিএম মাত্রায় বিচিং পাউডার (৬০-৬৫% সক্রিয় ক্লোরিন উপাদান) প্রয়োগ করতে হবে। বিচিং পাউডারে ক্লোরিনের উপস্থিতির কারণে জীবাণু প্রতিরোধে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আবার বিচিং পাউডার একটি শক্তিশালী অক্সিডাইজিং এজেন্ট (Oxidizing agent) হওয়ায় পানি থেকে লৌহ মুক্তকরণে এর ব্যাপক কার্যকারিতা রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ১৫ পিপিএম মাত্রায় বিচিং পাউডার প্রয়োগ করে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালন (Strong aeration) করা হলে বিচিং পাউডারের হাইপাক্লোরাইডের সাথে পানিতে থাকা লৌহের বিক্রিয়ায় FeCl২ এবং ঋবঈষ৩ এর ঘন লাল তলানি সৃষ্টি হয়। পরে বায়ু সঞ্চালন বন্ধ করা হলে এ তলানী ধীরে ধীরে তলায় জমা হয় এবং পানি সম্পূর্ণরূপে লৌহমুক্ত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩-৫ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। এরূপ পদ্ধতিতে লৌহমুক্ত করার পরে উৎপাদন কাজে ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ক্লোরিনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া এরূপ পদ্ধতিতে লৌহমুক্ত করার পরে পানি উৎপাদন ট্যাংকে সঞ্চালনের পূর্বে অধঃক্ষিপ্ত লাল বর্ণের তলানী যেন কোনোভাবেই ট্যাংকে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য ট্যাংকে পানির প্রবেশমুখে পলিপ্রোপাইলিনের ব্যাগ-ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্লোরিনের সংস্পর্শে যেমন বিভিন্ন রোগজীবাণুর মৃত্যু ঘটে, তেমনি পানিতে ক্লোরিনের উপস্থিতির কারণে চিংড়ির ডিম, লার্ভা বা পিএল এমনকি ডিমওয়ালা চিংড়ির মৃত্যু হতে পারে, ডিমওয়ালা। চিংড়ির প্রজনন ক্ষমতা কমে যেতে পারে অথবা হ্যাচিং-এর হার কমে যেতে পারে। তাছাড় অবশিষ্টাংশের উপস্থিতির কারণে গলদা চিংড়ির লার্ভা বা পিএল বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ক্লোরিন মিশ্রিত পানি ব্যবহারের পূর্বে উত্তমরূপে ক্লোরিনমুক্ত করে নেয়া প্রয়োজন। উৎপাদন কাজে ব্যবহারের পূর্বে পানিতে ক্লোরিনের উপস্থিতির মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে এর অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পানিকে ক্লোরিনমুক্ত করা যায়

১. বায়ু সঞ্চালনের সাহায্যে ক্লোরিন মুক্তকরণ

বিচিং পাউডার/ক্লোরিন মিশ্রিত পানিতে উচ্চগতিতে বায়ু সঞ্চালন করা হলে প্রাথমিকভাবে পানিতে ক্লোরিনের বিষক্রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় পানি ধীরে ধীরে ক্লোরিনমুক্ত হতে থাকে এবং ১-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ক্লোরিনমুক্ত হয়ে পড়ে।

২০২২

২. সূর্যালোকের সাহায্যে ক্লোরিনমুক্তকরণ

প্রখর সূর্যালোকে ক্লোরিনযুক্ত পানির ক্লোরিনের বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে রোগজীবাণু দ্রুত ধ্বংস হয়। পরবর্তীতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরিন মুক্তকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সূর্যালোকের উপস্থিতি অপেক্ষা অনুপস্থিতিতে পানি ক্লোরিনমুক্ত হতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

৩. উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্লোরিন মুক্তকরণ

ক্লোরিনযুক্ত পানিকে প্রখর সূর্যালোকের নিচে রেখে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালন করা হলে ক্লোরিনমুক্ত হওয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে হ্যাচারিতে এভাবেই ক্লোরিনযুক্ত পানিকে ক্লোরিনমুক্ত করা হয়ে থাকে।

৪. সোডিয়াম থায়োসালফেট (Na,S,0,) ব্যবহারে ক্লোরিন মুক্তকরণ

ক্লোরিনযুক্ত পানিতে সূর্যালাকের উপস্থিতিতে বায়ুসঞ্চালন করে সেখানে উপস্থিত প্রতি ১ পিপিএম ক্লোরিনের জন্য ১ পিপিএম মাত্রায় সোডিয়াম থায়োসালফেট প্রয়োগ করা হলে পানি দ্রুত ক্লোরিনমুক্ত হয়। সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহারের ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই উক্ত পানিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে লার্ভা/ পিএল-এর উপরে অতিরিক্ত সোডিয়াম থায়াসোলফেটের কিছু ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করাই উত্তম।

বালির ফিল্টারের (Slow Sand Filter) সাহায্যে পানিশোধন

বালির ফিল্টার গলদা চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অত্যাবশ্যক। শুধু বালির ফিল্টারের সাহায্যে একটি বাণিজ্যিক চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা করা সম্ভব। বালির ফিল্টারে ভাইরাস ও কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার রাগজীবাণু, প্রোটোজোয়া, অদ্রবণীয় ভারী বা হালকা জৈব ও অজৈব কণা, ফাইটোপ্ল্যাংকটন, জুপ্ল্যাংকটন, সামুদ্রিক প্রাণী বা উদ্ভিদ, এদের ডিম, লার্ভা বা অন্য যে কোনো পর্যায়, বালিকণা, কর্দমরেণু ইত্যাদি আটকে যায়। বালির ফিল্টার স্থাপনের জন্য ১.৫ মিটার উচ্চতার ট্যাংক উপযোগী। বালির ফিল্টারে প্রধান পরিস্রাবক মাধ্যম হিসেবে চিকন বালি (১০-১৫ মাইক্রন) ও কাঠকয়লা এবং পানি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে মোটা দানার বালি বা সিলেট স্যান্ড ও নুড়িপাথর ব্যবহার করা হয়। একই ট্যাংকে একটির পরে একটি মাধ্যমের তর সাজিয়ে এ ধরনের ফিল্টার গঠন করা যেতে পারে। আবার বৃহদায়তনের হ্যাচারিতে একসাথে প্রচুর পরিশ্রুত পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধ কয়েকটি ট্যাংক ব্যবহার করে বিভিন্ন মাধ্যম পর্যায়ক্রমে সাজানো যেতে পারে। পরিস্রাবক মাধ্যমের স্তর যত বেশি হয়, পানির পরিস্রাবণও তত ভালো হয়। যেভাবেই সাজানো হাকে না কেন, পর পর সাজানো পরিস্রাবক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে (শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে) পানির প্রবাহ সৃষ্টি করে পরিস্রাবণ করাই হলো এর মূল কর্মপদ্ধতি। এ ফিল্টারে পানি পরিস্রাবণের গতি আরও ধীরে এবং পরিশ্রুত পানির মান অধিকতর নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরিস্রাবক মাধ্যম-সমূহকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত দিক থেকে সাজিয়ে ব্যাক-ওয়াশের সাহায্যে পানি প্রবাহিত করা যেতে পারে। পরিশ্রুত পানির চাহিদার উপরে নির্ভর করে বালির ফিল্টারের আকার ছোট বা বড় করা যায়। আবার একটি মাত্র ফিল্টারের পরিবর্তে একাধিক ফিল্টার নির্মাণ করে পর্যায়ক্রমে একটির পরে একটি ব্যবহার করা যায়।

নলকূপ থেকে সংগৃহীত ভূগর্ভস্থ পানি পরিস্রাবণের জন্য বালির ফিল্টার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। স্বাদু পানির উৎস হিসেবে ভূপৃষ্ঠের পানি (নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি) ব্যবহার করা হলে তা অবশ্যই বালির ফিল্টারের সাহায্যে পরিস্রাবণ করে ব্যবহার করতে হবে।

ট্রাইটন হাই-রেট প্রেসার (স্যান্ড) ফিল্টার (Triton Hi-Rate Pressure Sand Filter)

এটি একটি বালির ফিল্টার। বর্তুলাকার এফআরপি ট্যাংকের অভ্যন্তরে রক্ষিত বালির মধ্য দিয়ে মানানসই

২০২২

চিত্র: ট্রাইটন হাই-রেট প্রেসার ফিল্টার

শক্তির পাম্পের সাহায্যে পানি দ্রুত গতিতে প্রবাহিত করে ফিল্টার করা হয়। ২০-৫০ মাইক্রন আকৃতির বালি এ ফিল্টারের একমাত্র পরিস্রাবক মাধ্যম। আকার এবং শক্তির তারতম্যের উপরে নির্ভর করে এ ধরনের ফিল্টারের সাহায্যে প্রতি মিনিটে ২৫০-৫০০ লিটার পর্যন্ত পানি ফিল্টার করা সম্ভব। কিছুটা বড় আকৃতির অদ্রবণীয় পার্টিক্যাল, কিছু কিছু প্রোটোজোয়া, সামুদ্রিক প্ল্যাংকটন, সামুদ্রিক প্রাণীর ডিম, লার্ভা, পোনা ইত্যাদি এ ফিল্টারে আটকা পড়ে। কিন্তু ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অধিকাংশ প্রোটোজোয়া, কিছু কিছু সামুদ্রিক প্ল্যাংকটন এ ফিল্টারে আটকায় না। প্রকৃতপক্ষে এসব ফিল্টার সুইমিং পুলের পানি পরিষ্কার রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিংড়ি হ্যাচারিতে আগে এ ধরনের ফিল্টারের ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এ প্রবণতা অনেকটা কমে এসেছে।

কার্টিজ ফিল্টার (Cartridge Filter)

হ্যাচারিতে সমুদ্রের পানির মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধীর গতির বালির ফিল্টার-এর পরে কার্টিজ ফিল্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ফিল্টারে একআরপি নির্মিত বাকেটের অভ্যন্তরে ১০-১৫ মাইক্রন আকৃতির কার্টিজ সামগ্রীর সাহায্যে পানি ফিল্টার কম আকৃতির কাজি সামগ্রীর সাহায্যে পানি ফিল্টার করা হয়। এ ফিল্টারে পানির সর্বোচ্চ ফ্লোরেট ৩,৫০০-৪,৫০০ লিটার/মিনিট। কার্টিজ ফিল্টার সাধারণত ওভারহেড ট্যাংকের সাথে ব্যবহার করা হয়। তবে ফ্লোরেট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কার্টিজ ফিল্টারের সাথে অনেক সময়ে মানানসই শক্তির পাম্প ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

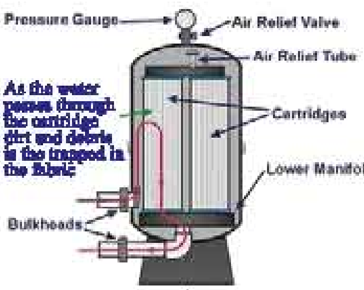

চিত্র: কার্টিজ ফিল্টার

ব্যাগ ফিল্টার (Bag Filter)

পলিয়েস্টার বা অন্যান্য সিনথেটিক ফাইবারের তৈরি (৩০ সেমি×৮৫ সেমি) ১-১০ মাইক্রনের "ব্যাগ ফিল্টার" হ্যাচারিতে ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা জুপ্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র প্রাণী, ডিম ও লার্ভা, ভাসমান বালিকণা, কর্দমরেণু এবং অন্যান্য ভাসমান অদ্রবণীয় পদার্থ ফিল্টার ব্যাগে আটকা পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকৃতির প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালিকণা, ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া এ ব্যাগে আটকা পড়ে না। ফিল্টার ব্যাগের ফ্লোরেট খুব কম। হঠাৎ করে পানি প্রবাহের গতি বেড়ে গেলে পিছন দিকের খোলা প্রান্ত দিয়ে ব্যাগের ভিতরের পানি বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ পরিস্রুত পানির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয়ার আশঙ্কা থাকে। বড় বা মাঝারি আকারের বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে ব্যাপকভাবে পানি ফিল্টারের ক্ষেত্রে ফিল্টার ব্যাগ ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে সীমিত আঙ্গিকে আর্টিমিয়া হ্যাচিং ট্যাংক, বহিরাঙ্গনে প্ল্যাংকটনের চাষ, নার্সারি বা ডিমওয়ালা ট্যাংকে পরিস্রুত পানি প্রবেশ ইত্যাদি কাজে ফিল্টার ব্যাগ

চিত্র: ব্যাগ ফিল্টার

ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইউভি স্টেরিলাইজার ব্যবহার

পানিকে জীবাণুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্লোরিন প্রয়োগের পাশাপাশি ইউভি স্টেরিলাইজার ব্যবহার করা সমীচীন। ইউভি স্টেরিলাইজারের সাহায্যে পানি থেকে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও ফাংগাস ইত্যাদি সকল প্রকার জীবাণু সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব। ইউভি স্টেরিলাইজারের পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানিতে অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra Violet Ray) বিচ্ছুরিত হয়। ফলে এর মধ্যে অবস্থিত সব ধরনের জীব পদার্থের জীবকোষের ডিএনএ অকার্যকর (De-Activated) হয়ে যায় এবং পানি সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত হয়। ইউভি স্টেরিলাইজারের কার্যকারিতা নিম্নলিখিত ৩টি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে

- জীবাণুর আকৃতি,
- নিঃসৃত বিকিরণের মাত্রা এবং
- প্রবাহিত পানিতে আলট্রাভায়ালেট রশ্মি সঠিকভাবে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা।

পানিতে উপস্থিত জীবাণুর আকৃতি যত বড় হয়, এদের উপরে আলট্রাভায়ালেট রশ্মির কার্যকারিতাও তত কম হয়ে থাকে। ৩৫,০০০ মাইক্রো-ওয়াট/সেকেন্ড/বর্গ সেমি মাত্রার বিকিরণের সাহায্যে অধিকাংশ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও প্রাটোজোয়ার জীবাণু নিধন করা সম্ভব। তাই পানিকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে আলট্রাভায়ালেট রশ্মির সন্তোষজনক বিকিরণ মাত্রা >৩৫,০০০ মাইক্রো-ওয়াট সেকেন্ড/বর্গ সেমি হওয়া প্রয়োজন। আদর্শ পরিস্থিতিতে আলট্রাভায়ালেট রশ্মির বিকিরণ সম্ভবত ৫ সেন্টিমিটার অপেক্ষা অধিক পুরু পানির স্তর ভেদ করতে পারে না। এছাড়া পানিতে ভাসমান অথবা দ্রবীভূত জৈব/অজৈব পদার্থের উপস্থিতি বা ঘোলাত্বের কারণে বিকিরণের মাত্রা আরও কমে যেতে পারে। তাই একই মাত্রার আলট্রাভায়ালেট রশ্মির বিকিরণ পরিষ্কার স্বাদু পানি অপেক্ষা অজৈব আয়নের ঘনত্ব সম্পন্ন অর্ধ-লবণাক্ত পানিতে তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর হয়ে থাকে। পানিকে জীবাণুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইউভি স্টেরিলাইজার ব্যবহার করার সময়ে এসব বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলআরটি-এর পানি পুনঃসঞ্চালনে বায়োফিল্টার-এর ব্যবহার

অণুজীবের সাহায্যে এলআরটি-এর পানি পরিশাধেনের উদ্দেশ্যে হ্যাচারিতে বায়োফিল্টারের মাধ্যমে পানি পুনঃসঞ্চালন করা হয়। বদ্ধ-হ্যাচারি পরিচালনা পদ্ধতিতে বায়োফিল্টার অত্যাবশ্যক। বায়োফিল্টার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবহৃত পানিকে পরিশোধন এবং পুনঃসঞ্চালন করে বার বার ব্যবহার করা যায়। ফলে পানির সাশ্রয় হয়। এলআরটি-এর পানিতে লার্ভার বর্জ্য পদার্থ, অব্যবহৃত খাদ্য ও মৃত লার্ভা, আর্টিমিয়া ইত্যাদির পচনের ফলে পানিতে অনায়নিত অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে পানি লার্ভার জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠে। বায়োফিল্টারে সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ক্ষতিকর অনায়নিত অ্যামোনিয়া প্রথমে কম ক্ষতিকর নাইট্রাইটে এবং পরবর্তীতে নিরপেক্ষ নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। ফলে ট্যাংকের পানি লার্ভার জন্য উপযোগী হয়ে পড়ে। বায়োফিল্টার নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করে

১. পানি থেকে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইট দূর করে
২. পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে
৩. দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়
৪. কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমায়
৫. ট্যাংকের পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন অদ্রবণীয় কণা অপসারণ করে

বায়োফিল্টার প্রস্তুতপ্রণালি

বায়োফিল্টারের আয়তন সাধারণত এলআরটি-এর ১০% এবং উচ্চতা এলআরটি-এর সমান হতে হবে। প্রতিটি এলআরটি-এর জন্য পৃথক বায়োফিল্টার প্রয়োজন। এর মোট উচ্চতা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন পানিপূর্ণ অবস্থায় বায়োফিল্টার এবং এলআরটি-এর উপরের ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত খালি থাকে। জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করার পরে ১ মিটার উচ্চতার একটি বায়োফিল্টারে ৮৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত মিডিয়া দেয়া যেতে পারে। বায়োফিল্টার স্থাপনের পূর্বে পাথর, ঝিনুক, নেট, ড্রাম, পাইপ, এয়ার স্টোন ইত্যাদি ১৫০ পিপিএম বিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে জীবাণুমুক্ত স্বাদু পানি দিয়ে ভালাভাবে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। বায়োফিল্টারের নিচের দিকে ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ২০ মিলিমিটার সাইজের পাথর দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। ২য় স্তরে ১৫ সেমি ঝিনুক, ৩য় স্তরে ২০ সেমি পাথর, ৪র্থ স্তরে ৫ সেমি ঝিনুক, ৫ম স্তরে ২০ সেমি পাথর ও ৬ষ্ঠ স্তরে ১০ সেমি ঝিনুক পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে এবং উপরের ১৫ সেমি খালি জায়গা রাখতে হয় থেকে বায়োফিল্টারে পানি প্রবেশ করার পাইপ স্থাপন করতে হবে এবং বায়োফিল্টার থেকে এলআরটি-তে শোধিত পানি পুনঃসঞ্চালনের জন্য নুড়িপাথরের নিচ পর্যন্ত পাইপ স্থাপন করে বাতাসের পাইপ ও এয়ার স্টোন স্থাপন করতে হবে।

বায়োফিল্টারে পানি সরবরাহ

প্রথমে স্বাদু পানি দিয়ে বায়োফিল্টার ভর্তি করে ২৫০ পিপিএম হারে ফরমালিন দিয়ে ২৪ ঘণ্টা বায়ুসঞ্চালন করার পর সমস্ত পানি ফেলে দিয়ে প্রথমে জীবাণুমুক্ত স্বাদু পানি এবং পরে ১২ পিপিটি লবণাক্ত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। বায়োফিল্টারে পরিশাধিত ১২ পিপিটি লবণ পানি দিয়ে ঝিনুকের উপর ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত পানি দিয়ে এতে বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর ১.৫ মিলি তরল অ্যামোনিয়া যোগ করতে হবে। ২০-২৫ দিন বায়ুসঞ্চালনের পর পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে। যদি এ অবস্থায় অ্যামোনিয়া না পাওয়া যায় তবে পুনরায় এ্যামোনিয়া দিতে হবে এবং ৩-৪ দিন পর পুনরায় এ্যামোনিয় পরীক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ্যামোনিয়ার অনুপস্থিতি বায়োফিল্টারের ১০০ ভাগ কার্যক্ষম নির্দেশক। বায়োফিল্টারে অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন না হওয়া পর্যন্ত লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকের সাথে এর সংযোগ দেয়া যাবে না।

বায়োফিল্টার সক্রিয়করণ

বায়েফিল্টার স্থাপন করে সাথে সাথে তা এলআরটি-এর সাথে সংযুক্ত করা যাবে না। বায়োফিল্টারকে সক্রিয় করার পূর্বে এলআরটি-এর সাথে সংযুক্ত করা হলে প্রতিপালন ট্যাংকের পানি অ্যামোনিয়াজনিত বিষাক্ততা থেকে মুক্ত হবে না বিধায় লার্ভার জন্য বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তিনটি পদ্ধতিতে বায়োফিল্টার সক্রিয় করা যায়।

প্রথম পদ্ধতি: নতুন বায়োফিল্টারে নুড়ি স্থাপনপূর্বক নির্ধারিত লবণাক্ততা সম্পন্ন পানি প্রবেশের পরে ১.৫ মিলি অ্যামোনিয়া যোগ করতে হবে। এরপর ২০-২৫ দিন বায়ুসঞ্চালন করা হলে নুড়িপাথরের গায়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে। হেটোরোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। ২০/২৫ দিন পরে পানিতে অ্যামেনিয়ার পরিমাণ কমে গেলে বা অনুপস্থিত থাকলে এদের উপস্থিতির মাধ্যমে বায়োফিল্টারের সক্রিয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: কোনো সক্রিয় বায়োফিল্টার থেকে কিছু নুড়িপাথর এনে নতুনভাবে প্রস্তুতকৃত বায়োফিল্টারে দিয়ে ৮-১০ দিন বায়ুসঞ্চালন করা হলে নুড়িপাথরের গায়ে হেটোরাট্রেফিক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয় এবং বায়োফিল্টার সক্রিয় হয়ে যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি: বায়োফিল্টার স্থাপনের পরে এর ১২ পিপিটি লবণাক্ত পানিতে কিছু তেলাপিয়া ছেড়ে ২-৩ সপ্তাহ পালন করা হলে নুড়িপাথরের গায়ে হেটোরেট্রপিক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেবে এবং বায়োফিল্টার সক্রিয় হবে। বায়োফিল্টার সক্রিয় হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত হলে ট্যাংক থেকে তেলাপিয়া মাছ সরিয়ে নিয়ে। বায়োফিল্টারকে এলআরটি-এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যাতে পারে।

বায়োফিল্টারের কার্যকারিতা: তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে বায়োফিল্টারের কার্যকারিতা বর্ণনা করা যায়।

১ম পর্যায়: অ্যামোনিফিকেশান বা মিনারেলাইজেশান।

বায়োফিল্টারে স্থাপিত নুড়িপাথরের গায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হেটোরেট্রপিক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়। এসব হেটোরেট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা এলআরটি-এর পানিতে লার্ভার মৃতদেহ, মলমূত্র, প্রয়োগকৃত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদির পচনের ফলে লার্ভার জন্য চরম ক্ষতিকর আয়নিত ও অনায়নিত অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়াকে অ্যামোনিফিকেশান বা মিনারেলাইজেশান বলা হয়।

২য় পর্যায়: নাইট্রিফিকেশান

১ম পর্যায়ে হেটোরেট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষতিকর আয়নিত ও অনায়নিত অ্যামোনিয়া নাইট্রোসামোনোস ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে অক্সিডেশান প্রক্রিয়ায় প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর নাইট্রাইটে পরিণত হয়। পরবর্তীতে পুনরায় এ নাইট্রাইট আবার নাইট্রোব্যাক্টারের মাধ্যমে সর্বাধিক কম ক্ষতিকর নাইট্রাইটে পরিণত হয়। এর ফলে এলআরটি-এর পানি ক্ষতিকর অজৈব নাইট্রোজেনজনিত বিষাক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে লার্ভার জীবনধারণের উপযোগী হয়। নাইট্রিফিকেশান পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য ৬টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নিম্নরূপ

১. বায়োফিল্টারের পানিতে যে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যেমন অ্যান্টিবায়োটিকের অনুপস্থিতি

২. বায়োফিল্টারের পানির তাপমাত্রা ২৮-৩০° সেন্টিগ্রেড থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. বায়াফিল্টারের পানির পিএইচ ৭.৫-৮.৫ মাত্রার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪. বায়োফিল্টারের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৪ পিপিএম এর বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. বায়োফিল্টারের পানির লবণাক্ততা ১০-১৫ পিপিটি এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. বায়োফিল্টারে স্থাপিত নুড়িপাথর ও ঝিনুকের পরিমাণ বেশি হলে অধিক পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে এবং নাইট্রিফিকেশানের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। বায়োফিল্টারের প্রত্যাশিত সক্রিয়তা প্রাপ্তির জন্য এসব নুড়িপাথর ও ঝিনুক ছোট আকারের এবং অমসৃণ পৃষ্ঠ সম্পন্ন হলে ভালো হয়।

৩য় পর্যায়: ডিসিমিলেশান বা ডি-নাইট্রিফিকেশান

বায়োফিল্টারের নুড়িপাথরের নিচে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অ্যানারাবেিক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়। এরা পানিতে উপস্থিত নাইট্রেটকে ভেঙে নাইট্রাইট, মুক্ত নাইট্রোজেন, মিথেন, হাইড্রোজেন-সালফাইড ইত্যাদি গ্যাস তৈরি করে। এর ফলে বায়োফিল্টারের পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়াকে ডিসিমিলেশান বা ডি-নাইট্রিফিকেশান বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পানিতে উপস্থিত নাইট্রেটের পরিমাণ কমলেও বায়োফিল্টারে তা ব্যাপকভাবে চলতে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এর ফলে পানিতে ক্ষতিকর অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। তাই বায়োফিল্টারে নাইট্রেটের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিছু পানি পরিবর্তন করে দেয়া উচিত। বায়োফিল্টারের নুড়িপাথরের নিচে বায়ুসঞ্চালনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ডি নাইট্রিফিকেশানের পরিমাণ কমানো সম্ভব।

২০২২

গলদা হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো ও উপকরণাদি জীবাণুমুক্তকরণ

হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অবকাঠামো এবং উপকরণসমূহ উৎপাদন কর্মকা- শুরু করার আগে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্রবণের সাহায্যে লার্ভা প্রতিপালন ইউনিটসহ সম্পূর্ণ হ্যাচারি, ট্যাংক, মেঝে, ক্যাচপিট, নর্দমা, পানির প্রতিটি পাইপলাইনের ভেতরের অংশ এবং অন্যান্য সকল উন্মুক্ত অবকাঠামো ও স্থান উত্তমরূপে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করা (Total disinfection) এবং শুকানো প্রয়োজন। বিভিন্নভাবে হ্যাচারিতে দূষণ বা সংক্রমণের সৃষ্টি হতে পারে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে - (ক) জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমণ, (খ) পরজীবীর মাধ্যমে সংক্রমণ এবং (গ) দূষণের মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি। তাই উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে যথাযথভাবে অবকাঠামো ও উপকরণাদি উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

হ্যাচারিকে জীবাণুমুক্ত ও দূষণমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈবিক ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায়, শুকিয়ে এবং তাপ প্রয়োগের মাধ্যমেও বেশ কিছু অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি জীবাণু মুক্ত করা হয়। অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ধৌত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালোভাবে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে ময়লামুক্ত করে ধৌত করা হয়। এরপরে কোন জীবাণুনাশক সামগ্রীর দ্বারা ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে তা তাপে বা মুক্ত বাতাসে ভালাভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। এ কাজে, ১০০ পিপিএম সক্রিয় উপাদান সমৃদ্ধ (সোডিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম) হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে। উৎপাদনের ট্যাংক জীবাণুমুক্ত করার কাজে ১০% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবণও ব্যবহার করা যায়। ট্যাংক জীবাণুমুক্ত করার কাজে ফরমালিন ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণ এর অবশিষ্টাংশ লার্ভার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুনাশক ও পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. ভৌত (Physical) জীবাণুনাশক

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন অবকাঠামো ও উপকরণাদি শুকানো ও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে জীবাণুর বসবাস ও বংশবিস্তার রোধ হয়। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত কাচের ও ধাতুর তৈজসপত্র সিদ্ধ বা গরম জলীয় বাষ্পের সাহায্য জীবাণুমুক্ত করা যায়। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমেও উপকরণাদি জীবাণুমুক্ত করা যায়। এসব ক্ষেত্রে তাপে গলে যায় বা আকৃতি নষ্ট হয় এরূপ সামগ্রীতে তাপ প্রয়োগ করা যায় না। ক্ষতিকর বেশিরভাগ জীবাণু ৬০° সে অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রায় মারা যায়।

খ. রাসায়নিক (Chemical) জীবাণুনাশক

রাসায়নিক দ্রবাদি ব্যবহার করে হ্যাচারিতে জীবাণু ও পরজীবী নির্মূল করা বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক জীবাণুনাশক দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন (Bleaching powder), ফরমালিন, আয়োডিন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ট্রাফলান, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১০% দ্রবণ) ইত্যাদি। যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ রয়েছে সেসব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার পরিহার করাই উত্তম। হ্যাচারি জীবাণুমুক্ত করার জন্য অনেক সময়ে এক সাথে দুই বা ততোধিক

রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে। হ্যাচারির বিভিন্ন অবকাঠামো এবং দ্রব্যাদি জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি বহুল প্রচলিত জীবাণুনাশকের নাম এবং ব্যবহারের মাত্রা সম্পর্কে নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো।

নং	রাসায়নিক পদার্থের নাম	উপযোগিতা	ব্যবহারের মাত্রা
১	বিচিং পাউডার (৬০৭০% সক্রিয় ক্লোরিন)	পানি জীবাণুমুক্তকরণ	১. ২০ পিপিএম (< ৩০ মিনিট) ২. ১০ পিপিএম (২ ৩০ মিনিট)
		বর্জ্যপানি শোধন	১২০ পিপিএম (৬০ মিনিট অপেক্ষা বেশি)
		পরিত্যক্ত/বর্জ্য লার্ভা শোধন	২০ পিপিএম
		আর্টিমিয়া নলি জীবাণুমুক্তকরণ	২০ পিপিএম
		ফুট-বাথ	৫০-১০০ পিপিএম
		যন্ত্রপাতি, পানির পাইপ, পাত্র, নেট ইত্যাদি ধৌতকরণ	২০-৩০ পিপিএম
		উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ট্যাংক ধৌতকরণ	২০-৩০ পিপিএম
		বালির ফিল্টার ধৌতকরণ	২০ পিপিএম
		কার্টিজ ফিল্টার ধৌতকরণ	১০ পিপিএম ২
২	ইডিটিএ	পানি থেকে ভারী ধাতু নিষ্ক্রিয়করণ	ভারী ধাতুর উপস্থিতির মাত্রার উপরে নির্ভরশীল
		উৎপাদন ট্যাংকের পানিতে ভারী ধাতু নিষ্ক্রিয়করণ	১০-৩০ পিপিএম (-ঐ-)
৩	অর্থোটলুইডিন	পানিতে ক্লোরিনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৫ এম.এল, পানিতে ৫ ফোটা
৪	সোডিয়াম থায়োসালফেট	পানিতে উপস্থিত ক্লোরিন দূরকরণ	প্রতি ১ পিপিএম ক্লোরিনের জন্য ১ পিপিএম
৫	ফরমালিন	পিএল এর বাহ্যিক পরজীবী (প্রোটেজোয়া) দূরীকরণ	২০-৩০ পিপিএম (১ ঘন্টা) (উচ্চ বায়ু সঞ্চালন সহ)
৬	ট্রাফলান	উৎপাদন ট্যাংকের পানি শোধন	০.০৫-০.১ পিপিএম
৭	কস্টিক সাডো (NaOH)	আর্টিমিয়া সিস্টের খোসা ছাড়ানো, ৪ লিটার পানিতে ৪০ গ্রাম	(৮-১০ % সক্রিয় উপাদান)
৮	অ্যালকোহল	হাত ধৌত ও জীবাণু মুক্তকরণ	৭০ %
৮	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	পানির পাইপ লাইন ও ট্যাংক ধৌতকরণ	১০ %

২০২২

গ. জৈবিক (Biological) জীবাণুনাশক

ভেষজ দ্রবাদি থেকে প্রস্তুতকৃত জৈবিক জীবাণুনাশক ব্যবহার বহুল প্রচলিত নয়। নিম দ্রবণ বা পাউডার এ ধরনের একটি জৈবিক জীবাণুনাশক হিসেবে পরিচিত। এছাড়া উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা প্রো-বায়োটিক দ্বারাও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দমন করার ব্যবস্থা করা যায়। তবে এ ধরনের উচ্চপর্যায়ের প্রযুক্তি আমাদের দেশে এখনও প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. গলদা চিংড়ির লার্ভা পর্যায় লবণাক্ত পানিতে সম্পন্ন হয় তা সর্বপ্রথম কে পর্যবেক্ষণ করেন?

২. ড. লিং কত সালে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন করেন?

৩. মৎস্য অধিদপ্তর প্রথম কত সালে গলদা হ্যাচারি স্থাপন করে?

৪. পানি ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে গলদা হ্যাচারিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৫. গলদা হ্যাচারির জন্য ভূগর্ভস্থ পানির পিএইচ-এর মাত্রা কত হতে হবে?

৬. ব্রাইনের পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লিখ।

৭. হ্যাচারিতে সাধারণত কত ধরনের সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়?

৮. হ্যাচিং ট্যাংকে প্রতি বর্গমিটারে কয়টি ডিমওয়ালা চিংড়ি মজুদ করা হয়?

৯. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে লার্ভা কতটি পর্যায় অতিক্রম করে পিএল-এ রূপান্তরিত হয়?

১০. খোলা পানি পদ্ধতি হ্যাচারিতে এলআরটি-তে প্রতিদিন কি পরিমাণ পানি পরিবর্তন করা হয়?

১১. পূর্ণ বয়স্ক আর্টিমিয়ার গড় দৈর্ঘ্য কত?

১২. আর্টিমিয়া সিস্ট থেকে নপ্লি উৎপাদনের পদ্ধতি কয়টি?

১৩. লার্ভায় Idiophathic Muscle Necrosis রোগের লক্ষণ কি?

১৪. ৮০ পিপিটি অপেক্ষা অধিক লবণাক্ততা সম্পন্ন সমুদ্রের পানিকে কী বলা হয়?

১৫. গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনায় কত পিপিটি এর ব্রাইন ব্যবহার করা হয়?

১৬. ব্রাইন সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কখন?

১৭. গলদা হ্যাচারিতে কোনো ধরনের স্টেরিলাইজার ব্যবহার করে সকল প্রকার জীবাণু নির্মূল করা সম্ভব?

১৮. বায়োফিল্টারের লবণাক্ত পানিতে হেটোরাট্রেফিক ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর জন্য কোন প্রজাতির মাছ ব্যবহার করা হয়?

১৯. বায়োফিল্টারের পানির তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?

২০. বায়োফিল্টারের পানির পিএইচ কত হওয়া উচিত?

২০২২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতির হ্যাচারি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২. কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গলদা হ্যাচারি ডিজাইন করা হয় লেখ।

৩. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৪. আর্টিমিয়া কী?

৫. ডিমওয়ালা চিংড়ি খাপ খাওয়ানো বলতে কী বোঝ?

৬. গলদা হ্যাচারিতে সৃষ্ট ইধপঃবৎরধষ ঘবপৎড়ংরং রোগের লক্ষণ লেখ।

৭. হ্যাচারির বিভিন্ন ট্যাংক ও অন্যান্য অবকাঠামোর স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

৮. বাংলাদেশে ব্রাইনের প্রাপ্তিস্থানগুলোর নাম লেখ।

৯. গলদা হ্যাচারিতে বায়োফিল্টারের কাজগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন।

১. গলদা হ্যাচারির স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

২. গলদা হ্যাচারিতে ব্যবহার্য বিভিন্ন ট্যাংকের বর্ণনা দাও।

৩. গলদা হ্যাচারিতে ব্রাইন ও আর্টিমিয়া সিস্ট-এর পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. গলদা হ্যাচারিতে ফরমালিনের ব্যবহার বর্ণনা কর।

৫. গলদা হ্যাচারিতে ব্যবহার্য খাদ্য ও খাদ্য উপকরণসমূহ বর্ণনা কর।

৬. গলদা হ্যাচারির হ্যাচিং ট্যাংক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. গলদা হ্যাচারির লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৮. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংকে পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১০. গলদা হ্যাচারিতে ইউভি স্টেরিলাইজার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা

হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল নার্সারিতে প্রতিপালনের মাধ্যমে জুভেনাইল উৎপন্ন করে মৎস্য/চিংড়ি চাষিদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। গলদা চিংড়ির রেণু/পোস্ট লার্ভা (পিএল)-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে যত্ন সহকারে ৪৫-৬০ দিন লালন-পালন করে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী চারা পোনা বা জুভেনাইল উৎপাদন করার পদ্ধতিকে গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

নার্সারি পুকুরের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক চিংড়ি চাষে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুস্থ, সবল ও বড় আকারের পোনা এবং পোনার মৃত্যুর হার সহনীয় পর্যায়ে রাখতে এবং মজুদ পুকুরের উৎপাদন নিশ্চিত করতে নার্সারি পুকুরের প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. সুস্থ ও সবল পোনা উৎপাদন করা যায় এবং পোনার মৃত্যুহার কমানো যায়
২. অল্প জায়গায় অধিক হারে পোনা মজুদ করে বড় পোনা উৎপাদন করা যায়।
৩. রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণীর হাত থেকে চিংড়ির পোনাকে রক্ষা করা যায়
৪. নার্সারি পুকুর আয়তনে ছোট হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনা খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।
৫. নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালনের ফলে চিংড়ি চাষির আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।
৬. উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে রোগবালাই-এর সম্ভাবনা কম থাকে
৭. নার্সারি পুকুরে লালনকৃত পোনা খামারে মজুদ করলে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
৮. নার্সারি পুকুরে প্রতিপালিত পোনা খামারে মজুদ করে বছরে ২-৩ টি ফসল উৎপাদন করা যায়

নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১. পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
২. পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
৩. প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৪. সঠিক মাত্রায় সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে
৫. অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
৬. রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

গলদা নার্সারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গলদা নার্সারি পুকুরে রেণু /পিএল ছাড়ার পর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির মাধ্যমে এরা সুস্থ ও সবল জুভেনাইল-এ পরিণত হয়। অল্প গভীরতা সম্পন্ন জলাশয় রেণুপিএল প্রতিপালনের জন্য নার্সারি পুকুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রেণু/পিএল বড় হওয়ার সাথে সাথে এদের বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়। গলদার নার্সারি কার্যক্রমে এক তর পদ্ধতিতে এর ব্যবস্থাপনা করা হয়।

পুকুর প্রস্তুতিঃ পিএল উপযোগী নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি কাজের ধাপগুলো নিচে সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলোঃ

ক) আগাছা পরিষ্কার ও পাড় সংস্কার এবং পাড়ের উপর ডালপালা পরিষ্কার

খ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

> পুকুর উত্তমরূপে শুকিয়ে তলার কাদা অপসারণ করতে হবে অথবা।

> বিষ প্রয়োগ ও ৯.১ % শক্তি সম্পন্ন রোটেনন পাউডার ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি প্রয়োগ করতে হবে এবং বিষক্রিয়া ৭ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

গ) **চুন প্রয়োগঃ** ১ কেজি পাথুরে চুন/শতাংশে

ঘ) **চুন প্রয়োগঃ** সার প্রয়োগ ও প্রতি শতাংশে জৈব সার ১০ কেজি, ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম ও টিএসপি ৭৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উপরে বর্ণিত কাজগুলো কার্প জাতীয় রেণু পোনার নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির মতই সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) আশ্রয়স্থল স্থাপনঃ গলদা চিংড়ির পিএল-এর দৈহিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ভিন্নতর। চিংড়ির পিএল খোলস বদলানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। এ সময় সবল চিংড়ি অর্থাৎ যেগুলো খোলস বদলায় না সেগুলো দুর্বলগুলোকে খেয়ে ফেলতে পারে। এজন্য চিংড়ি নার্সারি ব্যবস্থাপনায় আশ্রয়স্থল স্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন যাতে অন্য প্রাণী বা চিংড়ি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। পুকুরের তলায় কিছু জলজ উদ্ভিদ থাকলে (হাইড্রিলা, নাজাস) তা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত উপকরণঃ

- শুকনো তাল বা নারিকেলের পাতা/খেজুর পাতা
- বাঁশের কঞ্চি/বাঁশের চোঙা
- প্লাস্টিকের ফাঁপা পাইপ
- ভাঙা কলসের অংশ
- গাছের ডাল (হিজল গাছের ডাল উত্তম)

চিত্রঃ চিংড়ির আশ্রয়স্থল স্থাপন

আশ্রয়স্থল স্থাপন কৌশলঃ তাল বা নারিকেলের পাতা এমনভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে যাতে পাতার অংশ মাটি থেকে একটু উপরে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাল বা নারিকেলের পাতা কোণাকোণি (৪৫°) পুঁতে দিলে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেশি জায়গা পাওয়া যাবে এবং পাতাগুলো মাটির উপর থাকলে সহজে পচবে না। বাঁশের কঞ্চি আটি বেঁধে অথবা প্লাস্টিকের পাইপ পৃথক পৃথকভাবে পুকুরের তলায় মাটির উপর রেখে দিতে হবে। খেজুরের পাতা আঁটি বেঁধে দেয়া যায়।

আশ্রয়স্থল স্থাপনের পরিমাণঃ পিএল মজুদের ১-২ দিন আগে তাল, নারিকেল বা খেজুর পাতা প্রতি শতাংশে ১-২ টি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। অন্যান্য উপকরণগুলো আনুপাতিক হারে ব্যবহার করতে হবে।

পিএল-এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

১. পিএল-এর চেহারা ও আচরণ লার্ভা থেকে পৃথক।

২. পিএল দেখতে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো দেখায় যারা সম্মুখ দিকে চলাচল করে।

৩. পিএল ট্যাংকের দেয়াল বা মেঝেতে আঁকড়ে থাকে।

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির পিএল

পিএল গণনাঃ পিএল ট্যাংক থেকে কুপনেট অথবা ছাঁকুনির সাহায্যে পিএল গণনার সাদা চামুচে পিএল নিয়ে ১ চামুচে পিএল এর সংখ্যা গণনা করতে হবে। এভাবে কয়েকটি নমুনা করে এক চামুচে পিএল-এর গড় সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে এবং এ সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে প্রতিটি পলিথিন প্যাকেটে পিএল নিতে হবে এবং পরিবহন করতে হবে। পিএল-এর আকার ও প্রতিটি পলিথিন ব্যাগে পিএল নেওয়ার সংখ্যার উপরে নির্ভর করে এ চামুচের আকার ছোট-বড় করতে হবে।

পিএল প্যাকিং এবং পরিবহন

অক্সিজেনযুক্ত পলিথিন ব্যাগে পিএল প্যাকিং ও পরিবহন করতে হবে। পলিথিন ব্যাগে পিএল প্যাকিং করার পদ্ধতি নিম্নরূপ

> পিএল প্যাকিং এর কাজে দুইটি পলিথিন ব্যাগ একটির ভেতরে আরেকটি ব্যবহার করতে হবে।

> প্রতিটি পলিথিন ব্যাগের আকার ৩৬"×২০" হওয়া দরকার।

> ভিতরের পলিথিন ব্যাগটির দুইটি কোণা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধতে হবে যেন ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে পোনা মারা যেতে না পারে।

> পলিথিন ব্যাগের এক-তৃতীয়াংশ ৪-৫ লিটার পানি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এ পানির গুণাগুণ পিএল ট্যাংকের পানির গুণাগুণের অনুরূপ হতে হবে।

>পলিথিন ব্যাগে নির্দিষ্ট পরিমাণ পিএল নেওয়ার পরে এর বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

> পর্যায়ক্রমে দুইটি পলিথিন ব্যাগের মুখ গার্ডার বা সুতলি দিয়ে ভাজ করে বাঁধতে হবে।

> পরিবহনে বেশি সময়ের প্রয়োজন হলে তাপমাত্রা সহনীয় অবস্থায় রাখার জন্য রাতে পরিবহন করা ভালো। তবে জাইরোফোমের বাক্সে পলিথিন ব্যাগ পরিবহন করা হলে পিএল-এর পানির তাপমাত্রা বাহ্যিক তাপমাত্রার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

> পরিবহনকালীন সময়ের উপরে নির্ভর করে প্রতি ব্যাগে ১০০০-৩০০০টি পিএল পরিবহন করা যেতে পারে।

পরিবহনকালীন সময়ের উপর নির্ভর করে প্রতি লিটার পানিতে কি পরিমাণ পিএল-১০ পরিবহন করা যায় তা নিচে ছক আকারে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	পরিবহনকালীন সময় (ঘন্টা)	পিএল-এর সংখ্যা/লিটার
১	১ ঘন্টা	৫০০-৬০০
২	৪ ঘন্টা	৪০০-৫০০
৩	৮ ঘন্টা	৩০০-৪০০
৪	১২ ঘন্টা	২৫০-৩০০
৫	১২ ঘন্টার বেশি	১৫০-২০০

গলদা চিংড়ি চাষের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে গুণগত মানসম্পন্ন জুভেনাইলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নার্সারি পরিচালনায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এর আওতায় লিফলেট, পোস্টার, মাইকিং, ব্যক্তি-যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল বাজারজাতকরণের সুযোগ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হতে পারে।

সুস্থ-সবল লার্ভার বৈশিষ্ট্য

১. পানির উপরের তরে অবস্থান করে বিশেষত ১ম থেকে ১০ দিন

২. খাবার সরবরাহ করার পর পরই খাবারের জন্য ছুটাছুটি করতে থাকে

৩. রং লালচে বাদামি

৪. স্বজাতি ভক্ষক নয়

৫. মাথা নিচু করে পিছনের দিকে সাঁতার কাটে

৬. চলাফেরায় স্পর্শ পেলে লাফ দেয়

৭. সক্রিয়ভাবে সঁতরায় এবং ট্যাংকের তলায় স্থির থাকে না

অসুস্থ-দুর্বল লার্ভার বৈশিষ্ট্য

১. রং নীলাভ/কালচে ধরনের

২. খাবারের প্রতি অনীহা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ খাবার গ্রহণ করতে চায় না

৩. ট্যাংকের তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায়

৪. নিম্নমুখী আঁকা বাঁকা পথে এলোমেলোভাবে সাঁতরায়

স্বাস্থ্যবান সবল পিএল-এর বৈশিষ্ট্য

১. সুস্থ সবল পিএল এর এন্টিনিউল সোজা সমুখদিকে বিস্তৃত থাকে এবং পুচ্ছ পাখনা বা Uropode সুন্দরভাবে থাকে।

২. সুস্থ সবল পিএল-এর পরিপাকনালী সর্বদা খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকে এবং উদরাঞ্চলের পেশীসমূহ সুগঠিত থাকে

৩. সুস্থ সবল এবং উন্নতমানের পিএল-এর শরীর স্বচ্ছ, মসৃণ ও পরিষ্কার থাকে।

৪. সুস্থ সবল পিএল এর শরীর ক্ষতবিক্ষত থাকে না এবং উপাঙ্গসমূহ অসম্পূর্ণ বা কাটাছেড়া থাকে না

৫. দেখতে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মত, তারা চলার দিক পাল্টিয়ে সম্মুখের দিকে চলতে শুরু করে

৬. ট্যাংকের দেয়াল আকড়ে থাকে। ২০২২

চ) পিএল মজুদকরণ: নার্সারি পুকুর ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে পুকুরে পিএল মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। পুকুরে শুধু সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু বেশি হতে পারে। আবার পুকুরে পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকলে মজুদ ঘনত্ব আরও বেশি হবে। উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য, মানসম্মত সম্পূরক খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা সময়ের ওপর নির্ভর করে শতাংশ প্রতি মজুদ ঘনত্ব কম বেশি করা যায়।

নার্সারি পুকুরে প্রতি শতাংশে পিএল মজুদ ঘনত্ব নিম্নরূপ:

এক মাস ব্যাপী মজুদের ক্ষেত্রে ২০০০-৩০০০ টি এবং

দুই মাস ব্যাপী মজুদের ক্ষেত্রে ১৫০০-২০০০ টি

ছ) পিএল অবমুক্তকরণ: পরিবেশের তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের তারতম্যের কারণে মজুদের পর পিএল ব্যাপক হারে মারা যেতে পারে। পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নিলে এ মৃত্যুহার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা আনয়নই হচ্ছে পরিবেশ সহনশীলকরণ বা খাপ খাওয়ানো। নতুন পরিবেশের সাথে সহনশীল করে নার্সারি পুকুরে পিএল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ

- নার্সারি পুকুর পাড়ে পিএল এর ব্যাগের ভিতর দুই প্যাকেট ওরস্যালাইন বা ১০০ গ্রাম গ্লুকোজ দিতে হয়।
- যে পাত্রেই পরিবহন করা হাকে না কেন তা ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তলার অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পানি হাত দিয়ে ওপরে তুলে পলিথিন ব্যাগের ওপর বৃষ্টির মতো ছিটাতে হবে।
- এরপর হাত দ্বারা পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দুই অবস্থায় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২ সে. এর বেশি না হয়।
- পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে পানির তাপমাত্রায় সমতা আনতে হবে।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় সুস্থ, সবল পিএল স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যাবে।

চিত্র: চিংড়ির পিএল অবমুক্তকরণ

পাড়ের কাছাকাছি অল্প গভীরতায়, ঘের বা পুকুরের যেখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে পিএল ছাড়তে হবে। গলদা নার্সারি পুকুরে বিকেলে পিএল মজুদ করা সবচেয়ে ভালো। এ সময় পিএল মজুদ সম্ভব না হলে সকালেও মজুদ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোনো সময়ে নার্সারি পুকরে পিএল ছাড়া যেতে পারে। তবে দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় (বিশেষত নিম্নচাপের দিনে) পুকুরে গলদার পিএল ছাড়া উচিত নয়।

জ) পিএল বাঁচার হার পর্যবেক্ষণঃ পিএল গলদা নার্সারি পুকুরে/মজুদের পর বিভিন্ন কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে মজুদকৃত পিএল মারা যেতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে

- পরিবহনজনিত পীড়ন
- শারীরিক আঘাত
- পানির বিষক্রিয়া
- হঠাৎ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের আক্রমণ, যেমন- ক্লাডোসেরা, কপিপোড।

হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল-এর পুকুরের পানির লবণাক্ততার সাথে খাপ খাওয়ানোতে ত্রুটি

একটি ৬ × ৪ × ৪ ঘনফুট সাইজের হাপা পুকুরের পানির বেশি গভীর স্থানে স্থাপন করতে হবে। পিএল এর পুকুরের পানিতে খাপ খাওয়ানো শেষে পানিতে ছাড়ার পূর্বে ১০০টি পোনা হাপায় রাখতে হবে। ১২ ঘণ্টা পর পর পিএল-এর হার গুণে দেখতে হবে। ২৪ ঘণ্টা পর যদি দেখা যায় ৭০-৮০ ভাগ পিএল বেঁচে আছে তবে ধরে নিতে হবে বাঁচার হার সন্তোষজনক। বাঁচার হার সন্তোষজনক হলে পুকুরে নিয়মিত সার ও খাদ্য প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যদি বাঁচার হার সন্তোষজনক না হয় তা হলে পিএল মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর পুনরায় আংশিক বা নতুন করে মজুদ করতে হবে।

ঞ) খাদ্য প্রয়োগ মাত্রাঃ প্রতি শতকে ৮০০-১০০০টি পিএল মজুদ করা যায়।

১০০০০টি পিএল এর জন্য নিম্নবর্ণিত মাত্রায় গুণগত মান সম্পন্ন পিলেট খাবার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

পিএল-এর পরিমাণ	দিন	৬.০০ ঘটিকা	১২.০০ ঘটিকা	১৮.০০ ঘটিকা	২৪.০০ ঘটিকা	দৈনিক মোট খাবার (গ্রাম)	মন্তব্য
১০,০০০টি	১	৭০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৭০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	
	২	৭০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২০৫ গ্রাম	
	৩	৭৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২১০ গ্রাম	
	৪	৭৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৮০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২১৫ গ্রাম	
	৫	৮০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৮০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২২০ গ্রাম	
	৬	৮০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৮৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২২৫ গ্রাম	
	৭	৮৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৮৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২৩০ গ্রাম	
	৮	৮৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৯০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২৩৫ গ্রাম	
	৯	৯০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৯০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২৪০ গ্রাম	
	১০	৯০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৯৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২৪৫ গ্রাম	
	১১	৯৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৯৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	
	১২	৯৫ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৯৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৫৫ গ্রাম	
	১৩	৯৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৯৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৬০ গ্রাম	
	১৪	৯৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৬৫ গ্রাম	
	১৫	১০০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৭০ গ্রাম	
	১৬	১০০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১০৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৭৫ গ্রাম	

পিএল-এর পরিমাণ	দিন	৬.০০ ঘটিকা	১২.০০ ঘটিকা	১৮.০০ ঘটিকা	২৪.০০ ঘটিকা	দৈনিক মোট খাবার (গ্রাম)	মন্তব্য
	১৭	১০৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১০৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৮৫ গ্রাম	
	১৮	১০৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১১০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৯০ গ্রাম	
	১৯	১১০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১১০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২৯৫ গ্রাম	
	২০	১১০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১১৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৩০০গ্রাম	
	২১	১১৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১১৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৩০৫ গ্রাম	
	২২	১১৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১২০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৩১০ গ্রাম	
	২৩	১২০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১২০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	৩১৫ গ্রাম	
	২৪	১২০ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	১২০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩২০ গ্রাম	
	২৫	১২০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১২০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩২৫ গ্রাম	
	২৬	১২০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১২৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৩০ গ্রাম	
	২৭	১২৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১২৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৩৫ গ্রাম	
	২৮	১২৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৪০ গ্রাম	
	২৯	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৪৫ গ্রাম	
	৩০	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৩৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	
	৩১	১৩৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৩৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৫৫ গ্রাম	
	৩২	১৩৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৬০ গ্রাম	
	৩৩	১৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৬৫ গ্রাম	
	৩৪	১৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৪৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৭০ গ্রাম	
	৩৫	১৪৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৪৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৭৫ গ্রাম	
	৩৬	১৪৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৮০ গ্রাম	
	৩৭	১৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	৩৮৫ গ্রাম	
	৩৮	১৫০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৩৯০ গ্রাম	
	৩৯	১৫০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৩৯৫ গ্রাম	
	৪০	১৫০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৫৫ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	
	৪১	১৫৫ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৫৫ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৪০৫ গ্রাম	
	৪২	১৫৫ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৬০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৪১০ গ্রাম	
	৪৩	১৬০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৬০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	৪১৫ গ্রাম	
	৪৪	১৬০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম	১৬০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৪২০ গ্রাম	
	৪৫	১৬০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	১৬০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৪২৫ গ্রাম	
		সর্বমোট				১৪১০০ গ্রাম	

২০২২

এ ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে তৈরি পিলেট হিসেবে বাজারে প্রাপ্ত স্টার্টার-১ বা নার্সারি-১ প্রথম মাসে এবং স্টার্টার-২ বা নার্সারি-২ দেহের ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগের সময়

গলদা চিংড়ি সাধারণত আলো আধারিতে বেশি খেতে পছন্দ করে। সে কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগ করা উত্তম। তাছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী দুপুরে ও রাত্রেও আনুপাতিক হারে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সূর্যাস্তের সময় প্রয়োগকৃত খাবারের পরিমাণ বেশি হতে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিদিন ফিডিং ট্রে-তে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কাঠ, বাঁশ, টিন অথবা সিনথেটিক নেট দ্বারা ফিডিং ট্রে বা খাদ্যদানী তৈরি করা যেতে পারে। পুকুরের আকার অনুযায়ী ফিডিং ট্রে-এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত এক বিঘা আয়তনের একটি পুকুরের জন্য ৭-৮ টি ট্রে ব্যবহার করা উত্তম। ট্রে সাধারণত পাড়ের বকচর অথবা পুকুরের ঢালে স্থাপন করতে হবে।

নার্সারি পুকুরে পানির গুণাগুণ

নার্সারি পুকুরে পানির গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া দরকার

উপাদান	মাত্রা
তাপমাত্রা	২৫-৩১ সে.
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৭ পিপিএম
পিএইচ	৭.০-৮.৫
বচ্ছতা	২৫-৩৫ সে.মি.
লবণাক্ততা	০-৪ পিপিটি (গলদা)

পানি ব্যবস্থাপনা

নার্সারি পুকুরে জোয়ারের সাহায্যে আংশিক এবং পাম্প মেশিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে জোয়ারের সময় অথবা পাম্প মেশিনের সাহায্যে জলাধারে পানি পূর্ণ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজনানুসারে পরিমাণমতো পানি নার্সারি পুকুরে সরবরাহ করা হয়। নার্সারি পুকুরের পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য পুকুরের পানি প্রতিদিন প্রয়াজনমতো পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা

পিএল মজুদের পর প্রতিদিন পুকুর/ঘের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পানির রং হালকা সবুজ রাখার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনে সার ব্যবহার করতে হবে। চিংড়ি খুব সকালে পাড়ে কিনারে চলে আসলে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেন ঘাটতি আছে। অক্সিজেন সরবরাহের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল দিয়ে ঢেউ দিতে হবে অথবা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পানি আন্দোলিত করতে হবে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে দূষণমুক্ত নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে। শতক প্রতি ১৫০ গ্রাম হারে এমপি সার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিক্রির উপযোগী হলে জুভেনাইল বিক্রি করতে হবে অথবা ঘনত্ব কমিয়ে দিতে হবে।

পোনা আহরণ ও স্থানান্তর

ব্যাগনেট, ফঁদ ও হারভেস্টিং বক্স ইত্যাদির সাহায্যে নার্সারি পুকুর থেকে শতকরা ৯০ ভাগ চিংড়ি ধরা যায়। বাকি চিংড়ি পানি শুকিয়ে ধরা হয়। জোয়ার আসার দুই তিন ঘণ্টা পূর্বে পুকুরের পানি কিছুটা কমিয়ে নিতে হবে। জোয়ারের সময় পুকুরে পানি ঢুকানোর ফলে বড় পানা পানি সরবরাহ খালের নিকট চলে আসে এবং পরে খালের সুইস গেটের মুখ খুলে দিলে চিংড়ি হারভেস্টিং বক্সে চলে আসে। এই হারভেস্টিং বক্স থেকে প্লাস্টিক বালতি দিয়ে পোনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত পোনা থেকে সুস্থ ও সবল চিংড়ি বাছাই করে নিয়ে মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া অনেক সময় মজুদ পুকুর সংলগ্ন নার্সারি পুকুরের মুখ খুলে দিলে সরাসরি পোনা মজুদ পুকুরে চলে যায়।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. গলদা চিংড়ির পিএল নার্সারি পুকুরে কত দিন লালন-পালন করা হয়?

২. গলদা চিংড়ির নার্সারি পুকুর প্রস্তুতকালে প্রতি শতাংশে কী পরিমাণ চুন প্রয়োগ করা হয়?

৩. গলদা চিংড়ির নার্সারি পুকুর প্রতুতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা কত?

৪. চিংড়ি নার্সারি পুকুরে প্লাস্টিকের ফাঁপা পাইপ ব্যবহার করা হয় কেন?

৫. এক মাস ব্যাপী মজুদের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুরে পিএল মজুদের ঘনত্ব কত?

৬. দুই মাস ব্যাপী মজুদের ক্ষেত্রে নার্সারি পুকুরে পিএল মজুদের ঘনত্ব কত?

৭. গলদার নার্সারি পুকুরে কোন সময় খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত?

৮. এক বিঘার গলদা চিংড়ির নার্সারি পুকুরে কয়টি খাদ্যদানী ব্যবহার করা উচিত?

৯. গলদার সুস্থ লার্ভা কত দিন পর্যন্ত পানির উপরের স্তরে অবস্থান করে?

১০. গলদার অসুস্থ লার্ভার রং দেখতে কেমন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ির নার্সারি ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ?

২. গলদা চিংড়ির নার্সারি পুকুরের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৩. গলদা চিংড়ির পিএলএর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪. গলদা চিংড়ির পিএল গণনা পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।

৫. অসুস্থ লার্ভার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ির নার্সারি পুকুরে আশ্রয়স্থল স্থাপন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. গলদা চিংড়ির পিএল প্যাকিং ও পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. গলদা চিংড়ির পিএল মজুদকরণ ও অবমুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গলদা চিংড়ির রোগ ব্যবস্থাপনা

চিংড়ির রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

জীবমাত্রই নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাই চিংড়ির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। সাধারণত চিংড়ি পুকুরে পরিবেশের ভারসাম্য অবস্থায় বসবাস করে। এই পরিবেশের যে কোনো পরিবর্তনের ফলে বা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে চিংড়ির দেহে পরিবেশগতভাবে নানা ধরনের চাপ পড়ে এবং রাগজীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। দূষিত পানি, অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা প্রভৃতি কারণে চিংড়ির পুকুরের পরিবেশের ওপর চাপ পড়ে। এর ফলে চিংড়িতে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ির গুরুত্ব বিবেচনা করে আধুনিক চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের পূর্বে চিংড়ির রোগবালাই চেনার উপায়, কারণ নির্ণয়, প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

জবা বাল ঢ রোগ হচ্ছে যে কোনো প্রাণীর দেহের অস্বাভাবিক অবস্থা যা বিশেষ কিছু লক্ষণ হিসেবে চিড়ি বেশ সৃষ্টিকারী) দ্বারা প্রকাশ পায়। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় চিংড়ির মাঝেও নানা ধরনের রোগ বালাই হতে দেখা যায়। রোগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অজ্ঞতা বা। অবহেলার কারণে প্রতি বছরই অনেক চাষির পুকুরে ব্যাপক আকারে চিংড়ি মারা। যায়। মৎস্য চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

পরিবেশ ও চিংড়ির রোগবালাই

চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানাবিধ কারণে চিংড়ির পুকুর দূষিত হয় এবং চিংড়ির স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে থাকে। চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় পুকুর বা খামারের জলজ পরিবেশ, চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও চিংড়ির মধ্যে একটি দুর্বল ভারসাম্য অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কোনো কারণে এ ভারসাম্য অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর প্রভাব বৃদ্ধি পায় ও চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। পানিই চিংড়ির জীবনধারণের একমাত্র পরিবেশ এবং পরিবেশের সাথেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাস করে। তাই পুকুরের জলজ পরিবেশগত অবস্থা যত ভালো হবে চিংড়ির স্বাস্থ্যও তত ভালো থাকবে।

চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার উপযুক্ত জলীয় পরিবেশ

জলজ পরিবেশের চাপ, রাগেজীবাণু এবং চিংড়ির অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা। ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে জন্য চিংড়ির রাগাক্রান্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ বা বিষয় কাজ করে। এখন পর্যন্ত যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

- পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের অবনতি- (পানির তাপমাত্রা, পচা জৈব পদার্থ, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি)
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ
- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব

- বাইরে থেকে ময়লা ধোয়া দূষিত পানির প্রবেশ
- অধিক মজুদ ঘনত্ব
- প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ও হ্যান্ডলিং
- পরজীবী ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ

নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা যায়

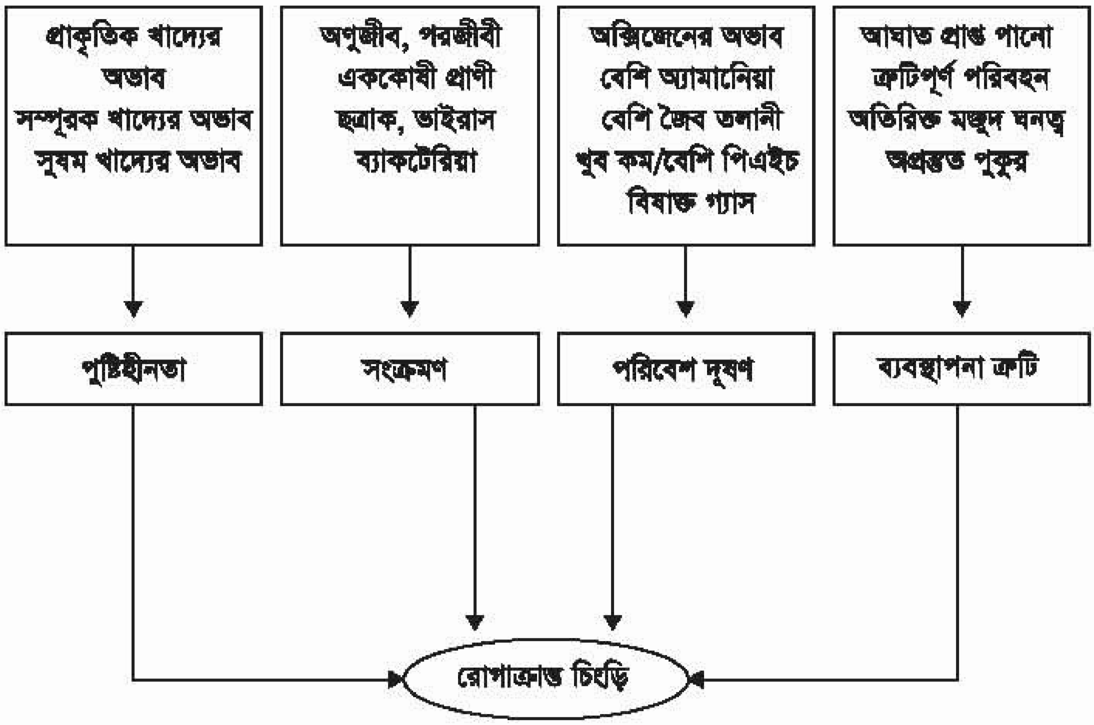

চিত্র: রোগাক্রান্ত চিংড়ি

চিংড়ির স্বাস্থ্যের ওপর জলীয় পরিবেশের গুণাগুণের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ চিংড়ির জন্য যত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য হবে জলজ প্রাণী হিসেবে চিংড়ির জীবনধারণ তত বেশি পীড়নমুক্ত হবে। কারণ পরিবেশগত পীড়ন চিংড়িকে অধিকতর সংবেদনশীল করে তালে। পুকুরের জলীয় পরিবেশ খারাপ হলে মাছ ও চিংড়ি দ্রুত মারা যায়। সে তুলনায় অন্যান্য রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণী বা পুষ্টির অভাবজনিত কারণে চিংড়ির মড়ক হতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।

চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ নিচের সারণিতে দেয়া হলোঃ

ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ	**সহনশীল মাত্রা**
তাপমাত্রা	২৫-৩১ সে
বচ্ছতা	২৫-৩৫ সেমি
পিএইচ	৭-৯
নাইট্রাইট	<০.০০২ পিপিএম
হাইড্রোজেন সালফাইড	<০.১ পিপিএম
ম্যাগনেসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
খরতা	৪০-২০০ পিপিএম
লবণাক্ততা	৩-৪ পিপিটি (গলদার জন্য)
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৭ পিপিএম
মুক্ত অ্যামোনিয়া	০.০২৫ পিপিএম
নাইট্রেট	(২০ পিপিএম
ক্যালসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
লৌহ	(০.০২ পিপিএম
ফসফরাস	০.১৫ পিপিএম

পানির উপরাক্তে ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের পরিবর্তন হলেই চিংড়ির বাথ্য রক্ষাকারী পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং পরিবেশগত পীড়নের সৃষ্টি হয়। এর ফলে মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়ে যায়। এজন্য চিংড়ি চাষের সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে চিংড়ির জন্য অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোগের লক্ষণসমূহ

পোনা অবস্থায় কিংবা দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে। চিংড়ি জীবিত থাকা অবস্থায় রোগাক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ চিংড়ি মৃত হলে লক্ষণগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। রোগাক্রান্ত চিংড়ি শনাক্তকরণের সাধারণ লক্ষণসমূহ নিচে দেয়া হলো।

পর্যবেক্ষণ দ্বারা রোগ শনাক্তকরণ

- চিংড়ির খোলস বা শিরোরক্ষ অঞ্চলের ক্যারাপেসে (Carapace) কালো রং দেখা দেয়।
- পদ উপাঙ্গ, ইউরোপড এবং ক্যারাপেসে কালো দাগের সৃষ্টি হয়।
- বহিঃকংকাল হালকা সাদা বর্ণ ধারণ করে।
- চলন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অলসভাবে চলাফেরা করে।
- লাফ দিতে কিংবা দেহ বাঁকানো দেখা যায়।
- পুকুরের পাড়ের দিকে ভেসে থাকতে দেখা যায়।

২০২২

- চিংড়ির ফুলকা বাদামি বর্ণ ধারণ করে।
- রোগাক্রান্ত চিংড়ি এলোমেলো বা অনিয়মিতভাবে সাঁতার কাটতে থাকে।
- রোগাক্রান্ত চিংড়ির দেহে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে কিছুটা বসে যায় কিনতু সুস্থ সবল চিংড়িতে এমন গর্ত হয় না।
- খাদ্যনালী কেটে দেখলে কোনো খাদ্যকণা দেখা যায় না।
- ফুলকা কমলা, হলদে, লাল, বাদামি কিংবা তামাটে রং ধারণ করে। ফুলকা স্বাভাবিক মনে হয় না, ফুলকা ছিড়ে যায়।
- চিংড়ির যকৃৎ অগ্নাশয় গ্রন্থিতে স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন ঘটে কিংবা হলুদ বর্ণ দেখা দেয়।
- চক্ষুদ- ছাই ও ঘোলাটে বর্ণ ধারণ করে।
- চিংড়ির খোলস ফ্যাকাসে ও শক্ত আকৃতির হয়ে যায়।
- চিংড়ি স্বাভাবিকভাবে লেজ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করতে পারে না।
- রোগাক্রান্ত চিংড়ির চোখের বর্ণ সাদা হয়।
- চিংড়ির মাংসপেশির সংযোগস্থলে কিংবা লেজের নিম্নাংশের মাংস পেশিতে কালো দাগ বা লম্বা কালো আঁচড় দেখা যায়।
- উদর এবং শিরাক্ষে খোলসের সংযোগস্থলে বাদামি বর্ণের ফোটা দাগ বা ডোরা কাটা দাগ দেখা যায়।
- চিংড়ির লেজ লাল বর্ণ ধারণ করে থাকে এবং চিংড়ির বহিঃত্বক হালকা লাল বর্ণ ধারণ করে।
- চলন পদ উপাঙ্গ দেহের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
- লেজের অংশ বিশেষে ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায় এবং কোনো কোনো অংশ স্ফীত হয়ে যায়।

পরিবেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রোগ শনাক্তকরণ

নিচে বর্ণিত লক্ষণসমূহ দেখে রোগাক্রান্ত চিংড়ি শনাক্ত করা যায়।

- পুকুরে চিংড়ি হঠাৎ মারা যেতে শুরু করলে।
- ভোরে চিংড়ি পুকুরের পাড় ঘেষে অস্বাভাবিকভাবে চলাচল করলে।
- হঠাৎ পুকুরের পানির রঙের পরিবর্তন ঘটলে।
- পানির তাপমাত্রা ৩২° সে. এর উপরে হলে।
- দিনের বেলায় পানির উপর দিয়ে চিংড়ি দ্রুত সাঁতার কাটলে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে।
- খামারের আশেপাশে পচা ডিমের মত গন্ধ পেলে বুঝতে হবে পুকুরের তলদেশে পচা জৈব পদার্থ রয়েছে।
- প্রচন্ড বাতাসের সময় পানির ওপরে ভাসমান স্তর পড়লে বুঝতে হবে পানিতে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে।
- পানির পিএইচ মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হলে।
- পানির লবণাক্ততা হঠাৎ করে কম বা বেশি হলে।
- পানির স্বচ্ছতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হলে।

রোগ ও রোগের কারণ

পরিবেশের পীড়ন চিংড়িকে অধিকতর সংবেদনশীল করে তালে। জলজ পরিবেশে চিংড়ি, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং পরিবেশের মধ্যে একটি দুর্বল ভারসাম্য অবস্থা বিদ্যমান থাকে। কোনো কারণে এ ভারসাম্য অবস্থা বিঘ্নিত হলে রোগজীবাণুর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর চিংড়ির জন্য বিপদসংকুল প্রতিকূল পরিবেশের উদ্ভব ঘটে। ফলে চিংড়ি, রাগজীবাণু ও পরিবেশগত পীড়নের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় চিংড়ির শরীরে সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে রোগ বলা হয়।

পুকুরের জলজ পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লে চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে চিংড়ির রোগবালাই সৃষ্টি হয়। এসব রোগের ধরন, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের প্রজাতি, প্রকৃতি ও আক্রমণের ধারা অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই রোগের লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতি অনুযায়ী চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) ব্যাকটেরিয়া, (খ) ভাইরাস, (গ) ছত্রাক ও (ঘ) পরজীবী।

(ক) ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক জীব। এদের শরীরের ব্যাস সাধারণত ০.০০১ মিমি এর মতো হয়ে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখা যায় না। জলে, স্থলে, বাতাসে সর্বত্রই ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান। চিংড়ির পেশীকোষে সাধারণত প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। তবে এদের গায়ে, পায়ে, ফুলকা ও খাদ্যনালীতে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। এসব ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে চিংড়ির দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। নিম্নবর্ণিত ব্যাকটেরিয়াসমূহ চিংড়িতে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

১. ভিবৃরিও ব্যাকটেরিয়া ও এই জাতীয় ব্যাকটেরিয়া চিংড়ির রক্তে প্রবেশ করে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে। চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে চিংড়ি মারা যায়।

২. সিউডোমেনাস ব্যাকটেরিয়া ও এই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে চিংড়ির দেহের রং পরিবর্তিত হয়।

৩. কাইটিনাভেরাস ব্যাকটেরিয়া ও এরা চিংড়ির খোলস ও ক্যারাপেসকে আক্রান্ত করে। এদের আক্রমণের ফলে চিংড়ির খোলসে অসংখ্য কালো কালো দাগ দেখা যায়।

৪. ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়া ও চিংড়ির উদর খোলস, শিরাক্ষে ও পুচ্ছ পাখনা (Telson) অঞ্চলে এই। ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে থাকে। ফুলকা আক্রান্ত হলে চিংড়ির শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়।

(খ) ভাইরাস

ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ভাইরাস আকারে অনেক ছোট। ভাইরাস সাধারণত ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। বাংলাদেশে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা যায়। সাধারণত চীনা "ভাইরাস" (CV) এবং সিস্টেমিক এক্টোডারমাল ও মেসাডোরমাল ব্যাকিউলা ভাইরাস সংক্ষেপে সাদা ভাইরাস নামে পরিচিত। এরা চিংড়ির গায়ে সাদা দাগের সৃষ্টি করে। এছাড়া মনাড়েন ব্যাকিউলো ভাইরাস (MB) ও ই-টাইপ ব্যাকিউলা ভাইরাস (CBV) এর কারণে চিংড়িতে ভাইরাস রোগের সৃষ্টি হয়। নিম্নমানের খাদ্য প্রয়োগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষিত মাটি ইত্যাদির কারণেও ভাইরাসজনিত রোগ ছড়াতে পারে। এই রোগের ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকা, লেজের অংশ অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক সময় কোনো লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই ব্যাপক হারে চিংড়ি মারা যেতে থাকে।

(গ) ছত্রাক

সাধারণত ফুসেরিয়াম, স্যাপ্রোলেগনিয়া, লেজিনিডিয়াম, হেলিপস ও সাইরলপিডিয়াম নামক ছত্রাক দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ছত্রাক সাধারণত চিংড়ির ফুলকায় আক্রমণ করে থাকে। ফলে চিংড়ি শ্বাসকষ্টে মারা যায়।

(ঘ) পরজীবী

বিভিন্ন প্রকার পরজীবী চিংড়ির রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এসব পরজীবী চিংড়ির খোলস, ফুলকা ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আক্রমণ করে থাকে। এই পরজীবী এককোষী বা বহুকোষী হয়ে থাকে। বহুকোষী পরজীবীর মধ্যে ট্রিমোটাড (Trematode), নেমোটাড (Nematode), সিস্টোড (Cestode) জাতীয় কৃমি দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ২০২২

চিংড়িতে প্রোক্রিসটোনেলা (Prochristonella), প্যারাসিটোনেলা (Parachristonella) এবং রেনিবালবাস পিনাই (Renibulbus Penaei) ধরনের সিস্টোড বা ফিতাকৃমি দেখা যায়। এছাড়া চিংড়িতে তিন ধরনের উকুন (Shrimp Fluke) দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে অপারকলিডি (Opercodidae), মাইক্রোফলিডি (Microphollidae) ও একিনাস্টোমাটিডাস (Echinostomatidas)। এককোষী প্রোটোজোয়া দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হয়। এক্টোকমেনসেল প্রোটোজোয়া, প্রোটোজোয়া কমেনসেলস্, এপোস্টোম সিলিয়েট, গ্রেগারিন, মাইক্রোস্তোরিডিয়া প্রভৃতি এককোষী প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এছাড়া পরিবেশ দূষণ, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে পারে। নিচে চিংড়ির রোগর কারণসমূহ ও রোগ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা দেওয়া হলো।

রোগের কারণ	রোগ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত উপাদান
ক) সংক্রমণ	ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক পরজীবী
খ) পরিবেশ দূষণ	অক্সিজেনের অভাব মাত্রাতিরিক্ত অ্যামোনিয়া মাত্রাতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি জৈব তলানি হঠাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন হঠাৎ লবণাক্ততার পরিবর্তন কীটনাশকের ব্যবহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদের আধিক্য
গ) পুষ্টিহীনতা	প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব সুষম খাদ্যের অভাব সম্পূরক খাদ্যের অভাব অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ
ঘ) ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি	পোনা উৎপাদনে ত্রুটি পরিবহন ত্রুটি আহত পোনা পোনা প্রতিপালনে ত্রুটি পুকুর তৈরিতে ত্রুটি

সফলতা অর্জনের জন্য চিংড়ির রোগবালাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ির রোগ প্রতিকার ব্যবস্থা যথেষ্ট জটিল, ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। তাই চিংড়ির রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমেও রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে চিংড়িকে রক্ষা করা সম্ভব। সাধারণত সম্ভাব্য রোগবালাই হতে চিংড়িকে রক্ষা করার জন্য পূর্বাহ্নেই যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। রোগবালাই প্রাদুর্ভাবের কারণসমূহ বিশেষণের মাধ্যমে রোগ
২০২২ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

নিচে রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করা হলো:

(ক) পরিবেশ উন্নয়ন

চিংড়ি চাষে পরিবেশের ওপর নিবিড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা যাতে পরিবেশিক পীড়ন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। পরিবেশের ওপর নিবিড় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকগুলোর ওপর লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। যথা

- পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন
- পিএইচ (pH) ও তাপমাত্রা
- ঘোলাত্ব
- কীটনাশক
- পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড
- অ্যামোনিয়া
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড
- শেওলাজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ
- পুকুরের তলদেশে পুঞ্জীভূত জৈব পদার্থ প্রভৃতি

চিংড়ির সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যের জন্য এসব প্রভাবক অনুকূল মাত্রায় ব্যবস্থাপনা রোগ প্রতিরোধের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

১. চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনা চিংড়ির রোগবালাই প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ঘনত্বে ও সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ির পোনা মজুদ করা যাতে পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ সহনশীল মাত্রায় বজায় থাকে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এজন্য সুস্থ ও সবল পোনা সংগ্রহ করে তা পুকুরে মজুদ করা উচিত। এছাড়া ব্যবস্থাপনাজনিত পীড়ন নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে পোনা স্থানান্তরের সময় হাত দিয়ে পোনাকে স্পর্শ না করা, পোনা নাড়াচাড়া না করা, অধিক ঘনত্বে পোনা পরিবহন না করা এবং অধিক গরমে বা তাপমাত্রায় পোনা স্থানান্তর, পরিবহন ও পুকুরে মজুদ না করা প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার।

২. চিংড়ি খামারে বা পুকুরে অবাঞ্ছিত মাছ ও প্রাণীর প্রবেশ রোধ করে পুকুরকে বহিরাগত রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা যায়। এজন্য পুকুরের আগমন ও নির্গমন নালা প্রয়োজনমত বন্ধ রাখা, পুকুরের পাড় বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা, পুকুরে ক্ষতিকারক পাখি বসতে না দেয়া এবং কাপড় চোপড় না ধোয়া প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৩, বহিরাগত রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে জলাশয়কে মুক্ত রাখার জন্য পোনা সংগ্রহের জাল, পরিবহন পাত্র, চিংড়ি ধরার জাল প্রভৃতি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে জীবাণুনাশক উপকরণ দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৪. নিয়মিত পুকুর পর্যবেক্ষণ করা এবং কোনো কারণে মৃত বা রোগাক্রান্ত চিংড়ি তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা যাতে খামারের অন্য চিংড়ি রোগাক্রান্ত হতে না পারে। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ২০২২

(গ) সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণ

১. চিংড়ির প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বজায় রাখার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য । সরবরাহ নিশ্চিত করা । চিংড়ির মোট দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা, খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করা এবং সময়মত খাবার দেয়া প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ রাখা ।

২. নিয়মিত জাল টেনে চিংড়ির বৃদ্ধির হার এবং স্বাস্থ্য ও রোগবালাই পর্যবেক্ষণ করা ।

৩. পুকুরে খাদ্য প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে বড় চিংড়ি পুকুর থেকে সরিয়ে ফেলা । কারণ অপেক্ষাকৃত বড় চিংড়ি খাদ্য প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে ।

রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধের তুলনামূলক সুবিধা

ক্রমিক নং	রোগ প্রতিরোধ	রোগ প্রতিকার
১	তুলনামূলক সহজ	তুলনামূলক জটিল
২	খরচ কম	খরচ বেশি
৩	চিংড়ির গুণগতমান ভালো	গুণগতমান খারাপ
৪	আর্থিকভাবে লাভজনক	আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি
৫	পরিকল্পনামাফিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব	ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়
৬	রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কম	রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বেশি
৭	পরিবেশ সহনীয়	পরিবেশ সহনীয় নয়
৮	টেকসই	টেকসই

রোগ দমনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য

চিংড়ির রোগ দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এসব রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে চুন, লবণ, পটাশ বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ম্যালাকাইট গ্রিন, মিথিলিন ব, ফর্মালিন, কুঁতে, বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়াটেক প্রভৃতির ব্যবহার সর্বাধিক ।

চুন

পুকুরে রোগমুক্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য পানিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির পর্যাপ্ততা সৃষ্টির জন্য এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে চুন ব্যবহার করা হয় । বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায় । কার্যকারিতা ও মূল্য বিবেচনায় পুকুরে সাধারণত পাথুরে চুন ব্যবহার করা হয় ।

লবণ

বিভিন্ন বাহ্যিক পরজীবী দমনের জন্য সাধারণত খাওয়ার লবণ (Table Salt, NaCl) ব্যবহার করা হয় । সাধারণত পিপিএম, পিপিটি বা শতকরা দ্রবণ হিসেবে লবণ জলে চিংড়ি বা মাছকে গাসল (Bath) করানো বা চুবানো (Dip) হয় । পিপিএম (Parts Per Million) অর্থ দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা নিযুতাংশ । এক পিপিএম সমান এক লিটার পানিতে এক মিলিগ্রাম দ্রব্য । পিপিটি (Parts Per Thousand) অর্থ হাজার ভাগের এক ভাগ বা সহস্রাংশ অর্থাৎ এক পিপিটি হচ্ছে ১ লিটারে ১ সিসি বা ১ এমএল ।

২০২২

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (Potassium Permenaganate, $KMnO_4$)

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেখতে বেগুনি রঙের কেলাসিড। জীবাণু মুক্তকারী দ্রব্য হিসেবে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত ও বহিঃপরজীবীজনিত রোগ দমনে পটাশ বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা হয়। বাজারে ঔষধের দোকানে এই দ্রব্যটি সাধারণত পটাশ নামে পরিচিত। পটাশ সহজে পানিতে দ্রবণীয় এবং অল্পতেই পানি গাঢ় বেগুনি রঙের হয়ে যায়।

ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite Green)

এটা এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যা কেলাসিড অবস্থায় থাকে। শুষ্ক অবস্থায় পিঙ্গল বর্ণের ছোট ছোট কণা বা পাউডারের মতো দেখতে। বিভিন্ন ছত্রাক, বাহ্যিক পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া দমনে ম্যালাকাইট গ্রিন ব্যবহার করা হয়। এটা সহজেই পানিতে দ্রবণীয় এবং অল্পতেই পানি গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়।

মিথিলিন ব্লু (Methelin Blue)

এটা নীল বর্ণের রাসায়নিক দ্রব্য যা কঠিন অবস্থায় পিঙ্গল বর্ণের থাকে। এই পদার্থ সহজেই পানিতে দ্রবণীয়। সাধারণত চিংড়ির ফুলকা রোগ দমনে মিথিলিন ব্লু ব্যবহার করা হয়।

ফরমালিন (Formalin)

সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ৪০% ফরমালডিহাইডের দ্রবণ ফরমালিন হিসেবে পরিচিত। এককোষী বহিঃপরজীবী ও মনোজেনেটিক ট্রিমেটোড দমনে ফর্মালিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জীবাণুনাশক হিসেবেও ফর্মালিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তুঁতে (Copper Sulphate, $CuSO_4$)

তুঁতে নীল রঙের স্ফটিকাকার দ্রব্য। এই দ্রব্য সাধারণ মুদি বা ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এঁতের দ্রবণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়।

অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic)

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য সাধারণত কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে সচরাচর টেট্রাসাইক্লিন (অক্সিটেট্রাসাইক্লিন), ক্লোরামফেনিকল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। চিংড়ির রোগ দমনে খাদ্যের সাথে মিশিয়ে এসব ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

চিংড়ির সাধারণ রোগ

চিংড়ির রোগ চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কারণ রোগ শনাক্তকরণ ও প্রতিটি চিংড়ির আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাদের চিকিৎসা বা রোগের প্রতিকার করা জরুরি হয়ে পড়ে। চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণীয়

চিত্র: চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণ

সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে

- ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না
- ধীর গতিতে চলাচল করে।
- এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে।
- পাড়ের কাছাকাছি খাবি খায়, কখনও পাড়ে উঠে আসে
- খোলস নরম হয়ে যায়।
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়
- খোলসের উপর নীলাভ ম্যাশেওলা জমে যায়।
- হাঁটার অঙ্গ ও এন্টেনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়

নিচে চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও তাদের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

(১) অ্যান্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া

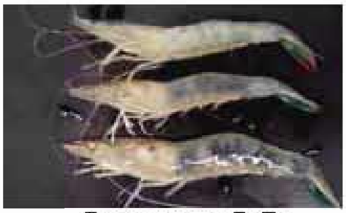

চিত্রঃ রোগাক্রান্ত চিংড়ি

কারণ	:	ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ
লক্ষণ	:	মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণপদ খন্ডিত অথবা ঝরে পড়তে থাকে
প্রতিকার	:	- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ - সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন - পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে ডলোমাইট প্রয়োগ

(২) শেল শক্ত হয়ে যাওয়া

কারণ	:	পরিবেশগত; পিএইচ, লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়।
লক্ষণ	:	- খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত - বয়সের তুলনায় চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি কম
প্রতিকার	:	- পানির পরিবেশ উন্নয়ন। - পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ।

(৩) ক্যারাপেস ও শরীরের ওপর পাথর জমা

কারণ	:	পরিবেশগত যে কোনো প্যারামিটারের তারতম্যের কারণে এটা হয়ে থাকে। বিশেষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটা বেশি হতে দেখা যায়।
লক্ষণ	:	করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধূসর রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায়
প্রতিকার	:	পুকুরের পানি পরিবর্তন -স্বাদু পানির সরবরাহ বৃদ্ধি -পানির গভীরতা বৃদ্ধি

(৪) নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই গলদা চিংড়ির এ রোগ দেখা দেয়

কারণ : - পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া
- অ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা

লক্ষণ : - খোলস নরম হয়ে যায়
- পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়
- দেহ ফাপা হয়ে পঞ্জের মত হয়

প্রতিকার : - পুকুরে ২-৩ মাস অন্তর শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ ।
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি

(৫) খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু

কারণ : - খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপেক্স, ফ্যাটি অ্যাসিড, আমিষ ও খনিজ দ্রব্যের অভাব

লক্ষণ : - দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়
- মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে । উল্লেখ্য যে, সুস্থ চিংড়ি রান্না করলে রং লাল হয় ।

প্রতিকার : - খাদ্যের সঙ্গে ৫০ মিলি গ্রাম/কেজি হারে ভিটামিন প্রিমিক্স (এমবাভিট জি) প্রয়োগ ।

(৬) গায়ে শেওলা পড়া

কারণ : খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া

লক্ষণ : চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ শেওলা দেখা যায়

প্রতিকার : পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে

(৭) সুতালু ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

কারণ : জৈব ও অজৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি, অক্সিজেনের পরিমাণ কম, পোনা মজুদ ঘনত্ব বেশি ।

লক্ষণ : চিংড়ির ফুলকায় উলের মত আবরণ, ফুলকায় ফোটা ফোটা দাগ, পদ উপাঙ্গা খসে পড়া, কালো বর্ণ ধারণ করা ।

প্রতিকার ; কিউপ্রাস ক্লোরাইড ২পিপিএম/লিটার দ্রবণে ৩-৪ দিন চিংড়িকে ধৌত করা

২০২২

(৮) কালো ফুলকা রোগ

কারণ : ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের আক্রমণ

লক্ষণ : ফুলকায় কালো দাগ ও পচন, ফুলকায় জৈব পদার্থ জমে থাকা।

প্রতিকার : ফাংগাসে আক্রান্ত হলে অ্যাজালামোইসিনে গোসল করানো, ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে ফিউরাজলিডন দ্রবণে গোসল করা।

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. চিংড়ি পুকুরের পরিবেশের কোন অবস্থায় বসবাস করে?

২. চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পানির অনুকূল তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত?

৩. চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কত হওয়া উচিত?

৪. পানির তাপমাত্রা কত হলে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে?

৫. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

৬. ব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের জীব?।

৭. কাইটিনোভরাস ব্যাকটেরিয়া চিংড়ির দেহের কোথায় আক্রমণ করে ?

৮. চিংড়ির এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া রোগের কারণ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের নাম লেখ।

২. চিংড়ির রোগ প্রতিকারে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের নাম লেখ।

৩. চিংড়ির রোগ সৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিগুলো কী কী?

৪. চিংড়ির রোগ দমনে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ব্যবহারবিধি লেখ।

৫. চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ির রোগ ও রোগের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

২. চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

৩. চিংড়ির এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া রোগ, শেল শক্ত হওয়া রোগ, গায়ে শেওলা পাড় রোগ এবং কালো ফুলকা রোগ বর্ণনা কর।

২০২২

সপ্তম অধ্যায়

চিংড়ি চাষের প্রকল্প প্রণয়ন

কোনো প্রতিষ্ঠান, খামার বা উৎপাদনশীল ইউনিট বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালনা করার সময় এর আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনশীল ইউনিটের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশনার জন্য সাধারণত প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্দীষ্ট জনগাষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কর্মসংস্থানের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের কৌশল

প্রকল্প প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে একটি সুষ্ঠু বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন করা সহজ হয়। প্রকল্প প্রণয়নকালে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে

বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে:

(১) প্রকল্পটির স্থান লোনা পানির উৎসের কাছাকাছি হতে হবে

(২) প্রকল্প যে স্থানে স্থাপিত হবে সে স্থানের মাটির গুণাগুণ উন্নত হতে হবে

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হতে হবে।

(৪) জোয়ার-ভাটার পানি প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাছাকাছি হতে হবে।

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলাচ্ছ্বাস ইত্যাদি মুক্ত এলাকায় প্রকল্প স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(৬) প্রস্তাবিত প্রকল্প হানে আইন-শঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে।

(৭) বাগদা চিংড়ির পোনা প্রাপ্তির উৎসের কাছাকাছি হতে হবে।

(৮) বিগত কয়েক বছরে রাগবালাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে

(৯) চিংড়ি চাষের দক্ষ জনশক্তির সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে।

(১০) উৎপাদিত চিংড়ি সহজে বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে

(১১) বিদ্যুতের সহজপ্রাপ্যতা থাকতে হবে।

(১২) চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- চিংড়ির খাদ্য, প্যাডেল হুইল ইত্যাদির সহজপ্রাপ্যতা থাকতে হবে

(১৩) প্রকল্প এলাকায় সামাজিকভাবে চিংড়ি চাষের গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে

উপযুক্ত সুযাগ-সুবিধার বিষয়টি মনে রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে উক্ত প্রকল্প সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অপরদিকে, উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু প্রকল্পটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে বা আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়।

গলদা চিংড়ির ক্ষেত্রে:

(১) মাটির গুণাগুণ

(২) পানির গুণাগুণ

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা

(৪) বিদ্যুতের প্রাপ্যতা

(৫) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

২০২২

(৬) পোনার উৎস
(৭) চিংড়ি চাষের দক্ষ জনশক্তি
(৮) গলদা চিংড়ির রোগবালাইয়ের অবস্থা
(৯) জোয়ার-ভাটার সময় লোনা পানি অনুপ্রবেশ
(১০) প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত এলাকা
(১১) বাজারজাতকরণের সুবিধা

গলদা চিংড়ি চাষের প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের সময় উপযুক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রথমে স্থান নির্বাচন করতে হবে। দূষণমুক্ত পানি, দোআঁশ মাটি, মাটি অ্যাসিডসালফেট বৈশিষ্ট্যের নয়, আইন-শৃঙ্খলা ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো, কাছাকাছি সহজেই গলদার পোনা পাওয়া যায়, জোয়ার-ভাটার লোনাপানি খামারে প্রবেশ করতে পারে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে প্রকল্প লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ছোট প্রকল্প বাস্তবায়ন আর্থিকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব, স্বল্প সংখ্যক দক্ষ কর্মী সমন্বয়ে কাজ শুরু করা যায় এবং আপদকালীন সময়ে স্থাপনা ও ফসল রক্ষা করার দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। তবে ছোট প্রকল্পে যদি আধানিবিড় পর্যায়ের চাষ কৌশল অবলম্বন করা হয় তবে তা কমপক্ষে ১০-১২ একর হতে হবে। এর চেয়ে ছোট প্রকল্প হলে সার্বিক ভৌত অবকাঠামো, বিদ্যুৎ পাম্প বা বিকল্প জেনারেটর প্রভৃতির ব্যবহার বিবেচনায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক হবে না।

চিংড়ি চাষের ব্যয়ের খাত নির্ধারণ

চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করা যায়। মূলধন খরচ যা একবার করলে ৫-১০ বছর ব্যয় করতে হয় না এবং আবর্তক খরচ যা প্রতি বছর ব্যয় করতে হয়।

মূলধন ব্যয়ের খাত	(ক) নির্মাণ ব্যয়	(১) বাঁধ নির্মাণ, (২) পাকা সুইস গেইট নির্মাণ, (৩) নার্সারি পাইপ লাইন, (৪) কাঁটাতারের বেড়া, (৫) পাম্প হাউজ, (৬) স্টাফ কোয়ার্টার ও (৭) গার্ড সেড
	(খ) আসবাবপত্র	(১) স্টিলের আলমারি, (২) কাঠের আলমারি, (৩) চেয়ার, (৪) টেবিল ও (৫) অন্যান্য
	(গ) মেশিনপত্র	(১) ওয়াটার পাম্প, এয়ার পাম্প (২) ডিপ টিউবওয়েল ও (৩) জেনারেটর
	(ঘ) যন্ত্রপাতি	(১) পিএইচ মিটার, (২) ডিওমিটার, (৩) রিফ্লাক্টোমিটার, (৪) অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও (৫) ওয়াটার এনালাইজার সেট
আবর্তক ব্যয়ের খাত	(ক) বেতন ও মজুরি	(১) প্রকল্প ব্যবস্থাপক, (২) মেশিন অপারেটর, (৩) সাধারণ কর্মচারী, (৪) নৈশপ্রহরী ও (৫) দিন মজুর
	(খ) উৎপাদন ব্যয়	(১) চিংড়ি পোনা, (২) চুন, (৩) সার, (৪) সম্পূরক খাদ্য, (৫) নেট, পাটা, বাঁশ, (৬) যাতায়াত ও পরিবহন, (৭) জালানি, (৮) জমি লিজ, (৯) স্টেশনারি দ্রব্যাদি ও (১০) বিবিধ

২০২২

চিংড়ি প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিবরণী

(ক) একটি ১০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি খামারের খাতওয়ারী ব্যয় ও আয়

(১) মূলধন ব্যয়

ক) ব্যয়

১)	বাঁধ নির্মাণ	৬০,০০,০০০.০০ টাকা
২)	পাকা স্লুইস গেইট নির্মাণ	৩,০০,০০০.০০ টাকা
৩)	নার্সারি পাইপ লাইন	১,০০,০০০.০০ টাকা
৪)	কাটা তারের বেড়া	১,৫০,০০০.০০ টাকা
৫)	পাম্প হাউজ	২০,০০০.০০ টাকা
৬)	স্টাফ কোয়ার্টার	৩০,০০০.০০ টাকা
৭)	গার্ড সেড	১০,০০০.০০ টাকা
	মোট	১২,১০,০০০.০০ টাকা

খ) আসবাবপত্র

১)	স্টিলের আলমারি (১টি)	৫,০০০.০০ টাকা
২)	কাঠের আলমারি (১টি)	৫,০০০.০০ টাকা
৩)	চেয়ার (৫টি)	৩,০০০.০০ টাকা
৪)	টেবিল (২টি)	২,০০০.০০ টাকা
৫)	বিবিধ	৩,০০০.০০ টাকা
	মোট	১৮,০০০.০০ টাকা

গ) মেশিন পত্র

১)	ওয়াটার পাম্প (৫টি)	১,৫০,০০০.০০ টাকা
২)	এয়ার পাম্প (১টি)	৫০,০০০.০০ টাকা
৩)	ডিপ টিউবওয়েল (১টি)	৫০,০০০.০০ টাকা
৪)	জেনারেটর (১টি)	৩৫,০০০.০০ টাকা
	মোট	২৮,৫০০০.০০ টাকা

ঘ) যন্ত্রপাতি

১)	পিএইচ মিটার	১৫,০০০.০০ টাকা
২)	ডিও মিটার	২০,০০০.০০ টাকা
৩)	রিফ্রাক্টোমিটার	১০,০০০.০০ টাকা
৪)	অণুবীক্ষণ যন্ত্র	১০,০০০.০০ টাকা
৫)	ওয়াটার এনালাইজার সেট	২৫,০০০.০০ টাকা
	মোট	৮০,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট মূলধন ব্যয় = (ক + খ + গ + ঘ) = ১৫,৯৩,০০০.০০ টাকা

কথায়: পনেরো লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র।

২০২২

(২) আবর্তক খরচ

ক) বেতন ও মজুরি

১)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ জন)	৬০,০০০.০০ টাকা
২)	মেশিন অপারেটর (১জন)	৩৬,০০০.০০ টাকা
৩)	সাধারণ কর্মচারী (৬ জন)	১,০৮,০০০.০০ টাকা
৪)	নৈশপ্রহরী (৬ জন)	১,০৮,০০০.০০ টাকা
৫)	দিনমজুর	৫০,০০০.০০ টাকা
	মোট	৪,১০,০০০.০০ টাকা

খ) উৎপাদন ব্যয়	**খ) উৎপাদন ব্যয়**
১) চিংড়ি পোনা ক্রয় (১০,০০,০০০ × ১.০০)	১০,০০,০০০.০০ টাকা
২) চুন	১০,০০০.০০ টাকা
৩) সার	১৫,০০০.০০ টাকা
৪) সম্পূরক খাদ্য (পিলেট) ৩০,০০০ কেজি × ৩০.০০	৯,০০,০০০.০০ টাকা
৫) নেট, পাটা, বাঁশ	১০,০০০.০০ টাকা
৫) যাতায়াত ও পরিবহন	১০,০০০.০০ টাকা
৭) জ্বালানি	১,৫০,০০০.০০ টাকা
৮) জমি লিজ (২৫ একর × ১০,০০০.০০ টাকা)	২,৫০,০০০.০০ টাকা
৯) স্টেশনারি দ্রব্যাদি	৫,০০০.০০ টাকা
১০) খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত	৫০,০০০.০০ টাকা
মোট	২৪,৫০,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট আবর্তক ব্যয় (ক+খ) = ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা

কথায়: টাকা আটাশ লাখ ষাট হাজার মাত্র

আয় নির্ধারণ উক্ত খামারে বৎসরে ২টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব বলে এখানে বার্ষিক আয়ের হিসেবে চিংড়ি উৎপাদন দ্বিগুণ দেখানো হলো।

উৎপাদন পুকুরে কিশোর চিংড়ি মজুদের পরিমাণ = ৪,০০,০০০ টি

পাঁচ মাস পর ১০% মৃত্যুহার ধরে বেঁচে থাকা চিংড়ির পরিমাণ = ৩,৬০,০০০ টি

মোট উৎপাদন (৩৬০০০০ × ৪০ গ্রাম x ২) = ২৮,৮০০ কেজি

মোট আয় = ২,৮৮,০০০ × ২০০.০০ = ৫৭,৬০,০০০.০০ টাকা

প্রকৃত আয় = মোট আয় - আবর্তক ব্যয়

= ৫৭,৬০,০০০.০০ - ২৮,৬০,০০০ টাকা

= ২৯,০০,০০০.০০ টাকা

কথায়: টাকা উনত্রিশ লাখ মাত্র

২০২২

(খ) একটি ১০ একর (৪ হেক্টর) আয়তন বিশিষ্ট উন্নত প্রচলিত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ি প্রকল্প প্রণয়নে সম্ভাব্য ব্যয় ও আয়

(১) মুলধন ব্যয়

ক) নির্মাণ ব্যয়

১) বাঁধ নির্মাণ		৮০,০০০.০০ টাকা
২) খাল নির্মাণ		২০,০০০.০০ টাকা
৩) গেইট স্থাপন		২৫,০০০.০০ টাকা
৪) গার্ড সেড		৫,০০০.০০ টাকা
৫) কোয়ার্টার		৮,০০০.০০ টাকা
৬) গুদাম ও অফিস		১৫,০০০.০০ টাকা
৭) পুকুর নির্মাণ (৩টি)		৪৫,০০০.০০ টাকা
	মোট	১,৯৮,০০০.০০ টাকা

খ) যন্ত্রপাতি ক্রয়

১) পাম্প মেশিন		৩০,০০০.০০
২) থার্মোমিটার, সেক্কি ডিক, পিএইচ পেপার		১,৫০০.০০ টাকা
৩) রিফ্রাক্টোমিটার		১০,০০০.০০ টাকা
	মোট	৫৫,০০০.০০ টাকা

(২) আবর্তন খরচ (Recurring cost)

ক) বেতন ও মজুরি

১. প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১জন)		৬০,০০০.০০ টাকা
২.মেশিন অপারেটর (১ জন)		৩৬,০০০.০০ টাকা
৩. সাধারণ কর্মচারী (৬ জন)		১,০৮,০০০.০০ টাকা
৪. নৈশপ্রহরী (৬ জন)		১,০৮,০০০.০০ টাকা
৫. দিনমজুর		৫০,০০০.০০ টাকা
	মোট	৪,১০,০০০.০০ টাকা

খ) উৎপাদন ব্যয়

১) চিংড়ি পোনা (৬০,০০০ টি @ ১.০০ টাকা)		৬০,০০০.০০ টাকা
৩) সার		৫,৫০০.০০ টাকা
৪) সম্পূরক খাদ্য (৭০০ কেজি @ ২৫.০০ টাকা)		৪,০০০.০০ টাকা
৫) নেট, পাটা, বাঁশ		১৭,৫০০.০০ টাকা
৬) জ্বালানি খরচ		২০,০০০.০০ টাকা
৭) জমি লিজ (১০ একর @ ১০,০০০ টাকা (একর)		১০,০০০.০০ টাকা
৮) বিবিধ		১,০০,০০০.০০ টাকা
		৫,০০০.০০ টাকা
	মোট	২,২২,০০০.০০ টাকা

২০২২

বার্ষিক আয়

(ক) বাগদা চিংড়ি @ ৫০০ কেজি/হে এবং @ ২৫০ টাকা/কেজি	৩,৭৫,০০০.০০ টাকা
(খ) অন্যান্য চিংড়ি @ ২০০ কেজি হে এবং @ ৪০ টাকা/কেজি	৩,০০০.০০ টাকা
(গ) অন্যান্য মাছ	২০,০০০.০০ টাকা
মোট ব্যয়	৪,২৫,০০০.০০ টাকা

এক ফসলে নিট লাভ = বার্ষিক আয় - আবর্তন ব্যয়
= ৪,২৫,০০০.০০ - ৩,৩৮,০০০.০০ টাকা
= ৮৭,০০০.০০ টাকা
কথায়: সাতাশি হাজার টাকা মাত্র

(গ) একটি ১০ একর আয়তন বিশিষ্ট আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির গলদা প্রকল্প প্রণয়নে খাতওয়ারী সম্ভাব্য ব্যয় ও আয়

(১) মূলধন ব্যয়

ক) নির্মাণ ব্যয়

১) জমি ক্রয়	১১০,০০,০০০.০০ টাকা
২) বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণ	২,০০,০০০.০০ টাকা
৩) পুকুরের বাঁধ	৩,০০,০০০.০০ টাকা
৪) পানি সরবরাহ খাল	১,০০,০০০.০০ টাকা
৫) নার্সারি পুকুরের বাঁধ	১,০০,০০০.০০ টাকা
৬) অফিস, ল্যাবরেটরি, বাসস্থান	২,০০,০০০.০০ টাকা
৭) গার্ড সেড	২০,০০০.০০ টাকা
৮) পাম্প হাউজ	২৫,০০০.০০ টাকা
৯) বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুতায়ন	১,০০,০০০.০০ টাকা
উপমোট	১১,৪৫,০০০.০০ টাকা

খ) আসবাবপত্র

১) স্টিলের আলমারি ১টি	৫,০০০.০০ টাকা
২) কাঠের আলমারি (১টি)	৫,০০০.০০ টাকা
৩) চেয়ার (৫টি)	৩,০০০.০০ টাকা
৪) টেবিল (২টি)	২,০০০.০০ টাকা
৫) বিবিধ	৩,০০০.০০ টাকা
উপমোট	১৮,০০০.০০ টাকা

গ) মেশিন পত্র

১) ডিপ টিউবওয়েল		১০০,০০০.০০ টাকা
২) অগভীর নলকূপ		৩০,০০০.০০ টাকা
৩) জেনারেটর		৩৫,০০০.০০ টাকা
৪) এয়ারেটর		৭০০,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	৮,৬৫,০০০.০০ টাকা

ঘ) যন্ত্রপাতি

১) পিএইচ মিটার		১৫,০০০.০০ টাকা
২) ডিও মিটার		২০,০০০.০০ টাকা
৩) রিফ্লাক্টোমিটার		১০,০০০.০০ টাকা
৪) অণুবীক্ষণ যন্ত্র		১০,০০০.০০ টাকা
৫) ওয়াটার এনালাইজার সেট		২৫,০০০.০০ টাকা
৬) থার্মোমিটার		৫০০.০০ টাকা
৭) ম্যাগনিফাইং গ্লাস		১,০০০.০০ টাকা
৮) ওজন মাপার যন্ত্র		৩,০০০.০০ টাকা
৯) কাচের সরঞ্জামাদি		৫,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	৮৯,৫০০.০০ টাকা

সর্বমোট = উপমোট (ক + খ + গ + ঘ)

=১১,৪৫০০.০০ + ১,০৫,০০০.০০ + ৮,৬৫,০০০.০০ + ৮৯,৫০০.০০) টাকা

= ২২,০৪,৫০০ টাকা

কথায়: টাকা বাইশ লাখ চার হাজার পাঁচশত মাত্র

২) আবর্তক খরচ

ক) বেতন ও মজুরি

১) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ জন)		৬০,০০০.০০ টাকা
২) মেশিন অপারেটর (১জন)		৩৬,০০০.০০ টাকা
৩) সাধারণ কর্মচারী (৪ জন)		৫৪,০০০.০০ টাকা
৪) নৈশপ্রহরী (৪ জন)		৫০,০০০.০০ টাকা
৫) দিনমজুর		৩০,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	২,৩৪,০০০.০০ টাকা

খ) উৎপাদন ব্যয় (৭.৫ একর জলায়তন হিসেবে)

১) চিংড়ি পোনা ক্রয় (৪০০,০০০ x ১.০০)	৪০০,০০০.০০ টাকা
২) খাদ্য (১৫০০০কেজি @ ২৫.০০ কেজি)	৩,৭৫,০০০.০০ টাকা
৩) চুন	২০,০০০.০০ টাকা
৪) অজৈব সার (১০০০ কেজি @ ৪.০০ টাকা/কেজি	৪০,০০০.০০ টাকা
৫) জৈব সার (১০০০ কেজি)	১০,০০০.০০ টাকা
৬) জাল, বাঁশ পাটা ইত্যাদি	১০,০০০.০০ টাকা
৭) জ্বালানি	৫০,০০০.০০ টাকা

৮) মাছ ধরার সরঞ্জামাদি	২০,০০০.০০ টাকা
৯) অন্যান্য	৫০,০০০.০০ টাকা
বিভিধ	৯,৬৬,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট আবর্তক ব্যয় = (ক+খ) = (২,৩৪,০০০.০০ +৯,৬৬,০০০.০০) টাকা= ১২,০০০০,০০.০০ টাকা
কথায় ও টাকা বার লক্ষ মাত্র

বার্ষিক উৎপাদন ও আয়

	বিবরণ	পরিমাণ	কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
ক)	গলদা চিংড়ি	৭৫০০ কেজি	২০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
ক)	শাকসবজি, কলা ও অন্যান্য	থোক	থোক	২৫,০০০.০০
			মোট	১৫,২৫,০০০.০০

নিট লাভ = বার্ষিক আয় - আবর্তক খরচ
= (১৫,২৫,০০০.০০ - ১২,০০,০০০.০০) টাকা
= ৩,২৫,০০০.০০ টাকা
কথায়: টাকা তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র

(ঘ) একটি ১০ (দশ) একর আয়তন বিশিষ্ট খামারে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের প্রকল্প প্রণয়নে খাতওয়ারী সম্ভাব্য আয়-ব্যয়

(১) মূলধন ব্যয়

ক) নির্মাণ বহ

১) জমি ক্রয়	১০,০০,০০০.০০ টাকা
২) বেষ্টনী বাঁধ	২,০০,০০০.০০ টাকা
৩) পুকুরের বাঁধ	১,২০,০০০.০০ টাকা
৪) পানি সরবরাহ খাল	৫০,০০০.০০ টাকা
৫) নার্সারি পুকুরের বাঁধ	৮০,০০০.০০ টাকা
৬) অফিস, বাসস্থান ও ল্যাবরেটরি	১,০০,০০০.০০ টাকা
৭) গুদাম ঘর (আধা পাকা)	১০,০০০.০০ টাকা
৮) গার্ড সেড	১০,০০০.০০ টাকা
৯) পুকুর ও পানি উত্তোলন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাদি	১০,০০০.০০ টাকা
১০) বিদ্যুতায়ন	৫০,০০০.০০ টাকা
উপমোট	১৭,০০,০০০.০০ টাকা

খ) মেশিনপত্র

১) পাম্প মেশিন (২টি)	৬০,০০০.০০ টাকা
২) অগভীর নলকূপ (১০টি)	৩০,০০০.০০ টাকা
উপমোট	৯০,০০০.০০ টাকা

গ) আসবাবপত্র

১) স্টিল আলমারি - ১টি		৫,০০০.০০ টাকা
২) চেয়ার - ৪টি		২,০০০.০০ টাকা
৩) টেবিল - ১টি		১,০০০.০০ টাকা
৪) বিবিধ		১,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	৯,০০০.০০ টাকা

ঘ) যন্ত্রপাতি

১) পিএইচ মিটার - ১টি		১৫,০০০.০০ টাকা
২) ম্যাগনিফাইং গ্লাস - ১টি		১,০০০.০০ টাকা
৩) থার্মোমিটার - ৬টি		৫০০.০০ টাকা
৪) সেক্কি ডিক - ২টি		১,০০০.০০ টাকা
৫) ওজনমাপক যন্ত্র - ৩টি		৪,৫০০.০০ টাকা
৬) কাচের সরঞ্জামাদি (ফ্লাস্ক, জার, টিউব ইত্যাদি)		৫,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	২৭,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট মূলধন ব্যয় = ক + খ + গ + ঘ।
= (১৭,০০,০০০.০০ + ৯০,০০০.০০ + ২৭,০০০.০০) টাকা
= ১৮,২৬,০০০.০০ টাকা

(২) আবর্তক ব্যয়

ক) বেতন ও মজুরি

১) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (১ জন)		৬০,০০০.০০ টাকা
২) সাধারণ কর্মচারী (২ জন)		৩৬,০০০.০০ টাকা
৩) নৈশপ্রহরী (৪ জন)		৪৮,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	১,৪৪,০০০.০০ টাকা

খ) উৎপাদন ব্যয়

১) চিংড়ি পোনা - ১,৫০,০০০টি @ ১.০০ টাকা		১,৫০,০০০.০০ টাকা
২) কার্প পোনা - ১০,০০০টি @ ০.৫০ টকা		৫,০০০.০০ টাকা
৩) খাদ্য - ৩০০০ কেজি @ ১৭.০০/কেজি		৫১,০০০.০০ টাকা
৪) চুন - ১৫০০ কেজি, @ ৮.০০/কেজি		১২,০০০.০০ টাকা
৫) সার - ১০০০ কেজি, @ ৪.০০/কেজি		৪০,০০০.০০ টাকা
৬) মাছ আহরণ সরঞ্জামাদি		১০,০০০.০০ টাকা
৭) অন্যান্য		৫,০০০.০০ টাকা
	উপমোট	২,৭৩,০০০.০০ টাকা

বার্ষিক আবর্তক ব্যয় = ক + খ = (১,৪৪,০০,০০০.০০ + ২,৭৩,০০,০০.০০) টাকা
= ৪,১৭,০০,০০০.০০ টাকা

বার্ষিক উৎপাদন ও আয়

বার্ষিক নিট লাভ = উৎপাদন আয় - আবর্তন ব্যয়
= (৭,৭৭,০০০.০০ - ৪,১৭,০০০.০০) টাকা
= ৩,৬০,০০০.০০ টাকা
কথায়: তিন লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র।

২০২২

চিংড়ি হ্যাচারির ব্যয়ের-আয়ের খাত নির্ধারণ

বাংলাদেশে মিঠা পানির গলদা চিংড়ি ও লোনা পানির বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি বিদ্যমান। এই দুই ধরনের হ্যাচারির ব্যয়ের খাত একই ধরনের হলেও খাতওয়ারী ব্যয়ের মাঝে ব্যবধান রয়েছে অনেক। তাছাড়া পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

(ক) চিংড়ি হ্যাচারির বিনিয়োগ বা মূলধন ব্যয়

(১) জমির মূল্য
(২) ভূমি উন্নয়ন ব্যয়
(৩) অফিস ও ল্যাবরেটরি স্থাপনের নির্মাণ ব্যয়।
(৪) বিভিন্ন ধরনের ট্যাংক ও স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ ব্যয়
(৫) পানি উত্তোলন ও নির্গমন লাইন স্থাপন ব্যয়
(৬) পাম্প হাউজ স্থাপন ও জেনারেটর স্থাপন ব্যয়
(৭) এয়ারেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন
(৮) বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন ব্যয়
(৯) এয়ারেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন ব্যয়
(১০) যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়
(১১) বাঁধ নির্মাণ ব্যয়
(১২) বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়

(খ) চিংড়ি হ্যাচারি পরিচালনা ব্যয়

(১) ডিমওয়ালা চিংড়ির পরিচালনা ব্যয়
(২) খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয়
(৩) পানি পরিশোধন ব্যয়
(৪) স্থায়ী স্থাপনা সংস্কার ব্যয়
(৫) বিদ্যুৎ ব্যয়
(৬) ল্যাবরেটরি পরিচালনা ব্যয়
(৭) হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যয়
(৮) অক্সিজেন ও পলিথিন ব্যাগ ক্রয় বাবদ ব্যয়
(৯) অন্যান্য ব্যয়

(গ) হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ব্যয়

(১) হ্যাচারি ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞদের বেতন সংক্রান্ত ব্যয়
(২) কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়
(৩) অফিস পরিচালনা ব্যয়
(৪) বাজারজাতকরণ ব্যয়
(৫) পরিবহন ব্যয়
(৬) বীমা ব্যয়
(৭) অন্যান্য ব্যয়

২০২২

হ্যাচারিতে আয়ের খাত নির্ধারণ

(ক) প্রচলিত আয়ের উৎস

(১) উৎপাদিত পোনা বিক্রয়

(২) পোনা উৎপাদনের পর দ্রুত চিংড়ি বিক্রি

(খ) বিকল্প আয়ের উৎস

(১) গলদা হ্যাচারিতে গলদার পর বাগদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন .

(২) বাগদা হ্যাচারিতে বাগদার পর গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন

(৩) চিংড়ির পোনা উৎপাদন শেষে মাছের পোনা উৎপাদন

(৪) অর্থের বিনিময়ে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান

(৫) হ্যাচারি কমপেক্সের অব্যবহৃত জায়গায় শাকসবজি উৎপাদন

প্রশ্নমালা

এক কথায় উত্তর দাও

১. কোন ধরনের মাটিতে হ্যাচারি স্থাপন করা উচিত নয় ?

২. হ্যাচারিতে প্রয়োজনীয় ব্যয়কে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

৩. হ্যাচারিতে প্রতি বছর কোন ধরনের খরচ নির্বাহ করতে হয় ?

৪. হ্যাচারিতে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় ?

৫. হ্যাচারিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন ব্যয় কোন ধরনের ব্যয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাগদা প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী ?

২. চিংড়ি হ্যাচারির ক্ষেত্রে ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধাগুলো লেখ ।

৩. মূলধন খরচ ও আবর্তন খরচ বলতে কী বোঝ ?

৪. প্রচলিত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ির খামারের উৎপাদন ব্যয়ের উপখাতগুলোর নাম লেখ ।

৫. প্রচলিত পদ্ধতির বাগদা চিংড়ির খামারের উৎপাদন ব্যয়ের উপখাতগুলোর নাম লেখ ।

৬. আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির বাগদা চিংড়ির খামারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উপখাতগুলোর নাম লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাগদা চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হয় সেগুলো লিপিবদ্ধ কর ।

২. গলদা চিংড়ির প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপকৃত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ কর ।

৩. ১০ একর বিশিষ্ট আধানিবিড় চাষ পদ্ধতির খামারের বার্ষিক আয় নির্ধারণ কর ।

৪. চিংড়ি হ্যাচারিতে আয়ের খাতগুলো বর্ণনা কর ।

২০২২

ব্যবহারিক

দ্বিতীয় পত্র

অনুশীলনী- ১ঃ প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. গলদা চিংড়ি যদিও মিঠা পানির চিংড়ি তবে ডিম ছাড়ার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের আধালবণাক্ত পানির জলাশয়ে এরা জীবনের কিছু সময় অতিবাহিত করে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাসমূহে অর্থাৎ সাতক্ষীরা থেকে কক্সবাজার জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় নদীসমূহে গলদার পোনা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত উপকূলীয় নদীসমূহে গলদার পানা পাওয়া যায়। সাধারণত খুবই ঘন ছিদ্রযুক্ত জাল বা মশারি জাল দিয়ে উপকূলীয় নদী থেকে গলদার পোনা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া হ্যাচারি থেকেও গলদা পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

২. গলদা চিংড়ির পোনার (১৮-৯০ মিমি) ক্যারাপেসে বা শিরোবক্ষের খোলসে লম্বালম্বি কয়েকটি রেখা দেখা যায়। ছোট পোনার ক্ষেত্রে ১টি এবং অপেক্ষাকৃত বড় পোনার ক্ষেত্রে ৭-৮ টি লম্বালম্বি রেখা দেখা যায়। এছাড়া গলদা পোনার উদর খণ্ডকের সংযোগস্থলে নীল বর্ণের ডোরাকাটা দাগ দেখা যায় যা জীবনের অবশিষ্ট সময়েও অবিকৃত থাকে। রোস্ট্রামের উপরে ও নিচে দাঁত থাকে এবং এই অবস্থায় স্বেচ্ছায় সাঁতার কাটতে পারে। পিএল অবস্থায় এদের গায়ের রং সাধারণত স্বচ্ছ দেখায় এবং মাথায় হালকা বাদামি রঙের রঞ্জন কণা দেখা যায়।

চিত্রঃ গলদা চিংড়ির পোনা

উপকরণ

১.	টিনের থালা	২.	ঝিনুক
৩.	সিলভারের পাতিল	৪.	গলদার পোনা
৫.	মেজারিং ফ্লাস্ক	৬.	আতশ কাচ
৭.	ড্রপার	৮.	পরিস্রুত পানি
৯.	করসেপ	১০.	গ্লাস স্লাইড
১১.	ট্রে	১২.	ব্যবহারিক খাতা
১৩.	পেনসিল ইত্যাদি।		

২০২২

কাজের ধাপ

১. উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো নদীর তীরবর্তী পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে গমন কর ।

২. পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের কোনো পোনা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সুস্থ ও সবল পোনা সংগ্রহ কর ।

৩. টিনের থালায় পানিসহ কিছু পোনা নিয়ে সেগুলো সুস্থ ও সবল কীনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৪. এবার বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পোনাগুলো পানিভর্তি মেজারিং ফ্লাস্কে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আস ।

৫. পরীক্ষাগারে এসে মেজারিং ফ্লাক থেকে কিছু পোনা পানিসহ টিনের থালায় রাখ ।

৬. ড্রপারের সাহায্যে ১ টি পোনা পানিসহ ট্রেতে রক্ষিত গ্লাস সরাইডের উপরিতলে রাখ এবং গ্লাস সরাইডের উপর এক ফোঁটা পরিশ্রুত পানি দাও ।

৭. এবার আতশ কাচ দিয়ে পোনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৮. পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

৯. পেন্সিল দিয়ে পোনার চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন কর ।

১০. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর ।

অনুশীলনী- ২: গলদা চিংড়ির পোনা পরিবহনের কৌশল

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পোনা দুটি পদ্ধতিতে পরিবহন করা যায়, যথা- (১) সনাতন পদ্ধতি ও (২) আধুনিক পদ্ধতি ।

২. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা সাধারণত সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহন করা হয় । সনাতন পদ্ধতির পরিবহনে সিলভার/ মাটির হাড়িতে পোনা পরিবহন করা হয় । এই পদ্ধতিতে সাধারণত ৩-৪ ঘণ্টার দূরত্বে পোনা পরিবহন করা হয় ।

৩. হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সাধারণত আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবহন করা হয় । এই পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন সরবরাহ করে পোনা পরিবহন করা হয় । তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাপ নিরোধক বাক্স ও বরফ ব্যবহার করা হয় । এই পদ্ধতিতে ৪-৩৬ ঘণ্টার দূরত্বে পোনা পরিবহন করা যায় ।

প্রয়োজনীয় উপকরণাদি

১. পলিথিন ব্যাগ
২. অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার
৩. রফ
৪. তাপ নিরোধক বাক্স
৫. সিলভার মাটির হাড়ি
৬. সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জাল
৭. রাবার ব্যান্ড
৮. পেনসিল
৯. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধারা

১. কোনো ফড়িয়া বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা সংগ্রহকারীর নিকট গমন কর ।

২. সিলভার মাটির হাড়িতে পোনা পরিবহন পদ্ধতিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৩. হ্যাচারি থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন কার্যক্রমটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৪. পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন সরবরাহ পদ্ধতিটি এবং পলিথিন ব্যাগের মুখ রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানারে এ পদ্ধতিটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর ।

৫. সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে খাতায় লেখ । ২০২২

অনুশীলনী- ৩: গলদা চিংড়ি পোনা পরিবহনের জন্য প্যাকিং অনুশীলন করা

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পরিবহনের সময় ৪ ঘন্টার বেশি হলে বরফ এবং অক্সিজেন দুই-ই ব্যবহার করতে হবে।

২. তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি রোধের জন্য তাপ নিরোধক পাত্র ব্যবহার করা হয়।

৩. প্রতি লিটার পানিতে প্রতি ঘণ্টা পরিবহনের জন্য ১০ গ্রাম বরফের প্রয়োজন।

৪. অক্সিজেন সরবরাহকৃত পলিথিন ব্যাগে প্রতি লিটার পানিতে ৫০০টি ছোট পোনা পরিবহন করা যায়।

৫. পরিবহনকালে পানির তাপমাত্রা ২০-২৫°সে. এর মধ্যে রাখতে হবে।

উপকরণ

১. ৩৬" × ২০" আকারের ২টি পলিথিন ব্যাগ

২. ৪-৫ লিটার স্বচ্ছ পানি

৩. অক্সিজেন সিলিন্ডার

৪. ১টি মগ

৫. ১টি প্লাস্টিকের বড় গামলা

৬. ৪টি রাবার ব্যান্ড

৭. ১০০০-৩০০০টি পোনা

৮. ব্যবহারিক খাতা

৯. পেন্সিল

১০. রাবার

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো বাজার থেকে বড় আকারের ২টি পলিথিন ব্যাগ সংগ্রহ কর।

২. এবার নিকটবর্তী কোনো হ্যাচারিতে গমন কর।

৩. একটি পলিথিন ব্যাগকে আরেকটি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগ দুটিকে একত্রিত করে এর ভিতর ৪/৫ । লিটার পানি রাখ।

৪. এবার পলিথিন ব্যাগের পানিতে ৩-৪ হাজার চিংড়ির পোনা রেখে এতে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে অক্সিজেন । সরবরাহ কর।

৫. পলিথিন ব্যাগ অক্সিজেন পূর্ণ হলে অক্সিজেন সিলিন্ডারের নলটি ব্যাগ থেকে বের করে নিয়ে ব্যাগের মুখ রাবার । ব্যান্ড দিয়ে ভালভাবে বাঁধ যাতে অক্সিজেন বের না হয়ে যায়।

৬. অতঃপর পলিথিন ব্যাগের নিচের দুই কোণা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধ যাতে পানি ও অক্সিজেনের চাপে ব্যাগ ফেটে যায়।

৭. এবার ব্যবহারিক খাতায় প্যাকিং পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে লিখ।

অনুশীলনী- ৪: গলদা চিংড়ির পোনা গণনা পদ্ধতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পোনা দুভাবে গণনা করা যায়, যথা- ক) সরাসরি গণনা ও খ) Eye estimation পদ্ধতি।

২. অল্প পরিমাণ পোনা সরাসরি ঝিনুক দিয়ে গণনা করা যায়। তবে বিপুল সংখ্যক পোনা Eye estimation পদ্ধতিতে গণনা করা উত্তম।

উপকরণ

১. কুপনেট
২. সাদা চামচ
৩, পলিথিন ব্যাগে ৪-৫ লিটার পরিষ্কার পানি
৪. ব্যবহারিক খাতা
৫. পেনসিল
৬. রাবার

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো হ্যাচারিতে গমন কর ।

২. পলিথিন ব্যাগে পরিষ্কার পানি নিতে হবে ।

৩. পিএল ট্যাংক থেকে স্কুপ নেটের সাহায্যে পোনা সংগ্রহ কর ।

৪. সাদা চামচে পিএল নিয়ে এক চামচে পিএল-এর সংখ্যা গণনা কর ।

৫. এ প্রক্রিয়াটি কয়েকবার অনুশীলন কর ।

৬. এক চামচে পিএল এর গড় সংখ্যা নির্ণয় কর ।

৭. গণনাকৃত পোনা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ কর ।

৮. পোনা গণনার কাজটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ ।

অনুশীলনী- ৫: হ্যাচারিতে উৎপাদিত পিএল পুকুরের পানিতে খাপ খাওয়ানো পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পুকুরে ছাড়ার আগে পোনাকে পুকুরের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচ এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে । কারণ পুকুরের পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও পিএইচ এর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মজুদকালে পোনার আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে ।

২. পরিবহনকৃত পাত্রের পানি ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার পার্থক্য ১৭ সে এর বেশি থাকা উচিত নয় । তাপমাত্রা । ঘণ্টায় ১.৫° সে. এর বেশি কমানো বা বাড়ানো ঠিক নয় ।

৩. পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির লবণাক্ততার তারতম্য ২ পিপিটি এর মধ্যে থাকা উচিত । এই লবণাক্ততা । ঘণ্টায় কমানোর হার ৩ পিপিটি এর বেশি এবং বাড়ানোর হার ১ পিপিটির বেশি হওয়া উচিত নয় ।

৪. পিএইচ এর তারতম্য ঘণ্টায় ০.৫ এর কম বা বেশি হওয়া উচিত নয় ।

উপকরণ

১. পরিবহনকৃত পলিথিন ব্যাগ ভর্তি পোনা
২. প্লাস্টিকের ১টি ছোট মগ
৩. ধারালো ছুরি
৪. রিফ্লাক্টোমিটার
৫. পিএইচ মিটার
৬. থার্মোমিটার
৭. পেনসিল
৮. রবার
৯. ব্যবহারিক খাতা ।

২০২২

কাজের ধাপ

১. কোনো চিংড়ি খামারের পুকুর পাড়ে যাও

২. পরিবহনকৃত পলিথিন ব্যাগ পুকুরের পানিতে ১০-১৫ মিনিট ভাসিয়ে রাখ।

৩. এবার পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে রিফ্লাক্টোমিটার ও পিএইচ মিটারের সাহায্যে ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির যথাক্রমে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা পরীক্ষা কর। ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির যথাক্রমে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার মধ্যে তারতম্য থাকলে তা ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

৪. ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার মধ্যে তারতম্য থাকলে এবার মগের সাহায্যে পলিথিন ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানি অদল-বদল করে পলিথিন ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির মধ্যে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার সমতা আন।

৫. উভয় পানির মধ্যে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার সমতা হয়েছে কিনা তা আবার পরীক্ষা কর।

৬. লবণাক্ততা ও তাপমাত্রায় সমতা এলে পলিথিন ব্যাগের মুখ পুকুরের পানিতে কাত করে ধর। এ অবস্থায় পোনা আতে আতে সাঁতার কেটে বের হয়ে যাবে।

৭. পোনা অভ্যস্তকরণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

অনুশীলনী- ৬: পোনা বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পোনা মজুদের পর বিভিন্ন কারণে কিছু পোনা বিশেষ করে দুর্বল, রোগাক্রান্ত পোনা মারা যেতে পারে। পোনা মারা গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পানির উপর ভেসে উঠে। মৃত পোনা ঢেউ-এর অনুকূলে পাড়ের কাছাকাছি চলে আসে।

উপকরণ

১. সিলভারের সাদা প্লেট/গামলা
২. প্লাস্টিকের ছোট মগ
৩. পেন্সিল
৪. রাবার
৫. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ খামারের পোনা মজুদকৃত পুকুরের পাড়ে যাও।
২. পোনা মজুদের ৬-৮ ঘণ্টা পর পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ কর।
৩. পুকুর পাড়ের কিনারা থেকে মগ দিয়ে মৃত পোনা সংগ্রহ করে প্লেট বা গামলায় রাখ।
৪. এবার মৃত পোনা গণনা করে মোট সংখ্যা বের কর।
৫. মৃত পোনার সমসংখ্যক পোনা পুনরায় মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. মৃত পোনা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

২০২২

অনুশীলনী- ৭ঃ সম্পূরক খাদ্য উপাদান পরিচিতি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাংলাদেশে চিংড়ি খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সহজেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য উপাদানের মধ্যে ফিসমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গমের ভুসি, ময়দা, চিটা গুড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপকরণ

১. ফিসমিল	২. চালের কুঁড়া	৩. তিলের খৈল
৪. গমের ভুসি	৫. ময়দা	৬. সয়াবিন তৈল
৭. চিটাগুড়	৮. সরিষার খৈল	৯. ৮/১০ টি পলিথিন ব্যাগ
১০. পেনসিল	১১. ট্রে	১২. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ বাজার থেকে ১০০ গ্রাম করে ফিসমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গমের ভুষি, ময়দা, সয়াবিন। খৈল, সরিষার খৈল, চিটাগুড়, প্রভৃতি উপাদান আলাদা আলাদাভাবে ছোট পলিথিন ব্যাগে সংগ্রহ কর।

২. সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো পরীক্ষাগার কক্ষে নিয়ে বিভিন্ন ট্রের উপর সারিবদ্ধভাবে পলিথিন ব্যাগসহ রাখ।

৩. প্রতিটি পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে খাদ্য উপাদানগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৪. প্রতিটি খাদ্য উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

৫. এবার খাদ্য উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী- ৮ঃ খাদ্য উপাদানসমূহের মিশ্রণের মাধ্যমে চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. যে পরিমাণ খাদ্য তৈরি করা হবে তার শতকরা ৪০ ভাগ চালের কুঁড়া, ২০ ভাগ চিংড়ির মাথা চূর্ণ, ১২.৫ ভাগ সরিষার খৈল, ২০ ভাগ ফিসমিল, ৪ ভাগ সাগু চূর্ণ, ৩ ভাগ মাছের তৈল, ০.২৫ ভাগ লবণ ও ০.২৫ ভাগ। ভিটামিন থাকতে হবে।

খাদ্য উপকরণ

১. চালের কুঁড়া/গমের ভুসি	=	৮০০ গ্রাম
২. চিংড়ির মাথা চূর্ণ	=	৪০০ গ্রাম
৩. সরিষার খৈল	=	২৫০ গ্রাম
৪. ফিসমিল	=	৪০০ গ্রাম
৫. সাগু দানা	=	৮০ গ্রাম
৬. মাছের তৈল	=	৬০ গ্রাম
৭. লবণ	=	৫ গ্রাম
৮. ভিটামিন	=	৫ গ্রাম

২০২২

উপকরণ

১. একটি ছোট ড্রাম	২. ১টি বালতি	৩. ১টি ছোট মগ
৪. মিনসিং মেশিন	৫. চাটাই	৬. পেনসিল
৭. রাবার	৮. ব্যবহারিক খাতা	

কাজের ধাপ

১. উপরে বর্ণিত খাদ্য উপাদানগুলো নিকটস্থ বাজার থেকে বাজারদর যাচাই করে সংগ্রহ কর।

২. অতঃপর খাদ্য উপাদানগুলো পরীক্ষাগার কক্ষে নিয়ে এসে শুকনা অবস্থায় ড্রামে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেল।

৩. উপাদানগুলো উত্তমরূপে মেশানারে পর মগে করে অল্প অল্প পানি দিয়ে সমগ্র মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে আঠালো পেস্ট বা মন্ডে পরিণত কর।

৪. এবার এই মং-র কিছু অংশ হাত দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি কর এবং অবশিষ্ট অংশ সেমাই বা মিনসিং মেশিন। দিয়ে পিলেট খাদ্য তৈরি কর।

৫. পিলেট খাদ্যগুলো এবার চাটাই এর উপর ছড়িয়ে দিয়ে রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে নাও এবং বলগুলো ভেজা খাদ্য হিসেবে সরাসরি পুকুরে প্রয়োগ কর।

৬. এবার কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী- ৯: গলদা চিংড়ি আহরণ কৌশল পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. একসাথে একই আকারের পোনা মজুদ করা হলেও একই সময়ে প্রতিটি চিংড়ি সমান বড় হয় না। গলদার পোনা মজুদের ৩-৫ মাসের মধ্যে কিছু চিংড়ির ওজন ৮০০-১০০ গ্রাম হয়ে যায়। গলদা চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য লাভজনক ওজন হচ্ছে ৭০-৮০ গ্রাম। এক্ষেত্রে আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি ধরা হয়।

২. আংশিক আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণের জন্য খেপলা জাল, বেড় জাল বা বাঁশের চাই ব্যবহার করা হয়।

৩. চিংড়ি চাষের পরিকল্পিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অথবা পুকুরের পানির স্তর কমে গেলে সমপূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা হয়।

৪. সমপূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে পুকুর শুকিয়ে অথবা বেড় জাল টেনে চিংড়ি ধরা হয়।

৫. অমাবস্যা-পূর্ণিমার তিথিতে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় চিংড়ি সহজেই আহরণ করা যায়।

উপকরণ

১. ঝাঁকি জাল	২. বেড় জাল	৩. পাম্প মেশিন
৪. বাঁশের চাই	৫. ৩/৪টি ঝুড়ি (মাঝারি আকারের)	৬. পেনসিল
৭. রাবার	৮. ব্যবহারিক খাতা	৯. চট

কাজের ধাপ

(ক) আংশিক আহরণ

১. অমাবস্যা-পূর্ণিমার তিথিতে নিকটবর্তী কোনো গলদা চিংড়ি পুকুরের পাড়ে যাও।

২. পানি সরবরাহ গেটের কাছে সন্ধ্যার সময় চাই স্থাপন কর।

৩. পরবর্তী দিন সকাল বেলায় চাঁই পানির মধ্যে থেকে পাড়ে তালে এবং চাই থেকে ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখ

২০২২

৪. পুকুরের যে সব স্থানে খাবার প্রয়োগ করা হয় সে সব জায়গায় সন্ধ্যা বা সকাল বেলায় কঁকি জাল দিয়ে ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের চিংড়ি আহরণ কর ।

৫. আহরণকৃত চিংড়ি ঝুড়িতে রাখ ।

৬. আহরণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ ।

(খ) সমপূর্ণ আহরণ

১. নিকটস্থ কোন গলদা চিংড়ির পুকুরের পাড়ে যাও ।

২. এবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়ে বেড় জাল দিয়ে যতটা সম্ভব চিংড়ি ধরে ফেল ।

৩. এবার পাম্প মেশিন দিয়ে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করে ফেল ।

৪. অতঃপর হাত দিয়ে ছোট বড় সব চিংড়ি ধরে ফেল ।

৫. আহরিত চিংড়ি ঝুড়িতে রাখ ।

৬. আহরণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ ।

অনুশীলনী- ১০: আহরিত চিংড়ি বাছাইকরণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. তাপমাত্রা বেশি থাকলে আহরণের প্রথম ৩ ঘণ্টার মধ্যেই চিংড়ির গুণগত অবস্থার বেশি অবনতি ঘটে । এ অবথা রাধেকল্পে অল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণপূর্বক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে ।

২. উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য চিংড়ির গ্রেডিং যথাযথভাবে হওয়া একান্ত দরকার । এজন্য আহরিত চিংড়ি খামার থেকেই সঠিকভাবে গ্রেডিং করে বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং করতে হবে ।

উপকরণ

১. চিংড়ি	২. ছোট ড্রাম	৩. পরিষ্কার পানি
৪. বরফ মিশ্রিত পানি	৫. বাঁশের চাটাই/হোগলা	৬. ৪/৫টি ট্রে
৭. পেনসিল	৮. রাবার	৯. চট
১০. ব্যবহারিক খাতা		

কাজের ধাপ

১. চিংড়ি ধরার পর পরই ছায়াযুক্ত স্থানে চাটাই বা হাগলার উপর রাখ ।

২. এবার চিংড়িগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত কর ।

৩. পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত চিংড়িগুলোকে এবার ড্রামের ভেতর বরফ মিশ্রিত পানিতে রাখ ।

৪. এবার চিংড়িগুলোকে বরফ থেকে তুলে ট্রেতে রাখ ।

৫. অতঃপর চিংড়িগুলো বিভিন্ন গ্রেডে বাছাই কর ।

৬. গ্রেড অনুযায়ী চিংড়িগুলো বিভিন্ন ট্রেতে সঠিক নিয়মে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও ।

৭. ট্রেতে স্তরে স্তরে সাজানো চিংড়িগুলোকে ভেজা চট দিয়ে ঢেকে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে রাখ ।

৮. প্রাথমিক ধৌতকরণ ও গ্রেডিং এর পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ । ২০২২

অনুশীলনী- ১১: রোগাক্রান্ত চিংড়ির রোগ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

(ক) খামারে নিম্নবর্ণিত লক্ষণ দেখে রোগাক্রান্ত চিংড়ি শনাক্ত করা যায়।
১. পুকুরে হঠাৎ মৃত চিংড়ি পাওয়া গেলে।
২. ভারে চিংড়ি খামারের পাড় ঘেষে বা পানিতে ভেসে চলাচল করলে।
৩. হঠাৎ পানির রঙের পরিবর্তন ঘটলে।
৪. পুকুরের পানি থেকে পচা ডিমের মত গনধ পেলে।
৫. দিনের বেলায় পানির উপর দিয়ে চিংড়ি দ্রুত সাঁতার কাটলে।
৬. পানির তাপমাত্রা ৩২° সে. এর উপরে হলে।
৭. পানির পিএইচ-এর মাত্রা কম বা বেশি হলে।

(খ) এছাড়া চিংড়ির দৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও চিংড়ির রোগ শনাক্ত করা যায়। নিম্নের এক বা একাধিক লবণ দেখে রোগ শনাক্ত করা যায়।
১. চিংড়ির খোলস বা ক্যারাপেসে কাল বা বাদামি রং দেখা দিলে
২. বহিঃখোলস হালকা সাদা বর্ণ ধারণ করলে
৩. চলন উপাজা, ইউরোপড় এবং ক্যারাপেসে ফাটল দেখা দিলে এবং কালো দা
৪. পুকুর পাড়ের কাছে চিংড়ি অলসভাবে ঘোরাফেরা করলে
৫. চিংড়ির খোলস নরম হলে
৬. ফুলকায় কালো বা হলদে দাগ দেখা গেলে
৭. খাদ্য গ্রহণ না করলে।
৮. দেহ কিংবা লেজ বেঁকে গেলে।
৯. চিংড়ির দেহে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে আঙুল কিছুটা বসে গেলে।

(গ) চিংড়িকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নিম্নবর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
১. পুকুর নিয়মিত শুকিয়ে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
২. নিয়মিতভাবে ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হবে।
৩. কম ঘনত্বে পোনা মজুদ করতে হবে।
৪. উন্নত মানের সমপূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৫. দ্রবীভূত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. পুকুরের তলদেশ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপকরণ

১. চিংড়ি	২. প্লাস্টিকের বালতিত্র	৩. ট্রে
৪. নিডল	৫. ফরসেপ	৬. পেনসিল
৭. রাবার	৮. ব্যবহারিক খাতা	

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ খামার থেকে ৮/১০ টি চিংড়ি সগ্রহ কর।
২. সংগৃহীত চিংড়ি বালতিতে করে দ্রুত পরীক্ষাগারে নিয়ে আস।
৩. ফরসেপ দিয়ে চিংড়িগুলো বালতি থেকে তুলে ট্রেতে রাখ।
৪. নিড়ল দিয়ে নেড়ে চেড়ে চিংড়িগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
৫. চিংড়ির খোলসের রং, ফুলকার রং, উপাঙ্গসমূহের অবস্থা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ কর এবং এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা খাতায় লিপিবদ্ধ কর।
৬. চিংড়ির রোগ শনাক্তকরণের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

অনুশীলনী- ১২: আপদকালীন সমস্যা শনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও মাকোবেলাকরণ/পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চিংড়ি খামারে সাধারণত দুধরনের আপদকালীন সমস্যা দেখা দিতে পারে; অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যা ও। লবণাক্ততা হ্রাস-বৃদ্ধির সমস্যা।

২. পুকুরে অতিরিক্ত পোনা মজুদ অথবা সরবরাহকৃত অব্যবহৃত খাদ্যের পচনক্রিয়ার ফলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া একাধারে কয়েকদিন আকাশ মেঘলা থাকলে বা বর্ষণমুখর থাকলেও পুকুরে অক্সিজেনের। স্বল্পতা দেখা দেয়। চিংড়ি চাষের পুকুরের অক্সিজেনের সর্বোত্তম মাত্রা হচ্ছে ৫-৭ পিপিএম।

৩. অতিবৃষ্টির কারণে পুকুরের পানির লবণাক্ততা হ্রাস পায় এবং অনাবৃষ্টির কারণে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ততার উত্তম মাত্রা হচ্ছে ১০-২৫ পিপিটি।

উপকরণ

১. ডিও মিটার	৩. পেনসিল
২. রিফ্লাক্টোমিটার	৪. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো খামারের পুকুরের পাড়ে যাও।

২. ডিওমিটার দিয়ে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ কর এবং তা খাতায় লিখ।

৩. অক্সিজেনের মাত্রা কম হলে পুকুরের পানি পরিবর্তন করে বা প্যাডেল হুইলের মাধ্যমে অক্সিজেনের সরাহের ব্যবস্থা করা।

৪. এবার রিফ্লাক্টোমিটার দিয়ে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ কর এবং তা খাতায় লিখ।

৫. অতিবৃষ্টিজনিত কারণে লবণাক্ততার মাত্রা কম হলে স্লুইস গেটের ফলবোর্ড ব্যবহার করে পুকুরের উপরের। স্তরের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

৬. অনাবৃষ্টির কারণে লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে গভীর নলকূপের সাহায্যে মিঠা পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

৭. এবার আপদকালীন সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলার কৌশল ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

অনুশীলনী- ১৩: চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

(ক) কোনো হ্যাচারি পরিদর্শন পর্যবেক্ষণের পূর্বে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।

(খ) হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হ্যাচারির নিম্নোক্ত অংশসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১. ব্রুড চিংড়ি প্রতিপালন ট্যাংক	৮. মিঠা পানির জলাধার
২. পনিং ট্যাংক	৯. লোনা পানির ওভারহেড ট্যাংক
৩. লার্ভা প্রতিপালন ট্যাংক	১০. পরিস্রাবণ ট্যাংক
৪. অ্যালজি চাষের ট্যাংক	১১. পাম্প হাউস
৫. আর্টিমিয়া ট্যাংক	১২. নার্সারি পুকুর
৬. রটিফার চাষের ট্যাংক	১৩. গুদাম ঘর
৭. লোনা পানির জলাধার	১৪. জেনারেটর

অনুশীলনী- ১৪: একটি চিংড়ি হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

(ক) কোনো হ্যাচারির যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করার পূর্বে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বানুমতি নেয়া প্রয়োজন।

(খ) হ্যাচারি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে হ্যাচারির নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১. মাইক্রোস্কোপ (Microscope)
২. ব্যালান্স (Balance)
৩. ক্যাথেটার (Catheter)
৪. টিস্যু হামোজেনাইজার (Tissue homogeniser)
৫. সেন্ট্রিফিউজ (Centrifuge)
৬. সিরিঞ্জ (Syringe)
৭. ডিসেক্টিং বক্স (Dissecting box)
৮. থার্মোমিটার (Thermometer)
৯. রিফ্লাক্টোমিটার (Refractometer)
১০. পিএইচ মিটার (PH meter)
১১. অক্সিজেন মিটার (Oxygen meter)
১২. রেফ্রিজারেটর (Refrigerator)
১৩. ডিপ ফ্রিজার (Deep freezer)
১৪. অ্যারেটর (Aerator)
১৫. জেনারেটর (Generator)।
১৬. বৈদ্যুতিক চুলা (Electric heater)
১৭. অক্সিজেন সিলিন্ডার(Oxygen cylinder)
১৮. সেক্কি ডিস্ক (Secchi disk)
১৯. প্ল্যাংকটন গণনাকারী এসআর সেল গণনা
২০. ট্রলি / পিক-আপ (Plankton counting S.R. cell)
২১. হ্যাক 'স' করাত (Hack saw)
২২. বেন্ডার (Blender)
২৩. ডেসিকেটর (Desiccator)
২৪. হ্যাক-কীট (Hach-kit)

উপকরণ

১. মেজারিং টেপ   ২. রাবার   ৩. পেনসিল

কাজের ধারা

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি হ্যাচারিতে গমন কর।

২. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।

৩. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসমূহ পর্যবেক্ষণকালে এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার/পরিচালনা সম্বন্ধে হ্যাচারি ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কর।

৪. হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখ।

অনুশীলনী- ১৫: ডিমওয়ালা গলদা চিংড়ি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. গলদা চিংড়ি স্বাদু পানির সকল জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে পরিপক্বতা লাভ করে।

২. বাগদা চিংড়ির মত এদের এ্যাবলেশনের প্রয়োজন হয় না।

৩. স্ত্রী গলদা চিংড়ির উদরাঞ্চলের সন্তরণ পদে নিষিক্ত ডিম জমা থাকে।

৪. উদরাঞ্চলে রাখা ডিম ফুটতে ১৮-২৩ দিন সময় লাগে।

উপকরণ

১. কুপ নেট/ঝাঁকি জাল
২. ট্রে
৩. স্বচ্ছ পানিসহ গামলা
৪. ফরসেপ
৫. পেনসিল
৬. রাবার
৭. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১. নিকটবর্তী কোনো হ্যাচারি/গলদা চিংড়ির খামারে গমন কর।
২. হ্যাচারির ব্রুড ট্যাংক থেকে কুপ নেট দিয়ে গলদা চিংড়ি সংগ্রহ কর।
৩. ধৃত চিংড়ি গামলার পরিষ্কার পানিতে রাখ।
৪. গামলা থেকে পুরুষ চিংড়িগুলো সরিয়ে ফেল।
৫. স্ত্রী ডিমওয়ালা চিংড়ি সাবধানে ট্রেতে রাখ।
৬. ডিমওয়ালা চিংড়ি সাবধানে পর্যবেক্ষণ কর।
৭. চিংড়ির দেহের ডিমের অবস্থান, ডিমের বর্ণ, ডিমের আকার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ কর।
৮. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

অনুশীলনী- ১৬ঃ চিংড়ির নার্সারি পুকুর প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. নার্সারি পুকুরের আয়তন খামারের মোট উৎপাদন এলাকার ১/১০ ভাগ হওয়া উচিত। তবে একটি নার্সারি। পুকুরের আয়তন ৫০০ বর্গমিটার হলে ভালো হয়।
২. দোআঁশ, এটেল বা বেলে দোআঁশ মাটি নার্সারি পুকুরের জন্য ভালো।

উপকরণ

১. চুন
২. গোবর সার
৩. ইউরিয়া সার
৪. টিএসপি সার
৫. পাওয়ার ট্রিলার
৬. পেনসিল
৭. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধারা

১. উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষ এলাকায় কোনো নার্সারি পুকুরে গমন কর।
২. নির্মিত নার্সারি পুকুরের তলদেশ ২-৫ সপ্তাহ সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে।
৩. পুকুরের তলদেশ লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে মাটির পিএইচ অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করতে হবে।
৪. চুন প্রয়োগের ৪/৫ দিন পর ৮০০-১০০০ কেজি/একর গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে।
৫. এরপর একর প্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৮ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
৬. সার প্রয়োগের পর ৬ ইঞ্চি পানি প্রবেশ করিয়ে ১০-১২ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
৭. অতঃপর পানির অভীরতা ২-৩ ফুট বাড়াতে হবে।
৮. পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য না জন্মালে পুনরায় ৮ কেজি/একর ইউরিয়া সার এবং ২০ কেজি/-একর টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এর পর ৫-৬ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
৯. নার্সারি পুকুর প্রতুতির ধাপগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর।
১০. ব্যবহারিক খাতায় নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির ওপর প্রতিবেদন লেখ।

২০২২

অনুশীলনী- ১৭: একটি খামারে চিংড়ির রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পরামর্শ প্রদান

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোনো খামারের চিংড়ির যে কোনো রোগ নির্ণয়ের জন্য খামারটির বিস্তারিত তথ্য জানা বিশেষ প্রয়োজন। খামার প্রতুতির বিভিন্ন পদক্ষেপ, খামার ব্যবস্থাপনার অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম রোগ নির্ণয়ের জন্য জানা, অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া রোগ শনাক্তকরণের জন্য খামারের মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য ও রোগাক্রান্ত চিংড়ির বাহ্যিক লক্ষণসমূহ ভালোভাবে জানা দরকার।

উপকরণ

১. ওয়াটার এনালাইজার
২. সয়েল এনালাইজার
৩. থার্মোমিটার
৪. সেক্কি ডিক ইত্যাদি

কাজের ধাপ

১. নিকটস্থ কোনো চিংড়ি খামার বা পুকুরে গমন করা।

২. খামার/পুকুর মালিকের সাথে খামারের সমস্যা ও রোগবালাই সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. নমুনা ছকে তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

৪. মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কর।

৫. বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আলোচনা কর ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ কর।

৬. খামারের জন্য পরবর্তী করণীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান কর।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

(১) খামারের তথ্যাবলি

- খামার মালিকের নাম ও ঠিকানা
- খামারের অবস্থান
- আয়তন
- খামার স্থাপনের সাল
- পানির উৎস

(২) খামারের জৈবিক তথ্য

- চাষকৃত প্রজাতি
- মজুদ ঘনত্ব
- পোনা মজুদের তারিখ
- রোগাক্রান্ত মাছ/চিংড়ির শতকরা হার
- রোগ শুরুর তারিখ
- প্রয়োগকৃত খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ
- খাদ্য প্রয়োগের সময়

২০২৫

(৩) ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য

- পুকুর প্রস্তুতির পদক্ষেপসমূহ
- পুকুর শুকানো হয়েছে কিনা
- চুন প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা
- অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা
- নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা হয় কিনা
- পানি পরিবর্তনের হার রর নাম ও সারের পরিমাণ

(৪) পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

- পানির তাপমাত্রা
- পিএইচ
- এ্যালকালাইনিটি
- দ্রবীভূত অক্সিজেন
- অ্যামোনিয়া
- ঘোলাত্ব

(৫) রোগের লক্ষণ

- মাছ/চিংড়ির শরীরে দাগ, ঘা, ক্ষত প্রভৃতি
- চিংড়ি মাছের চলাচল, সাঁতার কাটার ধরন
- ফুলকার অবস্থা

(৬) পরজীবী সংক্রান্ত

- বহিঃপরজীবী
- অন্তঃপরজীবী
- ছত্রাক
- ব্যাকটেরিয়া

(৭) অন্যান্য সমস্যা

(৮) সুপারিশ

অনুশীলনী- ১৮: মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে গলদার লার্ভার বিভিন্ন ধাপ পর্যবেক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. গলদা চিংড়ির লার্ভা মোট ১১টি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করে পোস্ট লার্ভা পর্যায়ে পৌঁছায়। তাপমাত্রা, খাদ্য পানির গুণাগুণের সাথে এ সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

২. গলদা চিংড়ির লার্ভার ১১টি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: ২০২২

পর্যায়	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য		ফোটার পর অতিক্রান্ত দিন
জুইয়া-১	চক্ষু বৃন্ত (Sessile eyes)	১-২	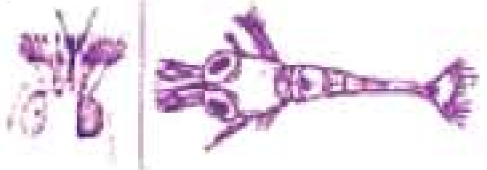
জুইয়া-২	চক্ষু সবৃন্তক (Stalked eyes)	২-৪	
জুইয়া-৩	পুচ্ছ পদের (Uropods) আবির্ভাব ঘটে	৪-৭	
জুইয়া-৪	চঞ্চু (Rostrum) পৃষ্ঠে দুটি দাঁত দেখা যায়	৭-১২	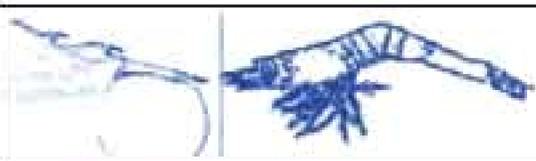
জুইয়া-৫	লেজ (Telson) সরু এবং প্রলম্বিত	১১-১৬	
জুইয়া-৬	সন্তরণ পদে (Pleopods) কুঁড়ি দেখা যায়	১৫-২১	
জুইয়া-৭	সন্তরণ পদ দ্বি-শাখান্বিত এবং সিটা (Setae) বিহীন	১৮-২৪	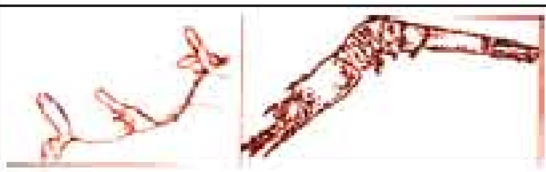
জুইয়া-৮	সন্তরণ পদসিটাযুক্ত	২২-২৮	

জুইয়া-৯	সন্তরণ পদে অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix internae) দেখা যায়	২৫-৩১	
জুইয়া-১০	চঞ্চুতে ৩-৪টি দাঁত উদয় হয়	২৮-৩৩	
জুইয়া-১১	চঞ্চর উপরের দিকের অর্ধেক পর্যন্ত দাঁতের আবির্ভাব ঘটে এবং করাতের মতো দেখা যায়	৩১-৩৫	
পোস্ট লার্ভা	রূপান্তর (Metamorphosis) চঞ্চর উপরে ও নিচের প্রান্তে দাঁত দেখা যায়। সন্তরণ অভ্যাসে পরিবর্তন দেখা যায় দেখতে সাধারণত স্বচ্ছ থাকে মাথায় একটি হালকা বাদামি রঞ্জকধারী কোষ থাকে	৩৫-৪০	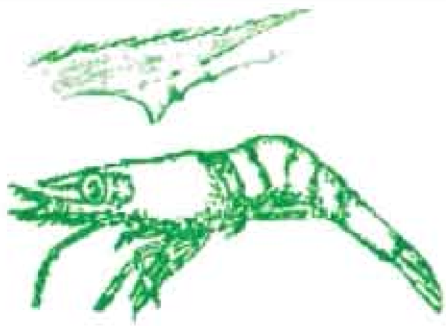

উপকরণ।

১. মাইক্রোস্কোপ
২. লার্ভার বিভিন্ন পর্যায়ের স্লাইড
৩. রবার
৪. পেনসিল
৫. ব্যবহারিক খাতা

কাজের ধাপ

১। ল্যাবরেটরিতে গমন কর।
২। মাইক্রোস্কোপ সেট কর।
৩। লার্ভার প্রত্যেকটি পর্যায়ের স্থায়ী স্লাইড মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ কর।
৪। লার্ভার প্রত্যেকটি পর্যায়ের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ কর।
৫। লার্ভার প্রত্যেকটি পর্যায়ের পর্যবেক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ কর।
৬। লার্ভার প্রত্যেকটি পর্যায়ের চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন কর।
৭। অনুশীলন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করা।

২০২২

তথ্য সূত্র

১. কাদির, মো. ম. ২০০০। শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-১, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

২. কাদির, মো. ম. ২০০০। শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৩. কাদির, মো. ম; মো. ই. হোসেন, ১৯৯৭। চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ২ ঢাকা।

৪. আহমেদ, ম.ক. ১৯৯৭। চিংড়ি চাষ ও হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা, হক প্রিন্টার্স, ১৪৩/১ আরামবাগ, ঢাকা।

৫. নূরুজ্জামান, মো. ২০০৫। মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আহরণ ও সংরক্ষণ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৬. জাতীয় মৎস্য পক্ষ সংকলন, ২০০৫। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা।

৭. গলদা চিংড়ি চাষ, ২০০৭। স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৮. পাল,সুকু, ১৯৯৫। চিংড়ি জীববিদ্যা ও চাষ ব্যবস্থাপনা, মনিকা পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৯. বাফরু, ১৯৯৬। গলদা চিংড়ির চাষাবাদ কারিগরি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ এ্যাকুয়াকালচার এন্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইউনিট, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১০. Mazid M.A; and M.Kamal 1997. Fish and Shrimp Culture Management, Proceedings of National Seminar on the Occasion of Fish Fortnight 1996 BFRI Proc. No.593 pp.

১১. Mazid M.A; M.S. Hossain and Others, 1997, Gear Selectivity Study of Floodplain Fishery in Bangladesh. BFRI, Tech. Rep. 14-30 pp.

১২. Connell 1.1 1995. Control of Fish Quality, Fishing News Book, Oxford U.K. 245 pp.

সমাপ্ত

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

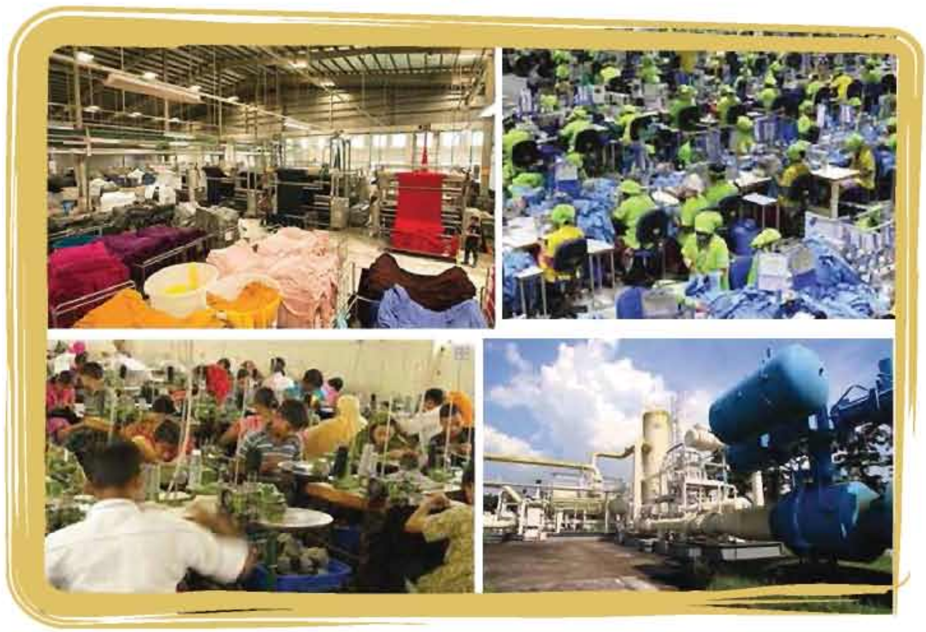

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেড (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল) ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা হয়েছে। ইপিজেড স্থাপনের ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগসহ দক্ষ জনবল সৃষ্টি হয়েছে, বিনিয়োগে বৈচিত্র্য এসেছে এবং নতুন প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে ৮টি ইপিজেড এ বিনিয়োগকারিদের জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে তৈরি পোশাকশিল্প, বস্ত্র ও বুননশিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, প্যাকেজিং ও পানীয় তৈরির কারখানাসহ বিভিন্ন প্রকার ভারী এবং মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২০২টি দেশে ৭৪৪টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৮টি ইপিজেড অঞ্চলে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮৮ জন, যার মধ্যে ৬৬ শতাংশই নারী কর্মী। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

ফিশ কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং–২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য